# খোঁড়া রাজকুমার

আলেক্সেই তলস্তয় • খোঁড়া রাজকুমার

তিন খণ্ডে সমাপ্ত বিখ্যাত 'অগ্নিপরীক্ষা' ও ঐতিহাসিক উপন্যাস 'প্রথম পিটর'-এর রচয়িতা আলেক্সেই তলস্তয় বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিককার রুগ্ণ ছোট জমিদারদের জীবন নিয়ে কয়েকটি ছোট গল্প লিখেছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল 'খোঁড়া রাজকুমার', রচনাকাল — ১৯১২। সে সময় লেখক নানা নৈতিক সমস্যা, বন্ধুত্বও প্রেমের নানা প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ ভাবিত ছিলেন। তরুণ তলস্তয় তখন লেখেন, '... প্রেমের অভাবে জীবনযাত্রার গতি হয় শোচনীয়, আর দুর্ভাগা সেই জন যার হৃদয় প্রেমে জ্বলে ওঠেনি, থাক না কেন তার প্রকৃতিদত্ত আর সব গুণ। 'ভালোবাসলে বেঁচে থাকতে ভালো লাগে।' 'খোঁড়া রাজকুমার'-এর মূলে একটি নবীন দম্পতির কাহিনী। এতে ফুটে উঠেছে সত্যকার প্রেমের কাছে হীন কামনার পরাজয়ের কথা, নারীর প্রেমের বিপুল রূপান্তরী শক্তির কথা।

আলেক্সেই তলস্তয়

# খোঁড়া রাজকুমার

Алексей Толстой

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

МОСКВА

উপন্যাস

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

অনুবাদ: রাধামোহন ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা : ল. লাম্ম্

"তুষার-শিখরে নিজ সিংহাসন হতে",
তুঙ্গ জন্মস্থান হতে মুক্ত নির্বাসনে
দুরন্ত কুরঙ্গসম জলের প্রপাত
আঁধার গহ্বরে পড়ে, ক্লেশের বন্ধনে।
কিন্তু মেঘ পুনরায় আসে পর্বতের শিরে,
প্রেমের সে টান যেন চির-অচঞ্চল,
যেন মেষশাবকের বেদীতে বলির
রক্তে রাঙা হয়ে ওঠে তুষার ধবল।"

(ভিয়াচেস্লাভ ইভানোভ, "পথনির্দেশী তারাদল")

# চন্দ্রিকা

১

মাঝরাত নাগাদ চাঁদটা এসে দাঁড়াল কনিভানের মাথার ওপরে বাঁয়ে কাঠের ঘরগুলোর জানালার এব্‌ড়ো-থেব্‌ড়ো কাঁচগুলো আলো করে, ডাইনে গাঁয়ের পথের পায়ে-দলা আগাছার ওপর কালো ছায়াগুলোকে ছড়িয়ে দিয়ে, তারপর রাতের আকাশে পথ-ভোলা এক টুকরো মেঘের আড়ালে নিজে আগোচর হয়ে গেল। ঠিক এই সময়ে ঘণ্টির মুখ-বাঁধা খোলা একটা ত্রয়কা গাঁয়ের ভিতর দিয়ে পড়ি-মরি করে ছুটে এল।

মোরগরা তখনো ভোরের ডাক আরম্ভ করেনি, কিন্তু কুকুরগুলোর ঘেউ-ঘেউ থেমে গেছে; একটিমাত্র আলো দেখা যাচ্ছিল গাঁয়ের শেষ বাড়িটার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে।

বাড়ির ছাতের ওপর পোঁতা লম্বা কাঠের খুঁটির ডগায় খড়ের আঁটিবাঁধা গোল চাক্‌তিটা দূর থেকেই পথিকদের জানিয়ে দিত যে বাড়িটা — পান্থশালা। তার পরেই দূরপ্রসারী মসৃণ স্তেপ্‌, চাঁদের আলোয় ধূসর; এইদিকেই ঘামে আর ফেনায় ভরে ওঠা ঘোড়াগুলোকে হাঁকানো

করে বাদাম, কিসমিস আর কিছু বিস্কুট। এই জ্যোৎস্নাতে, আবার এই ছায়াতে তার চলাফেরা আলতো আর চটপটে। বিছানায় শায়িত লোকটি কনুইতে ভর দিয়ে একটু উঠলেন।

'এইখানে এসো সাশা,' বললেন তিনি। সাশা অমনি তাঁর পায়ের কাছে বিছানার ওপর বসে পড়ল।

'বল তো সাশা, আমি যদি তোমায় সত্যি খুব জোর আঘাত দিই, যদি তোমায় মর্মান্তিক অপমান করি, তুমি কি আমায় ক্ষমা করবে?'

একটু থেমে কম্পিতকণ্ঠে সাশা উত্তর দিল:

'তোমার যা ইচ্ছে আলেক্সেই পেত্রোভিচ্। তোমার ভালোবাসার জন্যে কিন্তু আমি কৃতজ্ঞ।' এই বলে সে তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অনেকক্ষণ ধরে রাজকুমার আলেক্সেই পেত্রোভিচ্ ক্রাস্নপোলস্কী অন্ধকারের মধ্যে সাশার মুখের ভাবটা আঁচ করার চেষ্টা করলেন। তারপর মৃদু, প্রায় অলস কণ্ঠে বললেন:

'যাক্ গে, তুমি বুঝবে না। আমি আসাতে তুমি খুসী হয়েছে, কিন্তু জিজ্ঞেসও করলে না কোথা থেকে এসেছি, কেন এখানে তোমার বিছানায় শুয়ে আছি। এদিকে এখন তোমার এই বিছানায় আমার শোয়াটা কদর্য... হ্যাঁ, কুৎসিৎ, সাশা, ঘৃণ্য...'

'কী বলছ তুমি?' ভয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল সে। 'যেন আমি তোমাকে আসতে দিয়েছি তোমাকে ভালো না বেসে!'

'আরো কাছে এসো। এই বেশ ভালো,' বলে চললেন রাজকুমার সাশার নিটোল কাঁধ দুটি ধরে। 'আমি বলছি তুমি বুঝতে পারবে না, তাই চেষ্টাও কোরো না। শোনো, আজ সন্ধ্যায় আমার অনেক কথা হয়েছে একজনের সঙ্গে, যতক্ষণ চেয়েছি ততক্ষণ ধরে। আমার ভাল লেগেছে, খুব ভাল লেগেছে।'

'কুমারী ভোল্‌কভার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, তার সঙ্গে। আমি তার খুব কাছে বসেছিলাম, আর তোমার দেওয়া মদে যত না হয় তার চেয়ে বেশী নেশা লাগছিল আমার। জানো ত', কখনও কখনও লোকে স্বপ্ন দেখে যেন কেউ আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আমার তাকে ঠিক তেমনি মনে পড়ছে, যেন স্বপ্নে দেখা। এইমাত্র সেখান থেকে এসে ভাবছিলাম আমার সমস্তই সুখের হবে। কিন্তু কলিভানে ঢুকবামাত্র বুঝতে পারলাম যে কেবল তোমার দরজাতে গাড়িটা থামানোর অপেক্ষা আর আমার সমস্ত সুখ উড়ে যাবে জাহান্নমে। এখন বুঝতে পারলে? না? আমার আর তোমার কাছে আসা উচিত নয়। আমার ইচ্ছে তুমি আমায় যাহোক একটা বিষ দাও।'

সাশার হাতদুটো হতাশার ভঙ্গিতে দুপাশে ঝুলে পড়ল, মুখ নীচু করল সে।

'তোমার কি আমার জন্যে দুঃখ হয়, সাশা? সত্যি হয়?' জিজ্ঞেস করে রাজকুমার তাকে টেনে নিয়ে মুখে চুমো খেলেন, কিন্তু সে চোখ খুলল না কিম্বা চেপে রাখা ঠোঁট একটুও ফাঁক করল না। যেন পাথরের মূর্তি বসে আছে।

'থাক্, হয়েছে,' বললেন তিনি। 'আমি শুধু ঠাট্টা করছি।'

তখন মেয়েটি একেবারে মরিয়া হয়ে বলল:

'জানি, তুমি ঠাট্টা করে বলছ, কিন্তু তবু বিশ্বাস করি তোমায়। আমাকে কষ্ট দাও কেন? আমার অন্তরে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তুমি ঘা দাওনি। আমি জানি তুমি শুধু দয়া করে আমায় ভালোবাস। আমি ত' একটা চাষীর মেয়ে, জীবনের থেকে কীই বা আশা করতে পারি, সুখের আশা করব কী করে?'

হচ্ছিল। মাঝের ঘোড়াটার জোর কদমের সঙ্গে পাশের দুটোর সমতাল দৌড়ের শব্দ রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে স্পষ্ট ধ্বনিত হচ্ছিল। গাড়ির যাত্রী তাঁর বেতের ছড়িটা দিয়ে কোচওয়ানকে স্পর্শ করলেন। ঘোড়াগুলো পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। গাড়িটা থেমে গেল পান্থশালার সামনে।

লোকটি সফরের কম্বলটা পা থেকে সরিয়ে, কোচবাক্সের হাতলে ভর দিয়ে নেমে ঘাসের উপর খুঁড়িয়ে হেঁটে পান্থশালার নীচু অলিন্দের দিকে এলেন, মুখ ফিরিয়ে কোচওয়ানকে বললেন:

'তুমি যেতে পার। ভোরবেলায় ফিরে এসো।'

কোচওয়ান লাগাম আছড়াতেই গাড়িটা গড়গড় করে স্তেপ্'এর মধ্যে চলে গেল। লোকটি দরজার হাতল ধরে খটখট করে নাড়িয়ে অলিন্দের জীর্ণ থামটাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন যেন গভীর চিন্তামগ্নভাবে। তাঁর মুখ সরু পাণ্ডুর, টানা-চোখের নীচে কালি, খাটো কোঁকড়ানো দাড়ি, কিন্তু চিবুকটি ফাঁকা। ধীরে ধীরে ডানহাতের দস্তানা খুলে তিনি দরজায় আবার ঘা দিলেন।

বাইরের ঘরটার ক্যাঁচকেঁচে কাঠের মেঝেতে খালি পায়ে দ্রুত আসার শব্দ, দরজাটা অল্প একটুখানি ফাঁক হয়ে তারপর একেবারে হাট হয়ে খুলে গেল, দেখা গেল একটি চাষীর মেয়ে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে।

খুসীর উত্তেজনায় মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল:

'আলিওশেন্‌কা! আমি আশাই করিনি তুমি আসবে।' তারপর সলজ্জভাবে তাঁর হাত ছুঁয়ে কাঁধে চুমো খেল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন:

'সাশা, আমায় ভিতরে যেতে দেবে? আমি সকাল পর্যন্ত থাকব।' তারপর ঘাড় নেড়ে পান্থশালার জ্যোৎস্নালোকিত বাইরের ঘরে ঢুকলেন।

সাশা আগে আগে চলল, নবীন সুন্দর মুখে হাসি টেনে বারে বারে ফিরে তাকাতে লাগল। দেখা যেতে লাগল তার সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলি।

'তোমায় দুপুরে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে গাড়ি চড়ে যেতে দেখলাম। ভাবলাম, কর্তা ভোল্কভের ওখানে যাচ্ছ। ভাবলাম ওরা তোমায় সেখানে রাত কাটাতে বলবে, কিন্তু তুমি বুঝি এখানে এসে গেছ, আমাকে দেখতে...'

'পান্থশালায় কোন অতিথি আছে?'

'কেউ নেই,' সাশা উত্তর দিল গ্রীষ্মে থাকার ঘরে যেতে যেতে। 'গাড়ি নিয়ে কয়েকটা চাষী এসেছে বটে, কিন্তু তারা সবাই বাইরে ঘুমোচ্ছে,' এই বলে সে কাঁথার লেপ ঢাকা মস্ত বিছানাটায় বসে পড়ে মিষ্টি হাসল।

ছোট জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ল সাশার মুখে, একটু ওপরদিকে তোলা তার ঠোঁটের কোণে আর কালো পোষাকের নীচু ছাঁটের জন্য স্পষ্ট হয়ে ওঠা লম্বা গলায়; তার বুকে দুলছিল একটা কারুবার মালা।

'একটু মদ আনো,' আগন্তুক বললেন।

টুপি আর ছড়িটা হাতে নিয়েই তিনি ছায়াতে দাঁড়িয়ে রইলেন। সাশা চটপট লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি মাথার পিছনে দুইহাত রেখে। দেখতে দেখতে ভ্রূভঙ্গিতে তাঁর মুখটা বিকৃত হল। পাশ ফিরে একটা বালিশ আঁকড়ে তিনি তাতে মুখ গুঁজলেন।

সাশা ফিরল একটা ছোট কাপড়-ঢাকা টেবিল বয়ে, তার ওপর রাখল একটা মিষ্টি ভোদ্‌কা আর একটা অন্যরকম মদের বোতল; তারপর কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে ভাঁড়ার থেকে নামিয়ে আনল একটা রেকাবিতে

সেই মুহূর্তে বাইরে একটা মোরগ জোরে ডেকে উঠল। একটা আধোঘুমন্ত ঘোড়া আস্তাবলের কাঠের মেঝেতে পা ঠুকল। প্রভাতের অস্পষ্ট আলোতে রাজকুমারের শীর্ণ কিন্তু সুঠাম মুখ অল্পে অল্পে দেখা যেতে লাগল। তাঁর বড় বড় চোখ দুটো বিষণ্ণগম্ভীর, ঠোঁটে একটু ব্যঙ্গের হাসি লেগে আছে।

সাশা অনেকক্ষণ ধরে তাঁকে দেখল, তারপর তাঁর হাতে কাঁধে মুখে চুমো খেতে লাগল, তাঁর পাশে শুয়ে পড়ল নিজের সতেজ উন্মাদনাময় দেহের আলিঙ্গনে তাঁকে উষ্ণতায় ভরে।

২

গাঁয়ের অপরদিকে একটা আগাছাভরা, কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট উঠানের মধ্যে নতুন কাঠের ঘরে ডাক্তার জাবোত্‌কিন্ স্টোভ-সংলগ্ন তক্তার বিছানায় শুয়েছিলেন।

নীচে থেকে দেখা যাচ্ছিল শুধু তাঁর মাথা, লাল খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা চিবুকটা দুই হাতের মুঠোয় ভর দেওয়া। একই রকম ঝাকড়া লাল চুলের গোছা চারদিকে ছড়িয়ে আছে মাথার থেকে, কপাল চোখ অবধি ঢেকে, ঘুমে ফোলা মুখ ধোয়া হয়নি।

ডাক্তার গ্রিগোরী ইভানভিচ্ জাবোত্‌কিন্ চোখ কুঁচকে মেঝের কাঠের একটা গাঁট লক্ষ্য করে তক্তার ওপর থেকে থুথু ফেললেন।

তাঁর সামনে টিনের দেওয়াল-বাতিটার নীচে বেঞ্চটায় একজন যাজক বসেছিলেন, দেখতে ছোটখাট, শান্ত বিনয়ী চেহারা, কালোচুলের বেণীতে পাকের অল্প ছোপ ধরা। তাঁর পুরোহিতের পোষাকের হাতাগুলো কোঁচকানো তেলচিটে। হাতদুটো তাতে ঢুকিয়ে ফাদার ভাসীলী মুখ বিকৃত করে চুপচাপ বসে ডাক্তারের থুথুফেলা লক্ষ্য করছিলেন।

অবশেষে তিনি বললেন:

'[illegible] বছরে মানুষ কত নীচে নামতে পারে।'

[illegible]ভাবে গ্রিগোরী ইভানভিচ্ বলে উঠলেন:

'আপনার বুঝি পছন্দ নয়? ছোটবেলা থেকে এটা আমার একটা অভ্যাস: যখন একেবারে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে উঠি তখন কোন একটা [illegible]কর জায়গায় চড়ে উঠে থুথু ফেলি। আপনার ভাল না লাগে দেখবেন না। এর জন্য আমার একটা পছন্দসই জায়গাও ছিল— গোলাঘরের কাছে, যেখানকার ঘাসগুলো খুব নরম। আমাদের মাদী কুকুরটা সর্বদাই সেইখানে বাচ্চা দিত। বাচ্চাগুলোর গা কী গরম, কেমন দুধের গন্ধ বেরোত তাদের গা থেকে। কুকুরটা তাদের চাটত আর সেগুলো কেঁউ-কেঁউ করত। কুকুর হয়ে জন্মানো বেশ, সত্যিই বেশ ভাল।'

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ফাদার ভাসীলী বললেন:

'গ্রিগোরী ইভানভিচ্, তুমি একটি মূর্খ। আমি বরং যাই।'

'আমার আধ্যাত্মিক শান্তির ব্যবস্থা না করে আপনার যাবার অধিকার নেই। সরকার আপনাকে টাকা দেয় সেই জন্য।'

'তোমার বয়স কত?'

'আটাশ।'

'তুমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়েছ, বয়স তোমার এখনও কম, পেশা ত' যাজকের নয়। আরে, তোমার জায়গায় আমি হলে সারাদিন হেসে কাটাতাম। কিন্তু তুমি? তোমার ধারণাগুলো নিয়ে তুমি কোন কাজে লাগ? খালি বিছানায় শুয়ে থুথু ফেলছ।'

'ফাদার ভাসীলী, একসময় আমার মাথায় অদ্ভুত ভাল সব ভাব আসত।' গ্রিগোরী ইভানভিচ্ পাশ ফিরে চিৎ হয়ে হাত দুটো তক্তা থেকে ছড়িয়ে দিয়ে আঙুল মট্‌কে হাই তুলে বললেন:

'সত্যিই কিন্তু ভোদ্‌কা আমার ধাতে সয় না।'

'ছ্যা।' বললেন ফাদার ভাসীলী, অতি সন্তর্পণে পোষাকের পকেট থেকে একটা টিনের সিগারেট-কেস বার করে, হাওয়ার মধ্যে দেশলাই জ্বালানো যাদের অভ্যাস তাদের মতো দেশলাই'এর কাঠিটা আধমুঠো দুই হাতের মধ্যে ধরে সিগারেট ধরালেন, তারপর কাঠিটা আঙুলে বারকয়েক ঘুরিয়ে বেঞ্চের নীচে ছুঁড়ে ফেললেন। 'বিশ্বাস করো, গাঁয়ে আর বুদ্ধিজীবী লোক থাকলে আমি কখনো তোমার এখানে আসতাম না।'

বসন্তকালে যখন কলিভানের হাসপাতালটা পুড়ে গেল, তখন থেকে ডাক্তার আর ফাদার ভাসীলীর মধ্যে এই ধরনের কথাবার্তা ক্রমাগত হয়েছে। গ্রিগোরী ইভানভিচ্ তখন তাঁর কম্পাউণ্ডারের হাতে সমস্ত কাজের ভার তুলে দিয়ে নতুন হাসপাতাল তৈরী না হওয়া পর্যন্ত জেম্স্তভো'র সময়মতো ভাড়া নেওয়া এই ছোট কুঁড়েঘরটাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

তিনবছর আগে গ্রিগোরী ইভানভিচ্ তার প্রথম কাজে বহাল হন কলিভানে। তিনি আরম্ভ করেছিলেন অতি আগ্রহের সঙ্গে, সমস্ত গাঁয়ে গাড়ি চড়ে ঘুরে রোগীদের চিকিৎসা করতেন, এমনকি তাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন। ভেসে যাওয়া কাদাভরা নোংরা রাস্তা চষে বেড়িয়ে, জানুয়ারির রাত্রে যখন মরা বরফের ওপর মরা চাঁদ আলো ফেলত তখন হাড়কাঁপানো কনকনে হাওয়ার মধ্যে ঘুরে ঘুরে, চীৎকার-করা, সারা গা দগদগে শিশুতে ভরা গুমোট কুঁড়েগুলোর মধ্যে উঁকি দিয়ে, পাহারের নীচে অন্ধকার স্নানের ঘরে রোরুদ্যমান প্রসববেদনাকাতর মেয়েদের চীৎকারে আর চোখ-জ্বালা-করা ধোঁয়ায় পাগলের মতো হয়ে জেম্স্তভোতে আরো ওষুধ, আরো ডাক্তার, আরো টাকার জন্য আকুল চিঠি লিখে ক্রমশ টের পেয়ে গেলেন যে তিনি যতই না করুন, সমস্ত গাঁয়ের অতল দারিদ্র্য, সর্বনাশ আর অব্যবস্থার

মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে; অবশেষে দেখলেন তিনি একা, সম্বল মাত্র একশিশি ক্যাস্টর-অয়েল। এদিকে তাঁর এলাকা দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে ষাট ভার্স্ত, যেখানে শতশত শিশু হাম-জ্বরে মারা যায়, বড়রা মারা যায় না খেতে পাওয়ার দরুণ টাইফাস রোগে। একশিশি ক্যাস্টর-অয়েলে হবেই বা কী আর তাতে তাঁর প্রয়োজনই বা কী। তারপর হাসপাতালটা গেল পুড়ে, আর তিনি ক্যাস্টর-অয়েল মাটিতে ঢেলে ফেলে তাঁর তক্তায় উঠে আশ্রয় নিলেন।

ফাদার ভাসীলী চোখের ওপর একে একে তিনজন ডাক্তারকে এই ভাবে উচ্ছন্ন যেতে দেখে জাবোত্‌কিনের জন্য বড় অনুকম্পা বোধ করতেন, এবং প্রায় প্রতিদিন তাঁর কাছে গিয়ে কোন না কোন উপায়ে, একটা সিগারেট দিয়ে কিম্বা একটা মজার গল্প শুনিয়ে, তাঁকে ঠিক সান্ত্বনা দেবার জন্য নয়—কারণ ভস্মাবশেষ ছাড়া যার আর কিছুই রইল না সেই লোককে সান্ত্বনা দেওয়া যায় কী করে—অন্তত তাঁকে একটুখানি হাসাবার চেষ্টা করতেন: আর কিছু না হোক, একটু হাসি ফুটুক তাঁর মুখে।

গ্রিগোরী ইভানভিচ্ হাই-তোলা বন্ধ করে ফের উপুড় হয়ে হাত নামিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট চাইলেন।

উত্তরে ফাদার ভাসীলী "আজই আমি কুর্বেনিওভ্ থেকে সিগারেট কিনেছি," এই বলে তক্তাটার তলায় ডিঙি মেরে দাঁড়িয়ে সিগারেট-কেসটা তুলে ধরলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সেটার একটা চোরা টিপকল টিপলেন।

যদিও গ্রিগোরী ইভানভিচ জানতেন সেটার একটা লোক-ঠকানো চোরা খোপ আছে, তিনি ভান করলেন যেন সেটার কথা তাঁর মনে নেই—খালি খোপটাতে সিগারেটের জন্যে হাতড়াতে লাগলেন...

ফাদার ভাসীলী এইভাবে ঠকাতে পেরে খুব খুসী হয়ে একগাল হেসে বললেন:

'এই যে তোমার জন্য ''ক্রিম্যান্‌স্‌'' সিগারেট রয়েছে, নাও একটা। জান, আজ আমি ভোল্‌কভের ওখানে গিয়েছিলাম।'

'লোকে বলে আপনার ঐ ভোল্‌কভটা একটা পশু, একটা আস্ত জানোয়ার।'

'একেবারে মিথ্যে কথা। লোকে কী আজেবাজে না বকে। খাসা লোক ও, বাঁচতে জানে... এইরকম লোকেদের তোমার নজর করে দেখা উচিত গ্রিগোরী ইভানভিচ, তাহলে তুমি কেবল স্টোভের ওপর শুয়ে কাটাতে না। আর তার মেয়ে একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভ্‌না, বললে বিশ্বাস করো, সত্যিকারের সুন্দরী, ভগবানের অপরূপ সৃষ্টি... আমি যদি শিল্পী হতাম তাহলে তাকে দেখে মেরী মাদ্‌লেন আঁকতাম, তিনি যখন বরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছেন।'

হঠাৎ গ্রিগোরী ইভানভিচ বাধা দিলেন:

'বরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছে তার মানে কী?'

'তুমি শোননি? মহান শিল্পীরা সব সময়েই তাঁদের ছবিতে ঐ হাসিটি এঁকেছেন। অক্ষতযোনি কুমারী, প্রেম ও জীবনের পাত্র, সর্বদাই অপরূপ হাস্যময়ী, যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে দেবদূত তাঁর গর্ভের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাচ্ছেন। ঠাট্টা করছি না। তুমি হেসো না এ কথায়।' ফাদার ভাসীলী ভ্রূ তুলে সিগারেটে টান দিয়ে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আবার বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কিছুক্ষণ মৌন হয়ে বসে গেলেন।

গ্রিগোরী ইভানভিচ কিন্তু হাসছিলেন না। চুপচাপ চোখ বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে তক্তাটার ওপর শুয়ে রইলেন কারণ,

ডাক্তার হোক, তাঁর বয়স মোটে আটাশ, এবং কথাচ্ছলে হলেও, অক্ষতযোনি কুমারীর হাসির উল্লেখ এখনও তাকে বজ্রকঠোরভাবে নাড়া দেয়।

৩

ঘন নীল আকাশে ফুটফুটে জ্যোৎস্নার যেন শেষ নেই। সেই জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের ফুটোফাটল দিয়ে, বন্ধ চোখের পাতার মধ্যেও, শোবার ঘরে, গোলাঘরে, বুনো জন্তুজানোয়ারদের গুহায়, পুকুরটার একেবারে তলা পর্যন্ত, যেখান থেকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মাছগুলো উঠে আসছে, গোল গোল মুখ হাঁ করে জলের ওপরিভাগ স্পর্শ করছে।

সেই রাত্রে পায়ের চাপে দলিত পাড়ওয়ালা পুকুরটার ওপরেও চাঁদ ভেসে আছে। পুকুরটা দেখাচ্ছে যেন ভোলকভের গভীর ছায়াঘন গাছপালা-ভরা বাগানের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা একটা আলোর পাখা।

জলের ধারে ঘাসের ওপর ভেড়ার চামড়ার কোটটা বিছিয়ে তার ওপর কনুই রেখে একজন কাঁধ-চওড়া দাড়িওয়ালা সহিস শুয়ে বিশ্রাম করছে। আস্তাবলের এক ছোকরা কাছেই ঘোড়ার জিনে বসে বসে ঢুলছে, তার ধূসর ঘোড়াটা আধোঘুমন্ত অবস্থায় মাথা নাড়িয়ে খলীনের শব্দ করছে। অন্য ঘোড়াগুলো লম্বা চোরকাঁটা আর সোমরাজে ভরা নীচু মাঠে চরছে, বাচ্চা ঘোড়াগুলো পাশ ফিরে মাটিতে শুয়ে লম্বা ঠ্যাং দিয়ে নিজেদের মাথা স্পর্শ করছে।

কাফতান-পরা এক বুড়ো বাঁধের ওপরকার উঁচু উইলো গাছগুলোর দিক থেকে পাড়ের ওপর ধীরে ধীরে হেঁটে এল। সহিসের কাছে এসে থেমে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কী যেন দেখতে অথবা শুনতে লাগল...

'আজ রাত্রে সত্যিই গরম,' বলল সে।

অলসভাবে সহিস জিজ্ঞেস করল:

'কীসের জন্য তুমি এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ কন্দ্রাতী ইভানভিচ্? কোনকিছুর জন্য উতলা হয়েছ নাকি?'

'ঘুম আসছে না তাই একটু বেড়াতে বেরিয়েছি।'

'খুব ভাবো বুঝি?'

'হ্যাঁ, তা একটু ভাবি বৈকি ... এই সব জায়গাগুলোতে সারাজীবন ঘুরেছি যেন চাকায় বাঁধা হয়ে—এই বাড়ি আর চারপাশের সমস্ত জায়গায়। হেঁটে হেঁটে তলার পাথর পর্যন্ত মাটি ক্ষইয়ে ফেলেছি ... তাই পুরোনো পথে পা আপনি চলে আসে। বোধ হয় মরার সময় এসেছে, তাই না?'

'তোমার জিরোবার সময় হয়েছে, কন্দ্রাতী ইভানভিচ্, পেন্সন নেবার সময়।'

'কর্তা আবার চেঁচামেচি করেছেন,' নীচু গলায় বলল কন্দ্রাতী। 'সন্ধ্যায় রাজকুমার আবার এসেছিলেন। গাড়িটা পুকুরের পিছনে রেখে একটা নৌকো নিয়ে গ্রীষ্ম কুঞ্জে চোরের মতো চুপিচুপি গিয়ে দিদিমণির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন ... জোঁকের মতো লেগে থাকেন, বড় ভয়ানক লোক বলতে গেলে।'

'আরে কন্দ্রাতী ইভানভিচ, উনি হলেন রাজকুমার। তুমি আমি মাইনে নিয়ে খাটি, নিজেদের বেচে ফেলেছি, তাই মুখ বুজে থাকি— ওঁর কিন্তু যা ইচ্ছে তাই করেন। বলে নাকি ওঁর বাড়ি থেকে অতিথি বিদায়ের সময় তোপ দাগা হয়।'

'আরে সে ত' খারাপ কিছু নয়, কিন্তু এখানে শুধু শুধু আসেন অথচ বিয়ের কথা তোলেন না কেন? দিদিমণির চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ...'

কন্দ্রাতী ইভানভিচ থামল। সহিস কোটটার ওপর উঠে বসে চারিদিকে তাকিয়ে আস্তাবলের ছোকরাটাকে হাঁকল :

'মীশ্‌কা , ঘুমোসনে , ঘোড়াগুলো পালিয়েছে।'

জিনের ওপর ছোকরার ঘুম ভেঙে গেল। সে মাথাটা ঝাঁকিয়ে জিভে টক্‌টক্‌ শব্দ করে চাবুকটার সপাং আওয়াজ করতেই ঘোড়াটা কয়েক পা হেঁটে মাথা নীচু করে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। আবার দু'জনে ঘুমিয়ে পড়ল , রাত্রিটা এমনই গরম আর শান্ত।

কন্দ্রাতী চুপচাপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে "হুঁ, ব্যাপারটা এই রকমই", বিশেষ অর্থপূর্ণভাবে এই কথা বলে আবার বাগানের দিকে চলে গেল।

সেই বাজ-পড়া পুরোনো উইলো গাছ , কঞ্চির বেড়া , খালের সরু পথ , রাস্তা , গাছগুলোর অস্পষ্ট চেহারা , সমস্তই তার অতি পরিচিত আর প্রত্যেকটাই যেন সুখের আর দুঃখের পুরোনো স্মৃতির ভাণ্ডার খোলার চাবি ; যদিও সত্যি তার পুরোনো কথা ভেবে দেখলে সুখের স্মৃতি থাকত অল্পই।

কন্দ্রাতী খাস চাকর ছিল ভাদীম আন্দ্রেয়েভিচ্ আর আন্দ্রেই ভাদীমীচের , এমনকি ভাদীম ভাদীমীচ্ ভোল্‌কভের কথাও তার মনে পড়ে , যদিও স্বপ্নেও তাঁর কথা মনে পড়লে এখনো সে ভয় পায়! গোঁফদাড়িসুদ্ধু তিনি এমনই ভয়ঙ্কর লোক ছিলেন , কিছুতে মেজাজ সামলাতে পারতেন না। ছোটখাট জমিদারদের অপদস্থ করবার জন্যে তিনি একজন অতিশয় মুখফোঁড় ভাঁড় — "রেশেতো" , আর এক মূর্খ মোসাহেবকে পুষতেন। এরাই কন্দ্রাতীর বাপমা , তাই জন্মের থেকে সে পেয়েছিল ভোল্‌কভদের সবায়ের প্রতি ভয় আর ভক্তি।

বর্তমান আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচের বাবা ভাদীম আন্দ্রেয়েভিচ্ লেখাপড়ার খুব ভক্ত ছিলেন। তিনি "ধর্মপরায়ণ শ্রমিক" নামে

চাষাদের জন্য একটা পুস্তিকাও প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু দাসপ্রথা উচ্ছেদের ঘোরতর বিরোধী তিনি ছিলেন। একদিন তিনি রাখাল কানা ফেদ্‌কাকে ঘরে ডেকে আনতে হুকুম করে তাকে রেশমী ঢাকামোড়া সোফায় বসিয়ে হাতে একটা সিগার দিয়ে বললেন, "ফিওদর ইভানভিচ্, আপনি এখন স্বাধীন ও মুক্ত ব্যক্তি। আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই, আপনি যেখানে খুসী যেতে পারেন্, কিন্তু যদি আমার অধীনে কাজ করতে চান তাহলে দয়া করে বলুন, আপনাকে আস্তাবলে কষে চাবুক লাগানো হবে — শেষবারের মতো"। ফেদ্‌কা কিছু ভেবেচিন্তে বলল, "বহুৎ আচ্ছা"।

ভাদীম আন্দ্রেয়েভিচের বাবা আন্দ্রেই ভাদীমীচের অধীনে কন্দ্রাতী চাকরী আরম্ভ করল বাড়ির ছোকরা চাকর হিসেবে। কর্তা ছিলেন মোটা আর বিরস মেজাজের। তিনি স্নান করতে খুব ভালোবাসতেন এবং প্রায় অতিথি অভ্যাগত আর ছুঁড়ী চাকরানীদের নিয়েই উলঙ্গ হয়ে স্নানের বাড়িতে মদ খেয়ে মাতাল হতেন। সেই স্নানের বাড়িতেই তাঁর চাকরবাকর তাঁকে পুড়িয়ে মারল।

এই আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ্ ভোলকভ সে-রকম ছিলেন না। ইনি ছিলেন এককাঠি ছোট। আবার যে আমলে তিনি বড় হয়েছিলেন তখন বড়লোকদের অবস্থা পড়তির মুখে, কাজেই চরমে ওঠা অসম্ভব ছিল তাঁদের পক্ষে।

কন্দ্রাতী যে আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ্‌কে ভয় করত না তা নয়, শুধু যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত না তাঁকে, কিন্তু সে মনেপ্রাণে ভক্ত ছিল তাঁর মেয়ে কাতিউশার, জেলার মধ্যে সেরা সুন্দরী সে।

কন্দ্রাতী বাঁধ পার হয়ে খালের মধ্যে দিয়ে হেঁটে কঞ্চির বেড়া টপকে ধীরে ধীরে ভিজে আর অন্ধকার তরুবীথিকা ধরে চলতে লাগল।

বাগানে সব চুপচাপ। থেকে থেকে কোন পাখি শুধু নিওেন গাছের ডালে নড়ে উঠে আবার চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ছে, গেছোব্যাঙগুলো মৃদু আর বিষণ্ন সুরে ডাকছে, দু'একটা মাছ পুকুরে লাফাচ্ছে।

আকারে ডিমের মতো পুকুরটার চারিধারে পুরোনো উইলো গাছগুলো এত ঘন আর এত লতানে ডালপালায় ভরা যে পাতার ফাঁকে চাঁদের আলো ঢুকতে পারে না। পুকুরের ঠিক মাঝখানটায় কেবল খেলা করছে চাঁদের আলো, যেখানটায় কাঁচের মতো জলে ভাসছে একটা হাঁস কিম্বা বাচ্চা কাক ছড়ানো ডানা দিয়ে কোনোরকমে নিজেকে ভাসিয়ে রেখেছে—জল অনেক খেয়েছে।

বীথিকার শেষপ্রান্তে পৌঁছে কন্দ্রাতী বাঁয়ে উঁকি দিল, যেখানে শতকালের পুরোনো হেলে-পড়া গ্রীষ্ম কুঞ্জ পুকুরের ধারে ঘন ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে সে দেখল একটি অস্পষ্ট স্ত্রীমূর্তি সাদা শাল জড়িয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা শুকনো গাছের ডাল কন্দ্রাতীর পায়ের তলায় মড়মড় করে উঠতেই মেয়েটি চকিতে ফিরে উত্তেজিতকণ্ঠে বলল:

'কে? আপনি ফিরে এসেছেন?'

'আমি, কাতিউশা,' কন্দ্রাতী গলাখাঁকারি দিয়ে বলে সাঁকোর দিকে এগিয়ে গেল।

চিবুক অবধি শাল দিয়ে ঢেকে একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভ্‌না চাপ্‌কাপায়ে তক্তার ওপর দিয়ে হেঁটে পাড়ে এসে কন্দ্রাতীর সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল। বলল:

'তোমারও কি ঘুম আসছে না? আমার ঘরে এত মশা যে ঘুমোতে পারলাম না। চলো, আমায় ঘরে নিয়ে চলো।'

কন্দ্রাতী কড়াস্বরে বলল:

'মশা হোক আর যাই হোক, তবু সোমত্ত মেয়ের পুকুরের ধারে একলা রাত্তিরে বেরোনো ভাল নয়...'

কাতিউশা সামনে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে প্রশ্ন করল:

'এ কেমন সুর কন্দ্রাতী?'

'এমনি। আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ্ আজ আমাকে বকেছেন। খুব বকেছেন আর তার যথেষ্ট কারণ ছিল: রাতের বেলায় ঘুরে বেড়ানো মোটেই উচিত নয়, আপনি নিজেই জানেন সে-কথা...'

কাতিউশা মুখ ফিরিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলতে লাগল, তার পোষাকের প্রান্তভাগ ছুঁয়ে যেতে লাগল ভিজে ঘাসগুলোকে।

'আজ রাতের কথা বাবাকে কিছু বোলো না লক্ষীটি।' চুপিচুপি এইকথা হঠাৎ বলে কন্দ্রাতীর শুকনো গালে চুমো খেল সে।

তরুণীকে নিয়ে এল কন্দ্রাতী বাড়ির বারান্দা পর্যন্ত, সেখান থেকে উঠে গেছে ছ'টা মোটা মোটা থাম; মাঝে মাঝে পলস্তারা খসে গেছে সেগুলোর, তাদের মাথাগুলো চাঁদের আলোয় নীলচে দেখাচ্ছে। যতক্ষণ না একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল ততক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর একটু কেশে কোণটা ঘুরে ছোট একটা অলিন্দ হয়ে ঝোপের সামনে জানালা-দেওয়া তার ছোট কামরাটির দিকে চলে গেল।

একটুকরো বনাত দিয়ে ঢাকা সিন্দুকের ওপর সে বসতে না বসতেই বাড়ি কাঁপিয়ে আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচের বদমেজাজী গলা শোনা গেল:

'কন্দ্রাতী।'

অভ্যাসমতো বুকে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে কন্দ্রাতী ছুটে চলল লম্বা বারান্দা ধরে সেই দরজার দিকে যার পিছনে কর্তা হাঁক দিচ্ছিলেন।

দরজার হাতলে হাত দিয়েই কন্দ্রাতী ধোঁয়ার গন্ধ পেল। ঘরে

ঢুকে মিটমিট করা বাতিগুলোর হলদে আলোয় ঘন ধোঁয়ার মধ্যে দেখতে পেল আলেক্সান্দ্র ভাদীমীর্চকে। কর্তার গায়ে বুকখোলা সার্ট, তার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে মোটা লোমশ বুক, মুখখানা লাল টকটকে। তিনি ঝুঁকে রয়েছেন একটা মাটির ধুনুচির ওপর আর তা থেকে পীট পোড়া ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। ঠেলে বেরিয়ে আসা হতভম্ব চোখে কন্দ্রাতীর দিকে চেয়ে ভোল্‌কভ ধরা গলায় বললেন:

'মশারা আমাকে একেবারে খেয়ে ফেলল। ক্‌ভাস এনে দাও খানিক।' কন্দ্রাতী দরজার দিকে ফিরতেই তিনি চীৎকার করে বললেন:

'দেব তোমায় আচ্ছা করে, পাজি কোথাকার! রাতে জানালাগুলো বন্ধ কর না কেন?'

'মাপ চাইছি হুজুর,' বলেই কন্দ্রাতী নীচের ভাঁড়ারে দৌড়ল ক্‌ভাসের জন্য।

# অপ্রত্যাশিত ভাবাবেগ

## ১

গ্রিগোরী ইভানভিচ জাবোত্‌কিন অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন তক্তার ওপরের ছেঁড়া ন্যাকড়া, জঞ্জাল, সিগারেটের টুকরো আর ধূলোর দিকে, তারপর ভারী বাতাসটা নাক দিয়ে জোরে টেনে নিয়ে দপদপে মাথাটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ধীরে ধীরে, যেন শরীরে হাড়গোড় নেই — খালি ভারী একতাল মাংসপিণ্ড, ভ্রূ কুঁচকে স্টোভ থেকে নামলেন পা-দানিগুলো পায়ে হাতড়ে হাতড়ে।

মেঝেতে নেমে গ্রিগোরী ইভানভিচ পেণ্টুলেন টেনে কষে নিয়ে বাতির নীচে আয়নার টুকরোটার সামনে ঝুঁকে দেখলেন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে একটা তেলচট্‌চটে হলদে মুখ, হতভম্ব ঘোলাটে নীল চোখ আর চারপাশে ছড়ান গোছা গোছা মাথার চুল।

'মুখটা কী যাচ্ছেতাই!' বলে গ্রিগোরী ইভানভিচ চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে চোখের ওপর থেকে সেগুলো পিছনে সরিয়ে টেবিলে বসে পড়লেন কনুই'এর ভর দিয়ে।

এমন কতকগুলো স্মৃতির টুকরো আছে যা মনের মধ্যে থেকে যায়, কতকগুলো ভাবনা যেন জমিয়ে রাখা জলার পাঁকের মতো থিকথিকে আর পচা ঘা'র মতো কুৎসিৎ। কেউ যদি মনের তলা থেকে সেগুলোকে উপড়ে ফেলতে পারে, সেগুলোর ধাক্কা সহ্য করে তার থেকে উদ্ধার পেতে পারে, তাহলে তার অন্তরের সবকিছু যেন সজাগ নির্মল হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি সেগুলো নিয়ে শুধু নাড়াচাড়া করে, কনকনে দাঁতের মতো আলতোভাবে স্পর্শ করে, পচা ঘায়ের গন্ধ বার বার শুঁকে নিজেকে ঘৃণা করার মধুর বেদনা পেতে চায় তাহলে সে-মানুষ দ্বিতীয়বার চিন্তার অযোগ্য, কারণ তার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে নোংরামি, কেউ তার মুখে থুথু দিলে সে খুসী হয়।

গ্রিগোরী ইভানভিচ পুরোনো স্মৃতিগুলো কিছুতে ছাড়তে চান না — তিনবছরে এরকম স্মৃতি অনেক জমে উঠেছে। তা ছাড়া যার মন এখনো সম্পূর্ণ পেকে ওঠেনি তার পক্ষে শুধু রোগী, দুর্দশাপন্ন আর যন্ত্রণাকাতর' মানুষ ছাড়া আর কিছু দেখতে না পাওয়ার মধ্যে প্রায়ই বিপদ আছে। এদিকে গত তিনবছরে গ্রিগোরী ইভানভিচ অত্যধিক সংখ্যায় প্রসববেদনা ও প্রহারে জর্জরিত চাষীর মেয়ে, অত্যধিক ভোদ্‌কা পানের ফলে কালো হয়ে যাওয়া চাষার দল এবং নোংরামি, অনাহার আর উপদংশে লুটোপুটি খাওয়া খোস পাঁচড়াধরা

শিশু দেখেছেন। গ্রিগোরী ইভানভিচের মনে হয়েছে সমস্ত রাশিয়াই এই রকম যন্ত্রণাকাতর, কালো আর ঘেয়ো। তাই যদি হয় আর এর থেকে উদ্ধারের কোন উপায় না থাকে তাহলে সব জাহান্নমে যাক্। আর সবকিছুই নোংরা আর দুর্গন্ধময় কারণ এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। সুতরাং যখন সত্যিই মানুষ আসলে শুয়োরের মতো ছাড়া কিছু নয় তখন নিজেকে মানুষ বলে ভান করার কোন মানে হয় না।

"এই হল ব্যাপার, একেবারে দস্তখত করা ছাপমারা দলিলের মতো পাকা," ভাবলেন তিনি আর মুখের সামনে নাড়লেন নিজের কৃশ হাতখানা। "আমি আত্মহত্যা অবশ্যই করব না, কিন্তু নিজের জীবনকে উন্নততর করবার জন্য একটাও আঙুল নাড়ব না। আমায় সান্ত্বনা দিতে ভোলকভের মেয়ের কথা পর্যন্ত বলে বাহাদুরি নিয়েছে। শোনো ফাদার ভাসীলী, তোমাদের ঐ ভোলকভ-কন্যাকে একবার নিয়ে যেতে চাই যেখানে টাইফাস ছড়ানো, তারপর দেখব কেমন সে "বরের দিকে তাকিয়ে হাসে"..."

গ্রিগোরী ইভানভিচ ক্রূর হাসি হেসে তারপর ভাবলেন হয়ত তাঁর ভুল হচ্ছে...

"হয়ত তরুণী মহিলাটি কখনো কিছু দেখেননি, কিছুই জানেন না—যেন গরমঘরে রাখা ফল... তাকে সমর্থন করার এটা একটা কথা বটে... কিন্তু পাদ্রীটা আমাকে পাগল করে দেয়... দেখাও দেখি কোথায় তোমাদের সব সত্য ও শিব। মানুষ জন্মায় নোংরার মধ্যে, শুয়োরের মতো থাকে আর মরে যখন তখন তার মুখে লেখে থাকে অভিশাপ... এই দুস্তর মহাপঙ্কের মধ্যে একফোঁটাও আলোর রশ্মি দেখা যায় না। আমি যদি সাধুলোক হই তাহলে জীবন নামে এই কুৎসিৎ পদার্থের ওপর অকপট ভাবে সোজাসুজি থুথু ফেলা উচিত, এবং তা ফেলা উচিত সবচেয়ে প্রথমে আমার নিজের মুখে..."

সত্যিই গ্রিগোরী ইভানভিচ মেঝের মধ্যিখানে থুথু ফেলে জানালার দিকে ফিরলেন আর দেখলেন ভোর হয়ে আসছে।

কী জানি কেন তিনি এটা একেবারে প্রত্যাশা করেননি, তাই অবাক হলেন। টেবিল ছেড়ে উঠে উঠানে গিয়ে ঘাস আর ভিজে মাটির তীব্র গন্ধ নাকে টেনে নিয়ে ভুরু কোঁচকালেন যেন তাতে তাঁর কতকগুলো ধারণা ভাবনা মরে গেল। তারপর ধীরে ধীরে কঞ্চির বেড়া ধরে নদীর পাশের জলামাঠের দিকে চললেন।

ছোট বাড়ি আর উঠানটার দুই পাশ দিয়ে প্রসারিত বেড়াটা নদী পর্যন্ত চলে গেছে, যেখানে উইলো গাছ দুটো। একটার কেটে-ফেলা মাথা থেকে অনেক নতুন ডালপালা গজাচ্ছে, আর একটা সরু নদীর ওপর নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়েছে।

আকাশ তখনও অন্ধকার, কিন্তু পূবদিকে, পৃথিবীর প্রান্তসীমায় ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে পড়ছে। এই আলোতে চালাঘরের মাথা আর গাছগুলো আরো স্পষ্ট, আরো পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে।

গাঁয়ের মোরগগুলো ডেকে উঠল, তার জবাব দিল গ্রিগোরী ইভানভিচের উঠানের মোরগটা। ঘাসের তীব্র গন্ধ বয়ে, উইলো গাছের পাতাগুলোকে ছোট ছোট নৌকোর মতো দুলিয়ে সরসর শব্দ তুলে জোরে বাতাস বইল।

'সব ঝুট্ হ্যায়, আসলি জিনিস কিছু নেই এতে,' বিড়বিড় করে বলে গ্রিগোরী ইভানভিচ গাছের পাশে দাঁড়িয়ে একমনে দেখতে লাগলেন কেমন করে পূবের দিকে সোনালি আভা রাতের অন্ধকারকে তাড়িয়ে আকাশকে প্রথমে ধূসর, তারপর নদীর জলের মতো সবুজ এবং ক্রমশ নীল করে দিচ্ছে, কেমন একটা প্রকাণ্ড তারা তখনও সেই আভায় দপদপ করছে দিকচক্রবালের খুব কাছে। এ সব তাঁর কাছে এতই অসাধারণ লাগল যে তিনি হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

হঠাৎ আগুনের গোলার মতো সূর্য উঠল স্তেপের ওপর, অমনি আগুন-রঙা পূব-আকাশে তারাটা মিলিয়ে গেল।

নদীর ওপর কুয়াশার বাষ্প কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। হাওয়ায় ধূসর ঘাসের ওপর ফিকে নীল ছায়ার লুকোচুরি। নদীর ওপারে গাছের ডালে কাকগুলো চেঁচামেচি করে উঠল, ঘাসে ঝোপে সর্বত্র পাখিদের কিচির মিচির গান... সূর্যোদয় হল স্তেপের ওপর...

গ্রিগোরী ইভানভিচ কিন্তু অটল অবজ্ঞার হাসি হেসে, সূর্যের দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে ফিরে এলেন তাঁর বাড়িটার দুর্গন্ধের মধ্যে।

যখন ঘরে ঢুকলেন, হলদে শিখায় বাতিটা তখনও জ্বলছে, তখনও বাসি তামাকের ধোঁয়ার গন্ধে জায়গাটা ভরপুর, সবকিছুই মাথা ধরিয়ে দেবার ঠিক উপযুক্ত।

'কী দারুণ কুৎসিৎ গন্ধ!' বলে গ্রিগোরী ইভানভিচ তখনই উঠানে ফিরে গেলেন, কপালটা হাত দিয়ে ঘষে ভাবলেন: ''যাই স্নান করি। আঃ, কী যেন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে আমার মধ্যে''।

২

বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে গ্রিগোরী ইভানভিচের কাঁপুনি লাগল। ফোঁস করে দুটো ডুব দিয়েই তাড়াতাড়ি পোষাক পরে নিয়ে আস্তিনের ভিতর হাত ঢুকিয়ে প্রায় শুয়ে পড়া একটা উইলো গাছের গুঁড়িতে বসে পূবদিকে তিনি তাকালেন।

নদীর নীল বাঁকগুলো কখনো নলখাগড়ার জঙ্গলে হারিয়ে গিয়ে কখনো ফিরে সবুজ মাঠের মধ্যে এঁকেবেঁকে দূরের বার্চবনের মধ্যে চলে গেছে।

ওপারের ঘাসপালার মধ্যে বরফের দলার মতো দেখতে হাঁসের দল। কুয়াশায় অস্পষ্ট নদীর জলে পুঁটি মাছগুলো শ্যাওলা দুলিয়ে

সাঁতরে বেড়াচ্ছে। যে গোঁফওয়ালা শীট মাছ পা কামড়ে ধরে বলে ছেলেরা এত ভয় পায়, ঠিক তার মতো দেখতে একটা পুরোনো গাছের গুঁড়ি তাঁর পায়ের তলায় নদীগর্ভে পড়ে রয়েছে। ছোট ছোট ধূসর পাখি শিস্ দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে নলখাগড়ার মধ্যে।

দাঁত ঠক্‌ঠক্ করছে, কিন্তু গ্রিগোরী ইভানভিচ চারদিকে তাকিয়ে দেখছেন; রোদে তাঁর মুখ আর খালি পা গরম হয়ে উঠছে।

"এ সব অবশ্যই বেশ আনন্দের," ভাবলেন তিনি, "কিন্তু এ সবই ত' শীগ্‌গির ফুরোবে, এগুলো কেবল আকস্মিক ঘটনা।" মাথা নীচু করলেন তিনি, আর কী কারণে যেন গত রাত্রিটাই তাঁর কাছে মনে হল দুঃস্বপ্ন—সেই নোংরামি, ভ্যাপ্‌সা বাতাস আর মাথাধরা নিয়ে তক্তার ওপর কাটানো রাত।

হাঁসগুলো হঠাৎ তাঁকে চমকে দিল। জোরে প্যাক্‌প্যাক্ করতে করতে নদীতে ছুটে নামল তারা, আগে আগে একটা বুড়ো মদ্দা হাঁস। সাদা ডানা ছড়িয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা সাঁতার দিতে লাগল রোয়াবে ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঘুরিয়ে...

গ্রিগোরী ইভানভিচ একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে (মনে হল যেন তাঁর অন্তর চীৎকার করতে চায়, কিন্তু চীৎকার চলবে না) নদীর থেকে আকাশপানে ওঠা কুয়াশা দেখতে লাগলেন।

নদীটা লম্বা, অনেক বাঁক আর খাড়ি; সবখানেই আবছা সেই কুয়াশা পাকিয়ে উঠে বনের ওপারে সাদা মেঘে পরিণত হচ্ছে।

সকালের সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সাদা মেঘের টুকরোটা বার্চবনের পিছনে ওপরে উঠল, তার পিছনে আরো ছোট ছোট মেঘগুলো বনের ওপর স্তরে স্তরে জমতে লাগল যেন একত্রে বাসা বেঁধে। দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশ ভরে উঠল সাদা মেঘে, সবগুলো রাজহাঁসের মতো একদিকে মন্থরভাবে উড়ে চলছে, যেন জানে তাদের জীবন

কণপ্রাণী। মেঘের শীতল ছায়া স্তেপের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। মেঘগুলোর চেহারা বদলাচ্ছে, কখনও তারা দেখতে জন্তুজানোয়ারের মতো, কখনও বনের খোলা জায়গার মতো, আরো কত রকমের আকৃতি। এইরকমই তারা খেলা করবে যতক্ষণ না হাওয়ায় তাদের সবগুলোকে একটা এক জমাট মেঘে একত্র করবে, বিদ্যুৎ চিরে ফেলবে তাদের, আর তখন তারা তাদের সঞ্জীবনী জলকণা পৃথিবীর বুকে ঝরিয়ে নিজেরা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

'আমি একটা কুত্তার বাচ্চার মতো,' গ্রিগোরী ইভানভিচ নিজে নিজে বললেন, 'একগুঁয়ে আর অকেজো। কিন্তু তবুও এ সব অদ্ভুত সুন্দর ...'

এত আনন্দ হল তাঁর যে নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না, হাত কাঁপতে লাগল, দ্রুত ওঠানামা করতে লাগল চোখের পাতা। বেড়া পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে তার ওপর চড়ে চারিদিকে দেখতে লাগলেন কোথাও এমন কোন অসাধারণ দয়ালু লোক পান কিনা যাকে সেই মুহূর্তেই তাঁর মনের সব অনুভূতির কথা বলতে পারেন।

ঠিক সেই সময়ে কঞ্চির বেড়ার পাশের রাস্তা দিয়ে কতকগুলি ছেলে চলে এল। তারা এল পা টেনে টেনে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে, কখনও বা পা ছুড়ে বা ডিগবাজি খেয়ে।

তাদের পিছনে হাত ধরাধরি করে রঙীন সারাফান আর মাথায় রঙবেরঙের রুমাল পরে কিশোরী দল। তারা একটা গান গাইছে, চমৎকার সুর। নতুন না হলেও গানটা তাঁর অজানা।

গাঁয়ের যুবারা আসছে সবার পিছনে। তাদের একজন, ছেঁড়া কোট গায়ে লম্বা রোগা একটি ছোকরা নলের বাঁশি বাজাচ্ছে, তার ওপরের ঠোঁট ফুলে উঠছে বেলুনের মতো; আর একজন, বেঁটে জবরদস্ত

চেহারা অথচ পাদুটো বাঁকা, ওয়েস্ট কোট আর টুপি পরে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে।

কোণের বাড়ি আর বেড়াটার পাশ দিয়ে ছেলেমেয়ের দল মোড় ঘুরল। তারা বেশ খানিকটা দূরে চলে গেলেও গান বাজনা শোনা যেতে লাগল। দূরের সাঁকোটা পার হবার সময় তাদের দ্বিতীয়বার দেখা গেল, তারপর একটা টিলার আড়ালে, হাসপাতালের পোড়া কাঠামোটার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা।

আস্তে আস্তে গ্রিগোরী ইভানভিচ বললেন:

'অদ্ভুত। নাকি আজ কোন বিশেষ দিন?'

একজন গম্ভীর ধরনের কৃষক, লাল নতুন পোষাক পরা, খালি মাথা, তেল-চকচকে চুল, বেড়ার কাছে এসে একটা খুঁটি ধরে কঞ্চিগুলোর মধ্যে আলকাতরা মাখা তবু একটু একটু ধুলো আর খড়কুটো লাগা একপাটি বুটজুতা গুঁজে জিজ্ঞেস করল:

'বেড়াতে বেরিয়েছেন নাকি?'

'সুপ্রভাত, নিকীতা। দলবল গেল কোথায়?' প্রশ্ন করলেন গ্রিগোরী ইভানভিচ। 'আজ কোন ছুটির দিন নাকি?'

'ট্রিনিটি, আজকে ট্রিনিটি,' শান্তভাবে জবাব দিল কৃষকটি।

'গ্রিগোরী ইভানভিচ, আপনি দিনের হিসাব গুলিয়ে ফেলতে আরম্ভ করেছেন দেখছি। মেয়েরা গেছে মালা গাঁথতে।'

নিকীতা কঞ্চির বেড়ার খুঁটিটা মাটিতে শক্ত করে পোঁতা আছে কিনা দেখবার জন্য সেটা টেনে পরখ করে, হঠাৎ কোঁকড়া সোনালি দাড়িভরা মুখটি একটু হাঁ করে সোজা গ্রিগোরী ইভানভিচের চোখের দিকে তাকাল।

সেই কৃষকের রোদে পোড়া হাল্কারঙের প্রায় রঙহীন চোখের খরদৃষ্টি থেকে, তার তামাটে মুখ, তার সবল শরীরের সুগন্ধি থেকে

গ্রিগোরি ইভানভিচ বুঝতে পারলেন যে নিকীতা অবসর মতো দেখতে এসেছে ভদ্রলোকটি কী ধরনের মানুষ, তাঁর হয়েছে কী, আর মুহূর্তের মধ্যেই, যেমন একটা গাড়ির চাকার দিকে তাকাবামাত্র বুঝতে পারে, তেমনি তাঁর দিকে তাকিয়েও টের পেয়ে গেছে যে তার, নিকীতার কোন কাজে ডাক্তার জাবোতুকিন লাগবে না, কারণ যদিও তিনি ডাক্তার এবং বইটই পড়েন, তিনি নিজেকে নিয়ে কী করবেন তাও জানেন না এবং কারো কোন কাজেও লাগবেন না।

গ্রিগোরী ইভানভিচ এই সমস্ত বুঝতে পেরে হাসলেন।

নিকীতা বলল:

'আমার একটি সামান্য মিনতি আছে। আমার সঙ্গে এসো আমার ঠাকুমাকে দেখতে। অনেকদিন ধরে তিনি মরমর, কিন্তু ঘোড়াগুলো সব কাজে জোড়া ছিল আর নিজেও কাজ ছেড়ে উঠতে পারিনি... আমি এখনি দৌড়ে গিয়ে গাড়িঘোড়া যুততে পারি।'

'তা ভাল কথা,' চেঁচিয়ে উঠলেন গ্রিগোরী ইভানভিচ, 'ছুটে গিয়ে ঘোড়া যুতে ফেলো।'

নিকীতাও তাড়াতাড়ি নতুন গাড়িতে ঘোড়া যুতে তাতে টাটকা খড় ভর্তি করে ডাক্তারের অলিন্দের কাছে হাঁকিয়ে নিয়ে এল।

গ্রিগোরী ইভানভিচ খুশীমনে গাড়িতে উঠে এক বোঝা খড় টেনে জড় করে তার উপর পা মুড়ে বসে পড়লেন।

'জানো নিকীতা, আজ সত্যিই ছুটির দিন। তুমি নিশ্চয় বিয়ে করেছ? বৌকে ভালোবাস?'

নিকীতা ভ্রূজোড়া ওপরে তুলে ঘোড়ার দিকে জিভ দিয়ে টক্‌টক্‌ আওয়াজ করে গাড়ি হাঁকাল। গাড়ির ঝাঁকানিতে তার জুতোগুলো চাকার কাছে নাচতে আর লাফাতে লাগল। গ্রিগোরী ইভানভিচ স্যাঁৎসেঁতে খড়ের ওপর উঁচু নীচু ঝাঁকানি খেতে খেতে চারিদিকে তাকিয়ে একগাল হাসলেন। সত্যিই বড় ভাল লাগছে।

গাড়িটা যখন জেমস্তুভোর পুলের ওপর দিয়ে গড়গড় শব্দ করে যাচ্ছে তখন ব্যাঙগুলো রেলিঙ থেকে নলখাগড়ার মধ্যে লাফিয়ে পড়ল আর তাদের ধরবার জন্য হাঁসগুলো পুলের তলা থেকে ছুটে এল . . .

'গাদা গাদা ব্যাঙ,' বলে নিকীতা চোখ মট্‌কাল।

নদী পার হয়ে চারণভূমি আর মাঠ, আর তার পরে বার্চবন। নিকীতা ঘাড় ফিরিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে গালগল্প করতে লাগল, গ্রিগোরী ইভানভিচ বেশীর ভাগ সময় চুপ করে ছিলেন, বোকার মতো প্রশ্ন করছিলেন না, তাই নিকীতা বলতে আরম্ভ করল তার কৃষক জীবনের কথা, সারা শীতকাল কী ভেবেছে তার কথা। তার পরে হঠাৎ, ধূর্ত ধূসর চোখগুলোকে কুঁচকে বলল:

'চাষার জীবন বড় কষ্টের হয়ে উঠেছে। আজকাল সব জিনিসেরই টাকায় দাম হয়। চাষাকে আবার টাকায় কষলে তার দাম কী? এক পয়সার বেশী নয়। চাষা জব্বর খাটে, কিন্তু খেটে ফল কী হয়? একবার যদি ভাবতে শুরু কর . . .'

নিকীতা ভ্রূ পাকাল, তারপর জবাবের অপেক্ষা না করেই মাথা নেড়ে আবার হেসে চাবুক দিয়ে বনের প্রান্তটা দেখাল।

মেয়েরা বার্চগাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ডাল দিয়ে মালা গাঁথছে। ছোট ছেলেগুলো গাছে চড়েছে। যুবারা ঘাসের ওপর শুয়ে হারমোনিয়ামের বাজনা শুনছে।

নিকীতা বলল:

'সন্ধ্যা নাগাদ ওরা সবাই মাতাল হয়ে যাবে। আর এমন সব কেলেঙ্কারি কাণ্ড ঘটবে। আগে অনেক ভাল ছিল।'

গাড়িটা বন থেকে বেরিয়ে মাটি আর মধুর গন্ধে ভরপুর, হাওয়ায়-দোলা শস্যের ক্ষেতগুলোর মাঝামাঝি সরু সীমানা-রাস্তাটার ওপর এসে

পড়ল। নীল আকাশের সবটা জুড়ে ভেড়ার লোমের মতো সাদা আর কোঁকড়া মেঘ দেখা যাচ্ছে। রাস্তাটা এক একবার একটা খাদে নেমে গিয়ে তারপর পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে চলছে। দিকচক্রবালে সাদা মেঘের বিরাট নতুন পুঞ্জ শুয়ে রয়েছে। তাদের দেখে অবাক হবার কী আছে? কিন্তু যে কারণেই হোক, গ্রিগোরী ইভানভিচ আগে যেন কখনও লক্ষ্য করেননি, মাত্র এখনি লক্ষ্য করে অনুভব করলেন সেগুলো কত সুন্দর। বলে উঠলেন:

'দেখো নিকীতা, কী আশ্চর্য সুন্দর মেঘ!'

নিকীতা তা দেখে বলল:

'মেঘই ত'। কিন্তু ওগুলো ফাঁকা, যাচ্ছে জল আনতে, যখন জলভরা হয়ে ফিরে আসবে তখন আরো কালো হবে। সেদিন একটা মেঘ উড়ে গিয়েছিল—সেটার মধ্যে ভরা ছিল ব্যাঙ... আমরা খুব মজা করেছিলাম।'

লাফিয়ে মাটিতে নেমে লাগাম দোলাতে দোলাতে ঘোড়াটার পাশে পাশে চলল নিকীতা, গাড়িটা ধীরে ধীরে এক বালিময় ঢালু পথে উঠতে লাগল।

উপরে উঠে গ্রিগোরী ইভানভিচের চোখের সামনে ভেসে উঠল এক বিস্তৃত সমতল প্রান্তর, হাল্কা সবুজ, গাঢ় সবুজ আর হলদে শস্যে ভরা চৌকো চৌকো মাঠে ভাগ করা, আর চারিধারে মালার মতো উইলোগাছের পাড় দেওয়া একটা পুকুর, যেন দুটো পাখির রূপোলি ডানা। পুকুরের এধারে একটা গ্রাম, ওধারে একটা বাগান, একটা বাড়ির লাল ছাদ দেখা যাচ্ছে ঝাঁকড়া গাছগুলোর মধ্যে।

চাবুকের হাতলটা দিয়ে দেখিয়ে নিকীতা বলল:

'ভোল্‌কভের বাড়ি।'

গ্রিগোরী ইভানভিচের মনে হ'ল মৃদুমন্দ হাওয়ার মতো একটা মধুর আনন্দ তাঁর হৃদয় স্পর্শ করল। ইচ্ছা হ'ল সেই চওড়া লাল ছাদে উড়ে যান, এক মিনিটের জন্য হলেও দেখে আসেন কেমন আশ্চর্য হাসি হাসে ভোল্‌কভের মেয়ে।

৩

নিকীতা রুগ্না ঠাকুমা ভোল্‌গার অপর পারে থাকতেন। ঘোড়াটা কোনরকমে গাড়িটাকে টেনে নিয়ে চলল নদীর তীরের বালির উপর উইলো ঝোপের মধ্যে দিয়ে, তার অনেকগুলো ভাঙা আর আলকাতরা মাখা। অবশেষে দেখা গেল ভাসমান জাহাজঘাটের কাছারির রঙ-চটা ছাদ আর POS অক্ষর লেখা তার পতাকা।

বাতাস ছিল না। ঘাটে বাঁধা জলে ভরা দুটো নৌকোকে দুলিয়ে একটা চলে যাওয়া স্টীমারের পিছনের ছোট ছোট ঢেউগুলো আস্তে আস্তে তীরের বালি চাটছে। গ্রিগোরী ইভানভিচ টলমলে পাটাতনের ওপর দিয়ে জাহাজঘাটে উঠে বসে দূরের খাড়া আর সবুজ তীরটা দেখতে লাগলেন, সেখানে গাছের মাঝে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় একটা প্রকাণ্ড সাদা বাড়ি দাঁড়িয়ে। ওটা ছিল মৃতা রাজকুমারী ক্রাস্‌নপোল্‌স্কায়ার "মীলয়ে" জমিদারী, গম্বুজ আর মোটা মোটা থাম দেওয়া, সর্বদা জানালাবন্ধ করা। প্রায়ই যাতায়াতের সময় সেই বাড়িটা দেখতে গ্রিগোরী ইভানভিচ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন, এবার তাই লক্ষ্যই করলেন না যে জানালাগুলো খোলা আর থামগুলোর মাঝে লোকজন চলাফেরা করছে—অতদূর থেকে তাদের দেখাচ্ছিল মাছির মতো ছোট।

হঠাৎ বাড়িটার সামনে আকাশে উঠল একটুকরো ছোট সাদা মেঘ, নদীর ওপর দিয়ে ভেসে এল একটা তোপের আওয়াজ, আর একটু পরে একটা ভারী নৌকো তীর থেকে ছাড়ল।

রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে নিকীতা বলল :

'তুর্কীদের দিকে তোপ-দাগার মতো। রাজকুমার অতিথিদের বিদায় দিচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' গ্রিগোরী ইভানভিচ বললেন, 'আমি ত লক্ষ্যই করিনি যে বাড়িতে লোকজন রয়েছে। কতদিন হল বাড়িটা খোলা হয়েছে? ...'

'বসন্তকাল থেকে,. গ্রিগোরী ইভানভিচ, যখন মালিক, খোঁড়া রাজকুমার এসেছেন। কী কাণ্ড না হল এখানে প্রথম প্রথম। লোকে ভাবত বাড়িটা পুড়িয়েই ফেলবে বুঝি ওরা। শোনা যায় রাজকুমার বিয়ে করতে চান তাই, বুঝেছেন কিনা, কামান দেগে কনেদের লোভ দেখাচ্ছেন।'

নৌকোটা কোনাকুনি নদীতে পাড়ি দিচ্ছিল। খালিমাথা, নীল সার্ট-পরা চারজন নাবিক দাঁড় টানছিল। নৌকোর ওপর একটা লালরঙের বড় ছাতা হেলে দুলে জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল।

শীঘ্রই দেখা গেল নাবিকদের কামানো মাথা আর দুটি মুখ, একটি মেয়ের আর একটি জামা আর বড় কানাত টুপি-পরা এক ভদ্রলোকের। তিনি তাঁর ছড়ির ওপর চিবুক রেখে বসেছিলেন, তাঁর লাল্‌চে গোঁফজোড়া ছড়ি বেয়ে ঝুলছিল।

মেয়েটি বসেছিল তাঁর পাশে। পরনে আগাগোড়া সাদা পোষাক। কোলের ওপর খড়ের বোনা টুপিটা পড়ে আছে। সোনালি দুই বেণী মাথার চারপাশে জড়ানো, রঙীন পাতলা ছাতার ভিতর দিয়ে রোদ এসে তার ছোট ছেলেমানুষি লম্বাটে গর্বিত অথচ সুন্দর মুখে গোলাপী আভা ফেলেছে।

'কড়া ভদ্রলোক,' নিকীতা বলল, 'পুরোনো চালে বাস করেন, নিজের জমিজমা ধরেই থাকেন, কিন্তু মেয়ের বিয়ে দিতে চান রাজকুমারের সঙ্গে। ইনিই হলেন ভোল্‌কভ কিনা ...'

"দেখতে তাহলে এইরকম," গ্রিগোরী ইভানোভিচ ভাবলেন এবং হঠাৎ একটু লজ্জা বোধ করে রেলিঙ ছেড়ে জাহাজঘাটের ডেকে একটু ঘুরে এসে একেবারে পিছনের দিকে ময়দার বস্তাগুলোর আড়ালে লুকিয়ে রইলেন। মুখ লাল হয়ে উঠল তাঁর।

'কী যা তা ব্যাপার, ছেলেমানুষের মতো ..." এই বলে আঙুল দিয়ে একটা বস্তার ফুটোতে খোঁচাতে লাগলেন।

দাঁড়ের শব্দ কানে এল। স্রোতের টানে নৌকোটা কাছে আসছিল। নৌকোতে কে একজন চেঁচাল, "ধরো চেপে!" জাহাজঘাটের এক নাবিক "ছেড়ে দাও" বলে চীৎকার করে ছাদে আছড়ে পড়া দড়িটা ধরতে ছুটল। নৌকোটা জোরে ধাক্কা খেল এবং এক সেকেণ্ড পরেই গ্রিগোরী ইভানভিচ গানের মতো গলার আওয়াজ শুনলেন, "বাবা, আমার হাত ধরো"—তার পরেই এক চীৎকার আর ঝপাং শব্দ।

গ্রিগোরী ইভানভিচের শরীরে ভয়ের শিহরণ খেলে গেল। বস্তাটার উপর ভর দিয়ে তারপর রেলিঙ পর্যন্ত ছুটে গেলেন...

পাটাতনের নীচে দাঁড়িয়ে একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা ভিজে পোষাকের প্রান্ত তুলে ধরে হাসছে।

'তুমি ত' আর ছাগল নও...' ভোল্‌কভ রেগে বলছেন তাকে। 'ও রকম করে কখনও লাফাবে না ...'

বাবা, মেয়ে দুজনে পাটাতন দিয়ে মন্থরগতিতে তীরে উঠে তিনটে কালো ঘোড়ায় টানা একটা গাড়িতে উঠলেন।

একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা মুখ ফিরিয়ে সেই বাড়িটার দিকে তাকাল, বাপের চোখের মতো সামান্য ঠেলে আসা বড় বড় ধূসর চোখ দিয়ে যেন সেটা বুলিয়ে দিল। ভোল্‌কভ সহিসকে যেতে হুকুম দিতেই চটকদার সাজওয়ালা ঘোড়াগুলো সজোরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বার্নিস করা গাড়িটা ছুটিয়ে নিয়ে চলল উইলো ঝোপগুলোর পিছনে।

গ্রিগোরী ইভানভিচ অনেকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অপস্রিয়মান গাড়িটা দেখলেন, তারপর বেঞ্চে ফিরে এসে লক্ষ্য করলেন তাঁর বড় বুটের তলায় একটি ভিজে মেয়েলি জুতোর দাগ। সন্তর্পণে নিজের পা সরিয়ে নিলেন তিনি।

শীঘ্রই স্টীমার এসে গেল। গ্রিগোরী ইভানভিচ ভাঁটিতে চললেন শহরে, নিকীতার ঠাকুমাকে দেখতে। বাড়ি ফিরলেন গভীর রাত্রে, পরিশ্রান্ত, কথাবার্তায় অনিচ্ছুক।

নিজের ঘরে না গিয়ে তিনি বাইরের ঘরে একটা সিন্দুকের ওপরে শুয়ে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন, কিন্তু বেশীক্ষণের জন্যে নয়। একটা মোরগের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল; খোলা দরজার চৌকো ফাঁকটার মধ্যে দিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ল তারার দল। তখন তিনি পাশ ফিরে উপুড় হয়ে শুয়ে চোখ কুঁচকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ও ঢোঁক গিলতে শুরু করলেন।

# বিষময় স্মৃতি

১

পর্দাখোলা উঁচু জানালার ধারে ড্রেসিং টেবিলের পাশে একটা নীচু আরামকেদারায় রাজকুমার আলেক্সেই পেত্রোভিচের ঘুম ভাঙল। শোবার ঘরের অন্য দুটো জানালার পর্দা টানা এবং ম্যাণ্টেলপিসের ওপর ঘড়িটা অন্ধকারে একটানা টিকটিক করে চলেছে।

জানালা দিয়ে বাগানের গাছগুলোর মাথা দেখা যাচ্ছে। একটু দূরে নদীর বেগুনি রেখা, ওপারে জাহাজঘাটের কাছারি, তারপরে

উইলো ঝোপ, লাল ঝিলভরা জলামাঠ; তার জলে প্রতিবিম্বিত বিষণ্ণ সূর্যাস্ত আর ধূসর মেঘপুঞ্জ; মাঠ আর পাহাড় শ্রেণী চিরে দিকসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত আবছা সরু রাস্তা।

অস্তোন্মুখ নিভে-আসা সূর্যের আলোয় মেঘগুলোর কিনারা লাল হয়ে উঠেছে আর ওপরে, সমুদ্রের মতো নীল আকাশে ভেসে থাকা মেঘপুঞ্জের রঙ গোলাপী। তারও ওপরে একটি তারা সবে ফুটেছে।

আলেক্সেই পেত্রোভিচ্ তাঁর ঠাণ্ডা আঙুলগুলো দিয়ে শীর্ণ ফ্যাকাসে গাল স্পর্শ করে এই সবের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

তাঁর চোখের কোটরে গভীর নীল দাগ, বাদামী দাড়ির সূক্ষ্ম চুল গালের গোল হাড়ের ওপর কুঞ্চিত।

কেবল এইগুলি — তাঁর সাদা হাত গাল আর বড় বড় চোখ একটি ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছিল। মাঝে মাঝে আয়নায় নিজের ছায়ার দিকে তাকাচ্ছিলেন আলেক্সেই পেত্রোভিচ্, কিন্তু নড়ছিলেন না।

তিনি জানতেন যে নড়াচড়া করলেই গত রাত্রের সমস্ত বিস্বাদের স্মৃতি মাথার মধ্যে ভীড় করে ঢুকে এখনকার এই সমস্ত স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জিনিসগুলির শান্ত পর্যালোচনাকে নষ্ট করে দেবে। এখন তাঁর ভাবনাগুলো দুঃখে ভরা এবং স্বচ্ছ।

রাশিয়ার নদীগুলোর ওপর সূর্যাস্তের এমনিই বিষণ্ণ চেহারা। তার চেয়ে বেদনামাখা সূর্যাস্তের দিকে ধেয়ে চলা রাস্তাটা। ভগবান জানেন কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে — মনে হয় যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে নদীর কাছে এসে আবার ছুটে পালাচ্ছে। রাস্তাটার ওপর কী যেন একটা নড়ছে... ওটা কি একটা গাড়ি? ঠিক বলা যাচ্ছে না, মরুক গে, কীই বা এসে যায় তাতে?

আকাশ-পৃথিবীর এই বেদনা আলেক্সেই পেত্রোভিচের মনে শান্তি এনে দিল। মনে হল অতীত যেন তাঁকে স্পর্শ করেনি, ভবিষ্যৎও ঠিক এইরকম নিরর্থক আর ছায়াবাজির মতো কেটে যাবে, আর তিনি বন্ধুদের সঙ্গে হট্টগোলে ভরা মদ্যপানের পর, বাগানে একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে উতলা-করা নৈশ-সাক্ষাতের পর, যখন ঠোঁট দিয়ে শুধু তার পোষাকটিকে স্পর্শ করার শত ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর সাহস হত না, সাশার কোমল সোহাগের পর, সকল সুখ আর অনুশোচনার পর, সর্বশেষে সেণ্ট-পিতার্সবুর্গের হিমঘাতের মতো বিদ্ধ-করা স্মৃতির বোঝার পর, শ্রান্ত অভিনেতার মতো মুখের রঙ মুছে ফেলে বুক-হিম-করা এই রাস্তা আর সূর্যাস্তের দিকে চিরকাল নির্নিমেষ চেয়ে থাকবেন।

এই প্রশান্তির কথা চিন্তা করতে না করতেই আলেক্সেই পেত্রোভিচ্‌কে চুপিসাড়ে এসে চঞ্চল করে তুলল নানা বিরুদ্ধ চিন্তা, যেন কোনো তার্কিক...

'তুমি ত মড়ার মতো ঠাণ্ডা আর সঙ্গীহীন,' একটি চিন্তা ফিসফিসিয়ে বলল। 'তুমি শুধু নিজেকে আর অন্যদের নষ্ট করেছ, এখন আরামকেদারায় করুণভাবে বসে থাকা তোমার জন্য কেউ আদৌ দায়ী নয়... তুমি তবে হয়ত জগতের সবচেয়ে দুঃখজর্জর মানুষ, হয়ত তোমার একান্ত প্রয়োজন স্নেহ আর সহানুভূতির...'

দ্বিতীয় চিন্তা জবাব দিল:

'বিনা প্রতিদানে স্নেহ আর সহানুভূতি কেউ দেয় না।'

তৃতীয় চিন্তা বিষণ্ণ ভাবে বলল:

'ওরা কেউ তোমার কাছ থেকে নেওয়া ছাড়া আর কিছু করেনি, শুধু তোমার কাছে দাবী করেছে, তোমার আত্মার করেছে সর্বনাশ।'

প্রথম আবার বলল:

'কিন্তু তুমি ত কখনও কাউকে ভালোবাসনি, তাই তুমি এখন পরিত্যক্ত আর তোমার হৃদয় গেছে শুকিয়ে।'

'না, না, আমি ভালোবেসেছি, আমি ভালোবাসতে চাই, ভালোবাসতে পারি,' চেয়ারে বসেই মুখ ফিরিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন আলেক্সেই পেত্রোভিচ্।

প্রশান্তিতে বাধা পড়ল। বাইরে সূর্যাস্ত তার সকল রঙ হারিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল, তার স্থান অধিকার করছিল তিনদিক থেকে ঘিরে আসা রাত্রি।

'হে ভগবান, কী নিদারুণ বিষাদ,' বলেই আলেক্সেই পেত্রোভিচ্ চোখদুটো হাত দিয়ে এত জোরে চেপে ধরলেন যে টন্‌টন্ করে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন সময় এসেছে চেয়ারে অস্থিরভাবে নড়ে বসবার, সেণ্ট-পিতার্সবুর্গের কথা ভেবে লজ্জার যন্ত্রণা সহ্য করার...

সেই স্মৃতিগুলো থেকে নিস্তারের পথ নেই, সেগুলো সর্বদা ওৎ পেতে থাকে, একমাত্র মদ আর লাম্পট্যে সেগুলোকে ডুবিয়ে রাখা যায়।

২

আটবছর আগে যখন তাঁর বাবামা মারা যান, সেই বছরে আলেক্সেই পেত্রোভিচ্ "X" রক্ষী সেনাদলে ভর্তি হয়ে কাজ করেছিলেন।

উদ্যোগভরে তিনি তাঁর সামান্য সম্পত্তি ওড়াতে লাগলেন; তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে যখন শেষ একশো রুবলের নোটটা ভাঙানো হয়ে যাবে তখন তাঁর কোন না কোন আত্মীয় পটল তুলবেন, কিংবা কিছু না কিছু ঘটবে।

এই ধারণার কল্যাণে সমস্ত সেণ্ট-পিটার্সবুর্গে কুমার ক্রাস্‌নপোল্‌স্কীর মতো দিলদরিয়া লোক খুঁজে পাওয়া শক্ত ছিল। মেয়েরা তাঁকে সত্যিই খুব পছন্দ করত। তাঁর একাধিক প্রণয় ছিল সর্বদাই অল্পস্থায়ী আর চটুল

এবং কোমল অথবা মজার স্মৃতি ছাড়া তাঁর মনে অন্য কোন দাগ রাখত না।

সেনাদলে ছ'বছর কাজ করা হয়ে গেছে। সময় কেটেছে ফুর্তি আর উত্তেজনায়, একদিন আর একদিনের মতো। তারপর একদিন আলেক্সেই পেত্রোভিচ্ পিছন পানে তাকাতেই তাঁর মনে হল যে তিনি এত বছর ধরে যেন একটা একঘেয়ে বারান্দা দিয়ে হেঁটে চলেছেন এবং তাঁর সামনেও পড়ে রয়েছে ঠিক একই রকম বিরস ধূসর প্রবেশ পথ। জীবনের এই নতুন অনুভূতি তাঁকে বিস্মিত এবং বিষাদগ্রস্ত করে তুলল।

প্রায় ঠিক এই সময়ে, একটি ক্লান্তিকর স্বল্প-পরিচিত বাড়িতে, রাজকুমারী মাৎস্কায়ার বসবার ঘরে তিনি একজন মেয়ের দেখা পেলেন—সে হঠাৎ ঝড়ের মতো তাঁর সুপ্ত আবেগকে জাগিয়ে তুলল।

আলেক্সেই পেত্রোভিচ্ একজন শীর্ণ পাংশু চেহারার ছোকরা কূটনীতিকের পাশে দাঁড়িয়ে পৃথিবীশুদ্ধ লোকের বহুকালকার জানা বেকুবের মতো চুকলিকথা আর রসিকতা শুনতে শুনতে স্থির করেই ফেলেছেন যে চুপিচুপি সরে পড়বেন, এমন সময় চাকর সোনালি কাজ করা দরজাটা হঠাৎ খুলে দিল। একটি রীতিমত দীর্ঘাঙ্গিনী মহিলা রেশমের পোষাকের খস্‌খস্ শব্দ তুলে দামী রূপালি ফার কাঁধে ছড়িয়ে ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি সোফাতে বসে পড়লেন।

তাঁর নড়াচড়া বেশ ক্ষিপ্র কিন্তু পোষাকে বাধছে। টুপির নীচে তামার বরণ চুল নীচু কপাল থেকে উপরের দিকে উঠে গেছে, মুখটি নিষ্প্রভ, আধবোজা চোখদুটি চমৎকার, নাকটি টিকলো—দেখে মনে হয় বিব্রত অসুখী মুখ। আলেক্সেই পেত্রোভিচ্ ত্বরিতে জিজ্ঞেস করলেন:

'কে ইনি?'

কূটনীতিক জবাব দিলেন:

'মোর্দ্ভীন্স্কায়া, আন্না সেমিওনোভ্না। ওঁর সম্বন্ধে অনেক কথা লোকে বলাবলি করে।' তাঁর পেয়ালা থেকে খানিকটা কফি চল্কে পড়ল কার্পেটের ওপর।

সেই তাঁদের প্রথম দেখা। আলেক্সেই পেত্রোভিচের মনে আছে সেদিনের প্রতিটি ক্ষুদ্রতম ঘটনা।

যখন তাঁদের পরস্পর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল আন্না সেমিওনোভ্না চোখ কুঁচকে একবার তাঁর দিকে তাকালেন, যেন তাঁকে যাচাই করে নিচ্ছেন।

আলেক্সেই পেত্রোভিচের ঘোড়ায় চড়া জুতোর কাঁটা খট্খট্ করছে, তরোয়ালটা পাশে ধরছেন; খুব সহজেই সর্বদা তাঁর মুখে আসে সেইরকম জুতসই কথা তিনি খোঁজার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেগুলো এখন যেন সম্পূর্ণ নিরর্থক মনে হল।

আন্না সেমিওনোভ্না খাড়া হয়ে বসে গোলাপী রঙের কান একটু উঠিয়ে তাঁর কথা শুনলেন। তাঁর কালো স্কার্টের ওপর পড়ে থাকা একটা সাদা রুমাল থেকে এক অদ্ভুত মেয়েলি ধরনের সুগন্ধ আসছিল, কিম্বা হয়ত তাঁর গা থেকেই। তারপর তিনি স্মিত হাসলেন, যেন বক্তব্য তাঁর শোনা শেষ হয়েছে। আলেক্সেই পেত্রোভিচ্ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন না যে তাঁর এবার চলে যাওয়ার পালা; মেয়েটি নিজে উঠলেন রেশম খস্খস্ করে এবং বক্ষোদেশ সামনে এগিয়ে। পরিচিতদের দিকে মাথা হেলিয়ে তিনি অন্য বসবার ঘরে চলে গেলেন, যেমন অসাধারণ তেমনি ধরাছোঁয়ার বাইরে।

এই দেখার পর কয়েক দিন ধরে আলেক্সেই পেত্রোভিচ্ সুগন্ধের স্বপ্নরাজ্যে বাস করতে লাগলেন। আন্না সেমিওনোভ্নার কোলের ওপর পড়ে থাকা সেই রুমালটার সুগন্ধ ছাড়া যেন দুনিয়াতে আর কিছু নেই তাঁর কাছে, সেই সুগন্ধের আভাস কোথাও পেলেই

আলেক্সেই পেত্রোভিচের চোখ ঘনিয়ে আসত, তাঁর বুকটা টন্‌টন্‌ করে উঠত।

"গ্রীষ্মোদ্যানের" কাছে ফন্তাঙ্কা নদীর ওপর একটা বাড়ির একতলায় অবিবাহিত লোকের উপযুক্ত তাঁর তিনকামরার ফ্ল্যাটে বসেই আলেক্সেই পেত্রোভিচ অশান্তভাবে দেওয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন — তার বন্ধুদের সঙ্গে স্ত্রীবর্জিত ফুর্তির সময় গুলি চালানোর ফলে সেগুলোতে এখানে ওখানে গুলির দাগ, — কখনও বসতেন অনেক মেয়ের ফটোগ্রাফ সাজানো এক টেবিলের ধারে, শুয়ে পড়তেন চামড়ার সোফায়, কিম্বা শপাঁর কোনো সুর শিস দিয়ে ভাঁজতেন, কিন্তু সবসময় সব জায়গাতেই দেখতেন পাণ্ডুর মুখমণ্ডলের পার্শ্বচিত্র, তাঁর কোমল মুখ আর চোখ দুটি, যেন অগাধ মমতায় ভরা ... এমনকি তাঁর সৈনিক চাকর, যে রান্নাঘরে হামেশাই মেয়েলি গলায় ফৌজী গান গাইত, সে পর্যন্ত এখন তাঁকে বিরক্ত করত না।

বাইরে যখন ঘন তুষারপাত সুরু হয়েছে, আলেক্সেই পেত্রোভিচ্‌ জানালার কাঁচে কপাল চেপে ধরে আকাশ থেকে নামা নরম আকম্পিত আচ্ছাদনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সৈনিক চাকরকে হেঁকে বললেন, 'আমার বড় ওভারকোট আর টুপিটা, জল্‌দি!'

এই হল সেই বরফপড়া, যখন আকাশ, মাটি, ঘরবাড়ি সব ছেয়ে যায় বরফে, যখন মেয়েরা সুগন্ধি ফারে বুক আর কাঁধ ঢেকে শীতের পোষাকের মধ্যে ডুব দেয়, যখন তুষার-ঝঞ্ঝার মধ্যে থেকে হাওয়ায় ল্যাজ টান করে একটা ঘোড়া ঝড়ের মতো ছুটে বেরিয়ে আবার তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে যায়, দেখার সময় থাকে না নীচু স্লেজ গাড়িতে কে বসে আছে — এই হ'ল সেই সময় যখন এক কোণে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করা যায় কে ছুটে আসবে গোলাপী মুখের কালো চোখে টুপির নীচ থেকে ঝিলিক দিয়ে। এই হ'ল সেই সময় যখন দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে কলারের

মধ্যে মুখ নামিয়ে ঝড়ের বেগে যেতে হয় এই কথা ভেবে যে কার সঙ্গে না জানি দেখা হবে সন্ধ্যায়, কার কাছে না জানি হারাবে হৃদয়।

আলেক্সেই পেত্রোভিচ্ দ্রুত হেঁটে চললেন বাঁধ বরাবর। লোমের আস্তরণ দেওয়া তাঁর ওভারকোট হাওয়ায় খুলে যাচ্ছে। বরফ গালে পড়ে গলে যাচ্ছে, জুতোর কাঁটাগুলো আনন্দ ঝঙ্কারে তাঁকে যেন ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। হারমিটেজ পুলের কাছে থেমে তিনি টের পেলেন যে রাজকুমারী মাৎস্কায়ার বাড়ির দিকে চলেছেন।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অল্প হেসে চারিদিকে তাকালেন।

ঘন তুষারপাতে রাস্তার আলোগুলো অস্পষ্ট। বরফ পড়েছে কার্নিসের ওপর, পাথরের মূর্তিগুলোর ওপর, কালো পাথরে সাদা গদির মতো। পায়ে হেঁটে যাচ্ছে না একজনও। প্রাসাদের জানালাগুলো অন্ধকার; ফটকের সান্ত্রী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভেড়ার লোমের লম্বা কোটে সর্বাঙ্গ এঁটেসেঁটে ঢেকে, রাইফেলটা পাশে চেপে ধরে।

হঠাৎ তিনি একটা চীৎকার শুনলেন; তারপরেই একটা কালো ঘোড়া, সর্বাঙ্গ ফেনায় আর তুষারে ঢাকা, লম্বা লম্বা পা ফেলে হারমিটেজ পুলের ওপর ছুটে এল। চালকের চওড়া পিঠের পিছনে সরু স্লেজখানায় সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসে আছেন আন্না সেমিওনভ্না, পরনে সেবলের ওভারকোট ...

আলেক্সেই পেত্রোভিচ উঁচু বীভার লোমের টুপিটা হাতে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে দেখলেন স্লেজখানা তুষার ঝড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাঁর ওভারকোট কাঁধ থেকে খসে পড়ল, বেরিয়ে পড়ল সৈনিকের পোষাকের সোনালি বোনা জরি, ঠাণ্ডায় তাঁর বুকটা যেন জমে গেল...

পরের দিন আলেক্সেই পেত্রোভিচ মোর্দভীন্স্কীদের বাড়িতে দেখা করতে গেলেন। লজ্জায় লাল বিব্রত হয়ে তিনি স্বামীকে বললেন যে রাজকুমারীর বাড়িতে পরিচয় পেয়ে এখন মাননীয়া আন্না সেমিওনভ্নাকে

শ্রদ্ধা নিবেদন করার গৌরব অর্জন করতে তিনি এসেছেন। এই সব কথা বলবার সময় তিনি ভাবছিলেন আন্না সেমিওনভ্না তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসবেন কিনা। মোর্দভীন্স্কী অবহেলাভরে কুমারের কথা শুনলেন, তাঁর ভ্রূ তোলা, একবারও চেয়ে দেখলেন না। মানুষটি লম্বা, তাগড়া এবং অল্প ঝুঁকে পড়া। আলেক্সেই পেত্রোভিচ তাঁর হলদেটে মুখ, শিকারী পাখির ঠোঁটের মতো নাক আর ঝুলে পড়া গোঁফের দিকে চেয়ে কল্পনা করতে লাগলেন—অতিথি চলে যাবার পরই তিনি কেমন ভ্রূকুঞ্চন করবেন এই ভেবে যে একটা অপ্রয়োজনীয় অভ্যাগমনের পাল্টা অভ্যাগমন তাঁকে করতে হবে।

মোর্দভীন্স্কী কিন্তু পাল্টা দেখা করতে এলেন না, আর আলেক্সেই পেত্রোভিচ্ এক সপ্তাহ অপেক্ষা করে সঙ্কল্প করলেন যে প্রথম সুযোগেই তাঁকে কিছু উদ্ধত কথা বলবেন এবং তাঁর সঙ্গে ডুয়েল লড়বেন...

এর কিছু দিন পরে একটা বাড়ির বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় দরজায় দেখা হল আন্না সেমিওনভ্নার সঙ্গে; তিনি তার নীল চোখ দুটি তুলে হাসলেন। আলেক্সেই পেত্রোভিচ একেবারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন এক প্রচণ্ড শক্তি তাঁকে ধরে রেখেছে।

তারপর প্রায় ছ'সপ্তাহ ধরে তিনি মোর্দভীন্স্কায়ার সন্ধান করতে লাগলেন বিভিন্ন ড্রইং-রুমে, বলনাচের আর সান্ধ্য আসরে, বড়লোকদের গির্জার সান্ধ্য প্রার্থনায়। এত যন্ত্রণা যে হতে পারে তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। রোগ সম্বন্ধে যেমন, তেমনি একাগ্রতার সঙ্গে মেয়েটার কথা অনবরত চিন্তা করা তাঁর অভ্যাস হয়ে গেল। কোন ড্রইং-রুমে ঢুকে তাঁকে দেখবার আগেই সর্বদা টের পেতেন তিনি আছেন কিনা। একদিন তিনি হঠাৎ পিছন দিক থেকে তাঁর কাছে এসে পড়তেই আলেক্সেই পেত্রোভিচ শিউরে উঠে চোখ বিস্ফারিত করে তখুনি মুখ ফেরালেন...

ভদ্রমহিলা বললেন:

'মনে হচ্ছে আপনি আমাকে ভয় পান?'

সামান্য টুকিটাকি আলাপ ছাড়া এই প্রথম কথা তিনি বললেন তাঁকে ...

আন্না সেমিওনভ্না অন্য সকলের চেয়ে তাঁর প্রতিই হয়তো বেশী মনোযোগ দিলেন, কিন্তু আলেক্সেই পেত্রোভিচ নিজেকে অতি অকিঞ্চিৎকর এবং অযোগ্য মনে করতে লাগলেন। নিজের আবেগে তাঁর আর তুষ্টি নেই: এটা তাঁর ইচ্ছার বাইরে, যেন তাঁকে পুড়িয়ে ফেলছে, সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে দিচ্ছে। লোকে যে বলে প্রেম সাপের মতো, তা অকারণে নয় ...

তারপর হঠাৎ (যেমন তাঁর স্বভাব) আলেক্সেই পেত্রোভিচ তাঁর স্বল্পপরিচিত এবং মোর্দভীন্স্কীদের বাড়িতে যাতায়াত আছে এমন একজন অফিসারের কাছে সমস্ত কথা খুলে বললেন ... অফিসারটি গোঁফ কামড়ে মনোযোগ দিয়ে শুনলেন (তাঁরা একটা সরাইখানায় বসেছিলেন, কাছেই রুমানীয় গাইয়েরা গান গেয়ে তাঁদের সমস্ত কথা ডুবিয়ে দিচ্ছিল) আর পরের দিনই মোর্দভীন্স্কায়াকে সব বললেন।

সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যায় তাঁদের দেখা হ'ল এক বলনাচে। আলেক্সেই পেত্রোভিচের চেহারা শীর্ণ গম্ভীর হয়ে গেছে। তিনি ইউনিফর্ম, পোষাকী পরিচ্ছদ আর মেয়েদের সান্ধ্য পোষাক-পরা ভীড়ের মধ্যে দিয়ে চলেছেন ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে; ঘোড়সওয়ারী জুতোর কাঁটার খটাস শব্দ করে লোককে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে তখনি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, অনবরত একদৃষ্টিতে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁকে, যেন তাঁর ভয় যে তাঁকে চিনতে পারবেন না, অথবা ভুল করে বসবেন।

আন্না সেমিওনভ্না একটা থামের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তার পরনে সবুজ রেশমের সাদাসিদে গলাখোলা পোষাক, স্কার্টে লাগান একটা প্রকাণ্ড লাল্চে গোলাপ।

'আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে,' কুমারকে বললেন আন্না সেমিওনভ্না। আলেক্সেই পেত্রোভিচ তার হাতে চুমো খেলেন, চোখে কানে কিছু দেখতে শুনতে পেলেন না ... বুক ব্যথায় ভারী, দুঃখে প্রায় চোখে জল আসে — ভয় আর আনন্দের সে এক মিশ্র অনুভূতি।

'আমার ওপর রাগ করবেন না,' মৃদুস্বরে বললেন তিনি।

তাঁরা দুজনে বলনাচের ঘর ছেড়ে শীতোদ্যানে গেলেন।

আন্না সেমিওনভ্না একটা অসমান অমসৃণ পাথরের দেয়ালের পাশের এক বেঞ্চে বসলেন। পাথর আর কার্নিসগুলো আইভিতে ঢাকা। ওপর থেকে ঝুলছে কোন এক লতানে গাছের ডাল। বেঞ্চের দুধারে পাম গাছ উঠে গেছে কাঁচের ছাদ পর্যন্ত। কোন ছায়া নেই, ছায়াহীন আলোতে ভেসে যাচ্ছে সমস্ত জায়গা, গাছফুল, উপচে পড়া ফোয়ারা আর আন্না সেমিওনভ্নার সুন্দর রাগত চেহারা। হাতপাখাটা করতলে ঠুকে হেসে তিনি বললেন:

'শুনেছি আপনি আমার সম্বন্ধে অসম্মানকর কথা বলে বেড়াচ্ছেন, এটা কি সত্যি?'

আলেক্সেই পেত্রোভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নীচু করলেন। আন্না সেমিওনভ্না বলে চললেন:

'আপনি জবাব দিচ্ছেন না, তার মানে এটা সত্যি ...'

শুকনো ঠোঁট ফাঁক করে অবোধ্য কী একটা কথা তিনি বললেন...

'কী? কী বললেন?' জোরে জিজ্ঞেস করেই হঠাৎ অপ্রত্যাশিত শান্ত স্বরে বললেন আন্না সেমিওনভনা, 'দেখতেই পাচ্ছেন আমি আপনার ওপর খুব রাগ করি না।'

কথাগুলো তাঁর কাছে মনে হল পরিহাস আর বিশেষ রকমের এক মেয়েলি সহানুভূতিতে ভরা — বিষাদ মুছে নেওয়া কত সহজ। তাঁর সমস্ত

চিন্তাভাবনা তালগোল পাকিয়ে গেল, মনে হ'ল তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে যাবেন, তাহলেই সমস্ত পণ্ড হয়ে যাবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মোর্দভীন্স্কী এলেন; কুমারকে দেখে মুখ বেঁকিয়ে স্ত্রীকে বললেন:

'আমি জরুরী খবর পেয়ে চলে যাচ্ছি এখান থেকে।'

'বেশ, কিন্তু আমি ত আপনার জরুরী খবর পড়ি না,' জবাব দিলেন আন্না সেমিওনভ্না। 'রাজকুমার আমাকে বাড়ি পেঁ ৗছে দেবেন।'

মোর্দভীন্স্কী মাথা ঝুঁকিয়ে বিদায় নিলেন। ''রাজকুমার'' এই ছোট্ট একটি কথার মধ্যে যেন একটা প্রতিশ্রুতি ছিল ... আন্না সেমিওনভ্না তাঁর হাত ধরে বলনাচের ঘরে ঢুকলেন—সেখানে নাচ চলেছিল। আলেক্সেই পেত্রোভিচ সহসা যেন মত্ত হয়ে উঠে হাসতে হাসতে তাঁকে বললেন কেমনভাবে তাঁর দিন কাটছিল। তাঁর চোখের দিকে যখনই তিনি স্থির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন তখনই আন্না সেমিওনভ্নার ভ্রূজোড়া সামান্য নেচে উঠছিল।

ভোর তিনটার সময় তাঁরা বেরোলেন। গাড়িতে ওঠবার সময় আন্না সেমিওনভ্না ধূসর লোমের কোটটা তুলে ধরতেই হাঁটু পর্যন্ত দেখা গেল সাদা মোজাপরা তাঁর পা, তার ভিতর দিয়ে চামড়া দেখা যাচ্ছে ... আলেক্সেই পেত্রোভিচ চোখ বন্ধ করলেন। নরম কেঁপে-উঠা গদিতে পাশে বসে তাঁর চোখে যেন ভাসতে লাগল আন্না সেমিওনভ্নার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পায়ের সাদা মোজা থেকে গলার হীরের হার পর্যন্ত; চুপ করে পিছনে হেলান দিয়ে অনুভব করতে লাগলেন সাঁ করে পার হয়ে যাওয়া রাস্তার আলোতে ঠাণ্ডা আর স্বচ্ছ চোখ দিয়ে আন্না সেমিওনভ্না তাঁর প্রতি অঙ্গসঞ্চালন লক্ষ্য করছেন ...

অবশেষে নিস্তব্ধতা অসহ্য হয়ে উঠল। কলারের ভিতরে আঙুল

ঢুকিয়ে টান মেরে লোমে পাড় দেওয়া উর্দি পোষাকের হুক আর বোতাম ছিঁড়ে ফেললেন।

'উত্তেজিত হবার কোন প্রয়োজন নেই,' বললেন আন্না সেমিওনভ্না। দস্তানাঢাকা হাত দিয়ে জানালার ঝাপসা কাঁচ মুছতে মুছতে আস্তে আস্তে বললেন, 'আপনাকে আমার অদেয় কিছু নেই...'

হয়তো এটা আন্না সেমিওনভ্নার একটা খেয়াল মাত্র, অথবা তিনি এই খেলায় একটু বেশী দূর গিয়ে পড়েছিলেন, যাই হোক, তাঁরা দুজনে সকাল পাঁচটা পর্যন্ত আদর আলিঙ্গনে মত্ত হয়ে রইলেন, প্রথমে গাড়ির মধ্যে, তারপরে আলেক্সেই পেত্রোভিচের ঘরে—মাঝে মাঝে কেবল দম নেবার ফাঁক দিয়ে...

আন্না সেমিওনভ্না তাঁর ঘরে ঢোকবার সময় বলে উঠলেন, 'কী সরু বিছানা!' এ ছাড়া আর কোন কথা বলেননি।

সোণার দেবমূর্তির সামনের একটিমাত্র আলোয় আলোকিত শোবার ঘরে তিনি তাঁর কোট, পোষাক, সুগন্ধি অন্তর্বাস চেয়ারে আর কার্পেটের ওপর ছুঁড়ে ফেললেন। আলেক্সেই পেত্রোভিচ সেগুলো ছুঁলেন মাতালের মতো টলতে টলতে, তারপর বালিশগুলোর ওপর শুয়ে পড়ে সেই ভরাযৌবন দেখতে লাগলেন। আধো আলোতে সে যেন আরো সুন্দর। এটা যে স্বপ্ন নয় তা অনুভব করবার জন্য তাঁর ঠোঁটে নিজের ঠোঁট চেপে ধরে চোখ বুজে চুমোর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন।

সেই রাত্রে আলেক্সেই পেত্রোভিচের জীবনের দিকপরিবর্তন হল। তিনি চিনলেন বেদনা আর অতুলনীয় সুখ, হারিয়ে ফেললেন নিজের ইচ্ছাশক্তি। পরের দিনের প্রতি ঘণ্টায় তিনি আরো-আকুল হয়ে উঠলেন যা ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তির জন্য... প্রয়োজন হলে তিনি তাঁর অধীনে সহিস কিম্বা ভৃত্যের চাকরি নিতেও রাজী... তাহলে তিনি তাঁর

জিনিসপত্র ছুঁতে পারতেন, তাঁকে দেখতে পেতেন, তাঁর কথা শুনতে পেতেন, তিনি যে চেয়ারে বসেন তা চুম্বন করতে পারতেন।

কিন্তু আলেক্সেই পেত্রোভিচ না সহিস, না চাকর। আন্না সেমিওনভ্‌না‌ও কোথাও আর একবার দেখা হবার জায়গা স্থির করলেন না।

একদিন, বিনিদ্র এক রাত, আর একদিন কেটে গেল ভয়ে ভাবনায় পরিপূর্ণ... সে দিন সন্ধ্যায় 'অভিজাত সমিতিতে' এক চ্যারিটি-বাজার বসেছিল। আলেক্সেই পেত্রোভিচ প্রকাণ্ড হলে ঢোকবামাত্র তাঁকে দেখতে পেলেন একটা জিনিস-বিক্রীর টেবিলের পিছনে। আন্না সেমিওনভ্‌না মোটা লেস্ আর চাষাদের তৈরী সূচীশিল্পের জিনিস বিক্রী করছিলেন। ডানদিকে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর স্বামী, বাঁদিকে কাউণ্টারে ভর দিয়ে সেই ফ্যাকাসে চেহারার ছোকরা কূটনীতিক, কাঁচের চশমাটা হাতে করে ঘোরাচ্ছিল।

আলেক্সেই পেত্রোভিচ একগাল হেসে যখন সেই কাউণ্টারে গেলেন তখন তাঁর মনে হল চারিদিকের সবকিছু যেন সূর্যের আলোয় ঝলমল করে উঠেছে... আন্না সেমিওনভ্‌না নবাগতের দিকে মাত্র একবার দেখে হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে মুখ ফেরালেন সেই ফ্যাকাসে তরুণ কূটনীতিকের দিকে। আলেক্সেই পেত্রোভিচের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল... তিনি ঝুঁকে অভিবাদন করলেন। আন্না সেমিওনভ্‌না তাঁর দিকে হাত বাড়ালেন না, তাঁর স্বামী অভিবাদনের জবাব দিলেন কোনক্রমে।

সমস্ত সন্ধ্যাটা আলেক্সেই পেত্রোভিচ কাটালেন হলের ভীড়ের ঠেলাঠেলির মধ্যে এখানে ওখানে ঘুরে, আজেবাজে জিনিস কিনে সেগুলো বয়ে বেড়িয়ে কোন জানালার ধারিতে ফেলে রেখে, চক্কর দিতে দিতে প্রতিবার সেই লেস বিক্রীর দোকানের অদূরে থেমে দাঁড়িয়ে। আন্না সেমিওনভ্‌নাকে অফিসাররা চারিদিক থেকে ঘিরে

রেখেছিল, তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন তাঁর হাসির শব্দ। বাজার বন্ধ হবার একঘণ্টা আগে তিনি ওভারকোট ইত্যাদি রাখার ঘরে মোর্দভীন্স্কায়ার কোটের সন্ধান করলেন। সিঁড়িতে স্বামীর হাতে ভর দিয়ে তাঁকে আসতে দেখে আলেক্সেই পেত্রোভিচ তাঁর কাছে গিয়ে, যাতে তাঁর রুক্ষ দৃষ্টি না দেখতে পান সেই জন্য তাঁর দিকে না তাকিয়ে লেস বিক্রীর কথা তুললেন... তিনি কোন জবাব দিলেন না। দারোয়ান মোর্দভীন্স্কায়ার গালোস কার্পেটের ওপর ফেলে তাঁকে কোট পরতে সাহায্য করতে লাগল। আলেক্সেই পেত্রোভিচ হেঁট হয়ে তাঁর কোটের তলার দিকটা একটু উল্টিয়ে তাঁর সেই ধূসর রঙের গালোসজোড়া পরিয়ে দিতে লাগলেন, একথা জেনেও যে তিনি একটা ভয়ানক কাণ্ড করছেন। তাঁর পায়ের পাতলা নীল মোজার ওপর আরো হেঁট হয়ে চট্ করে তাঁর পা ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করে তেমনি চট্ করে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ টক্‌টকে লাল, দেখতে পেলেন সুসজ্জিত মোর্দভীন্স্কী তাঁর স্ত্রীর পায়ের দিকে তাকিয়ে আছেন, মুখে অদ্ভুত উপহাসের হাসি...

এই হ'ল আলেক্সেই পেত্রোভিচের জীবনে নিদারুণ বিপর্যয়ের আরম্ভ। এর পরই তিনি সেনাদল ছেড়ে "মীলয়ে" জমিদারীতে পালিয়ে এলেন, সেটা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন ঠাকুমা ক্রাস্‌নপোল্‌স্কায়ার কাছ থেকে। মহিলা সেই বছরের বসন্তকালে জার্মানির কোন এক প্রস্রবণওয়ালা স্বাস্থ্যকর জায়গায় দেহ রেখেছিলেন।

এই বিপর্যয়ে ঘটল আলেক্সেই পেত্রোভিচের যৌবনের অবসান। তাঁর বোধ হল এই ক্লান্তিকর অসার জীবন থেকে নিষ্কৃতি নেই। হয়ত নতুন কোন প্রেম তাঁকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। কিন্তু মনে হল তাঁর ক্ষতবিক্ষত হৃদয় আধমরা হয়ে গেছে, আবার ভালোবাসতে হলে তাঁকে নবজন্ম নিতে হবে।

বিষময় স্মৃতি আঁকড়ে একলা পড়ে থাকার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য আলেক্সেই পেত্রোভিচ তাঁর বাড়িতে প্রতিসন্ধ্যায় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করতেন, একই বন্ধুদের। তাঁরা সন্ধ্যার মুখেই আসতেন— রৃতীশেচভুরা দুই ভাই একটা দু'চাকার গাড়ি চড়ে, বেতে বোনা গাড়িতে বুড়ো অব্রাজ্‌ৎসোভ্ আর সবশেষে ৎস্নুরিউপা—এক ব্যবসাদারের ছেলে, বিদেশে গিয়ে কিছু ভদ্র আদবকায়দা শিখে এসেছে। সে আসত একটা ব্রুহামে। আজও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

ঠিক সময়ে চাকর ওপরে উঠে আলেক্সেই পেত্রোভিচের শোবার ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে দেখল যে কুমার জানালার ধারিতে মাথা রেখে শুয়ে আছেন।

প্রথমটা আলেক্সেই পেত্রোভিচ খেতে যাবার ডাক অথবা অতিথিদের আসার কথা শুনতে পেলেন না। খোলা দরজা দিয়ে হাওয়ার ঝট্‌কা এসে তাঁর চুলগুলো উড়িয়ে দিতেই তিনি ফিরে তাকিয়ে, চাকরের হাতের কম্পমান বাতির শিখার দিকে কষ্টে চোখ কুঁচকে বললেন:

'ওঁরা টেবিলে খেতে বসুন।'

তাঁরা সাধারণত খেতেন বড় হলে। চার দেওয়াল বরাবর যাওয়া আসার জায়গা থেকে, তাদের থেকে এমন বেশ খানিকটা দূরে, দু-সারি গোল থাম। থামগুলোর পিছনে ছ'টা জানালা বাগানের দিকে। তার উল্টোদিকের দেওয়ালে ভূয়ো জানালা, শার্সির জায়গায় আয়না বসানো। থামগুলোর ফাঁকে ফাঁকে হেলান দেবার জায়গাছাড়া গদিমোড়া সোফাগুলো ...

খাবার তৈরী—এই কথা চাকর বলতে রৃতীশেচভুরা দুইভাই, ৎস্নুরিউপা আর অব্রাজ্‌ৎসোভ্ একটা শব্দ করে হাত ঘষতে ঘষতে

টেবিলে বসে কুনুই দিয়ে তুষারশুভ্র টেবিলক্লথের ওপর স্ফটিক আর চীনামাটির বাসনগুলো সরিয়ে দিল। ব্র্তীশ্চেভ্‌রা দুই ভাই সবসময় পাশাপাশি বসত। তাদের চওড়া পিঠ ঢেকে থাকত ধূসর রঙের উঁচু-গলা ককেশীয় বোতামওয়ালা জ্যাকেট; দুজনেরই ঝাঁকড়া গোঁফ, ওপরে-তোলা নাক, অদ্ভুত স্বাস্থ্যভরা মুখ আর গরুর মতো চোখ। এরা ছিল লাজুক, টেবিলের মাথায় নিমন্ত্রণকারীর আসনে বসা ৎস্যুরিউপা প্রথম খাবার তুলে নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করত। টেকো অব্রাজ্‌ৎসোভ ঠোঁট নলের মতো বেঁকিয়ে বাতের দরুণ ঘোলাটে বুড়োমানুষের চোখ বুলিয়ে নিল খাবারগুলোর ওপর।

ৎস্যুরিউপা নীচের ঠোঁট বের করে হুকুম দিল:

'কালকে যা দিয়েছিলে সেই শ্যাম্পেন দেবে...' তার পরনে সান্ধ্য পোষাক, একটা লাল রুমাল ওয়েস্ট-কোটের পকেটে গোঁজা, যেন খৃষ্টের ভোজে যোগ দিতে এসেছে। অব্রাজ্‌ৎসোভ্ বলল:

'আর সেই চেরি লিকিওরটা চাঁদ আমার, দিতে ভুলে গেছ—মনে আছে, কাল আমি চেয়েছিলাম?'

মুখ হাঁড়ি করে চাকর বলল:

'যে আজ্ঞে।'

ঠিক সেই সময়ে একটা ছোকরা বাবুর্চি সূপ নিয়ে এল। ইভান আর সেমিওন ব্র্তীশ্চেভ্‌রা দুই ভাই পরস্পরকে ঠেলা দিয়ে একসঙ্গে বলে উঠল:

'সবচেয়ে ভাল হচ্ছে স্রেফ ভোদ্‌কা, শ্যাম্পেনে পেট গুড়গুড় করে... সেমিওন, ছত্রকটা এগিয়ে দিয়ে আমাদের এক গেলাস ঢেলে দাও ত'...'

ৎস্যুরিউপা পক্ষ্মবিহীন চোখের পাতা পিট্‌পিট্ করে কথা না বলে নামমাত্র খেতে লাগল। কুমার আসার অপেক্ষায় সে রসালাপ জমিয়ে রাখছে।

অব্রাজ্‌ৎসোভ্‌ গলায় ন্যাপ্‌কিন গুঁজে খুসীমুখে সুপ খেতে লাগল; খাবার সময় তার চোখের কোটরে ঝোলা চামড়া থল্‌থল্‌ করতে থাকল। দুই ভাই'এর দিকে মাথা নেড়ে সে বলল:

'ওঁরা ঠিক বলেছেন, আমাদের সরকারী অভিশংসক শ্যাম্পেন খেয়ে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন—কী ভয়ঙ্কর পেট গড়গড় করেছিল তাঁর। কিন্তু তাই বলে খালি ভোদ্‌কা আর ভোদ্‌কা ছাড়া আর কিছু না খেয়ে ত' থাকতে পারা যায় না...'

ৎসুরিউপা তীক্ষ্ণ অট্টহাসি হেসে পাঁউরুটির একটা গুলি পাকিয়ে টেবিলের ওপর গড়িয়ে দিল। রতীশেচভরা দুই ভাই কাঁটা নামিয়ে মুখ হাঁ করে হাসতে লাগল, হাসি যেন ফেটে বেরিয়ে আসছে পিপের মধ্যে থেকে। অব্রাজৎসোভ বলে চলল:

'আমার ভাইটি একটি আসল রসিক চীজ্‌ ছিলেন, এমন সব কথা বলতেন যে মেয়েরা ঘর ছেড়ে পালাত...'

চাকর আর সেই ছোকরা বাবুর্চি খাদ্য পানীয় পরিবেশন করতে লাগল। বাতির ঝাড়ের ওপর উড়তে উড়তে পোকাগুলো পাখা পুড়িয়ে টেবিলের ওপর টপ্‌টপ্‌ করে পড়তে লাগল। অতিথিরা নিঃশব্দে খেতে লাগল, কেবল ইভান অথবা সেমিওন গুরুভোজনের দরুণ মাঝে মাঝে সশব্দে হাঁসফাঁস করতে লাগল।

অবশেষে অতি পরিচিত খুঁড়িয়ে হাঁটার শব্দ শোনা গেল বাইরে। ৎসুরিউপা তাড়াতাড়ি ন্যাপকিনটা দিয়ে মুখ মুছে এককাঁচের চশমাটা চোখের ধ্যাবড়া কোটরে বসিয়ে নিল। কুমার প্রবেশ করলেন। তাঁর চোখ টক্‌টকে লাল, ভিজে চুল সবে উপরের দিকে আঁচড়ানো; তাঁর সংযত হাবভাব আর পোষাকের কাটছাঁটে ৎসুরিউপা এই নিয়ে একশবারের মতো লক্ষ্য করল এক অবর্ণনীয় পারিপাট্য। তাঁর অনুকরণ করতে গিয়ে সে তিনপাল্লা আয়না কিনেছে, জামাকাপড়

ফরমাইস করে আনিয়েছে লণ্ডন থেকে, তার আত্মীয়স্বজন ছোটখাট গোছের ব্যবসাদার সকলকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছে, যাতে তার আদবকায়দা ব্যাহত না হয়।

কুমার তাদের অভিবাদন করে বললেন:

'উঠবেন না, উঠবেন না বন্ধুগন, আশা করি বাবুর্চি কালকের ভুল শুধরেছে।'

রতীশ্চেভরা চেয়ারের তলায় খটাস্ করে পা টেনে তাদের ভব্যতা প্রকাশ করল। অব্রাজৎসোভ গলা বাড়িয়ে কুমারকে চুম্বন করল আর ৎস্যুরিউপা লাফিয়ে উঠে কুমারের কাঁধ না চাপড়ে পারল না।

আলেক্সেই পেত্রোভিচ টেবিলের এক কোণে বসে একটুকরো রুটি নিয়ে খেতে লাগলেন। তাঁর জন্য মদ ঢালা হতেই তিনি আগ্রহের সঙ্গে তাতে চুমুক দিলেন। টেবিলের ওপর কনুই রেখে গাল আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে বললেন:

'বলুন, হালের নতুন খবর কী। হ্যাঁ, আর একটু মদ দিন ত' দয়া করে...'

ৎস্যুরিউপা বলল:

'আপনি নিজে চিরনবীন। ভাল কথা, আমি একটা নতুন রসালো গল্প শুনেছি...'

কুমারের কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে হাসিতে প্রায় দমবন্ধ হয়ে তাঁকে গল্প বলতে আরম্ভ করল সে। কুমার মুচকি হাসলেন, রতীশ্চেভরা জোরে হেসে উঠল, মজার কিছু বলবার চেষ্টায় তাদের কপাল কুঁচকে উঠল, কিন্তু তাদের মাথায় কুকুর, ঘাসের মাঠের লোকসান কিম্বা খোঁড়া ঘোড়াটা ছাড়া আর কিছুর কথা যোগাল না, এমন সম্ভ্রান্ত সমাজে ও সব গল্পই অচল। অব্রাজৎসোভ বলে উঠল:

'মেয়েদের কথা যখন উঠেছে তখন এটা ত' কুমারের একেবারে মনের কথা... উনি আমাদের ফুর্তির ব্যবস্থা করে দেবেন নিশ্চয়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকে করতেই হবে,' চেঁচিয়ে উঠল সব কটি অতিথি। 'গোটাকয়েক বেশ খাসা মেয়ে কুমার আমাদের জুটিয়ে দিন।'

'মশায়রা, তাহলে বরং কলিভান যাওয়া যাক।'

'সরাইখানায়? চলুন সাশার ওখানে যাওয়া যাক।'

'এটা বন্ধুর মতো কথা হ'ল না—সব মজা নিজের জন্য আর আমাদের বেলায় কিছু না, না, কলিভানই হোক। চলো কলিভান।'

কুমার ভ্রূভঙ্গি করলেন। রতীশ্চেভরা দু'ভাই ভারীজুতোশুদ্ধ পা মেঝেতে ঠুকে ঘেমে চেঁচিয়ে উঠল, ''কলিভান, কলিভান যাওয়া যাক।'' ৎস্নুরিউপা কুমারের কানের কাছে ঝুঁকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, ''কুমার বাহাদুর, এটা ভাল নয়, ভাল নয়''। অব্রাজৎসোভ ন্যাপকিন দিয়ে তার টেকো মাথা মুছল। তার জিভ একটু বেরিয়ে পড়েছে, কলিভানের কথা ভেবে সে গলে পড়ছে। তখন সবাই মাতাল। কুমার টেবিলের ওপর কনুই'এ ভর দিলেন, তাঁর মাথা আরো ঝুঁকে পড়ল। টানা মদ আর আগের দিনের খোয়ারি তাঁর মাথাটাকে ভারী ঘোলাটে করে দিয়েছে। ''আজ অন্য সব দিনের চেয়ে বেশী মাতাল হওয়া চাই'', এই ভাবলেন তিনি। ৎস্নুরিউপা তাঁর কনুইটা ধরল, তিনি মুচকি হেসে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন:

'চলুন, বাগানে যাই।'

চাকর তৎক্ষণাৎ বারান্দার দরজা খুলে দিল। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা ঘরে এসে ঢুকল, সকলে মিলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ভিজে বাগানের মধ্যে গেলেন।

বারান্দা থেকে কাঁকরের পথটা একটা খাদ পর্যন্ত চলে গেছে। তার ধারে কাঁটাঝোপে অর্ধেক ঢেকে যাওয়া একটা রেলিঙ, তাতে কেবল একটি পাথরের ফলদানি এখনও টিকে আছে।

হলের ছ'টা জানালা থেকে আলো এসে পড়েছে ফুলদানিটার ওপর, পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারা গোটা কয়েক রেলিঙের খুঁটি, গাছ এবং রাস্তাটার ওপর। খাতের নীচে চওড়া প্রায় অদৃশ্য নদীটার ওপর লাল আর হলদে হুঁসিয়ারির বাতি জ্বলছে।

কুমারকে চুপিচুপি বলল ৎস্যুরিউপা:

'ভাই দুটোকে কুস্তি লড়াতে হবে।' তিনি তখন ফুলদানিটার গায়ে গাল ঠেস দিয়ে ভোল্‌গার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ভাবছিলেন, "আজ, ঠিক আজ, নিশ্চয় আমার সাহসের অভাব হবে না ..." তিনি বললেন:

'রাজী করান ওদের।'

মদে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই নেশা হত না। প্রথমে তিনি সাবধান হয়ে থাকতেন, যেন কেউ আগে থেকে তাঁকে হুঁসিয়ার করে দিত, তারপর আসত দুঃখ, প্রায় অশ্রুঝরানো দুঃখ; প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট, প্রত্যেক জিনিস পরিষ্কার হয়ে আসত, আর সবকিছুর ওপর যেন একটা অনিবার্য পরিণতি ঘনিয়ে আসত। হঠাৎ ঘন মেঘ চিরে বিদ্যুৎঝলকের মতো একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করতেন তাঁর বুক থেকে পিঠে, পিঠ থেকে কালিয়ে যাওয়া পা পর্যন্ত। নিজেকে একটা ঝাঁকি দিতেন তিনি, তারপর আরম্ভ হত বেলেল্লাপনা।

কুমার যখন রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন তখন ৎস্যুরিউপা দুই ভাইকে কড়া কড়া কথা বলে তাতাচ্ছিল। ইভান রতীশ্চেভ এরি মধ্যে সেমিওনের দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে।

এরা দুজন গায়ের জোরের জন্য জেলায় প্রসিদ্ধ। ঘোড়ার মেলায় তারা প্রায়ই কোন না কোন তাতারী অশ্ব পালককে ডাকত গাড়িগুলোর মাঝে কুস্তি লড়তে জমিদার আর চাষাভূষোদের সামনে। যখন তাদের সঙ্গে লড়তে আর কাউকে পাওয়া যেত না তখন প্রায়ই তারা নিজেরাই লড়ত।

ৎস্যুরিউপা ইভানকে কনুই'এর খোঁচা দিয়ে বলল :

'সেমিওন তো তোমাকে অবশ্য চিৎপাত করে দেবে।'

'দেবই তো,' বলে উঠল সেমিওন, এদিকে ইভান অমনি এগোল ভাই'এর দিকে। ভাই তখন বুক ফুলিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে।

'ছ্যা, কাপুরুষ দুটোই,' চেঁচিয়ে উঠল ৎস্যুরিউপা। অব্রাজৎসোভ ইতিমধ্যে ইভানকে কাঁধ দিয়ে দিচ্ছিল সামনে ঠেলা। তার দিকে চোখ টিপেই ৎস্যুরিউপা সমস্ত গায়ের জোরে সেমিওনের পিঠে মারল ধাক্কা।

দুই ভাই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করেই ঠোকাঠুকি খেল। ইভান সেমিওনের কোমর জাপটে ধরল, সেমিওন চীৎকার করল, "কায়দা খেলাপ হচ্ছে।" তারপর উবু হয়ে বসে পড়ে ভাইকে উঁচুতে তুলে ধরল। সে শূন্যে পা ছুঁড়তে লাগল। তারপর দুজনে দুজনকে জাপটে ধরে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে ঘুরপাক খেতে লাগল। ৎস্যুরিউপা হাততালি দিয়ে চারদিকে ছুটে ঘুরতে লাগল। দুই ভাই টাল খেয়ে খাদের কিনারে পৌঁছবামাত্র ৎস্যুরিউপা ঠ্যাং বাড়িয়ে সেমিওনকে ল্যাঙ্ মারতেই সে ইভানকে পেড়ে ফেলল আর দুজনেই ধপাস্ ধরে মাটিতে পড়ে গড়াতে গড়াতে চেঁচাতে চেঁচাতে ঝোপঝাড় ছিঁড়ে খাদটার গা বেয়ে পড়তে লাগল।

আলেক্সেই পেত্রোভিচ হো হো করে হেসে উঠলেন। বুকে চেপে থাকা থম্‌থমে ভাবটা কেটে গেছে। হাসিতে ফেটে পড়ে তিনি ঠাণ্ডা ফুলদানিটার কিনারা ধরে নিজেকে সামলালেন।

তাঁর ডাকে চাকর আর মালী দড়ি নিয়ে দৌড়ে এসে ভাইদের খাদ থেকে টেনে তুলল। তারা তখন হাঁপাচ্ছে, বেজায় ফুর্তি তাদের, জামাকাপড় গেছে ছিঁড়ে। তৎক্ষণাৎ তারা ৎস্যুরিউপাকে তাড়া করল আর সে কানফাটানো অস্বাভাবিক স্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে ভিজে ঘাসের ওপর দিয়ে পেটেণ্ট চামড়ার জুতায় ছুটল...

এরি মধ্যে দরজায় গাড়ি যুতে তৈরী। কাঠের বাক্স ভর্তি মদের বোতল রাখা হল তলায়, দুই ভাই পিঠোপিঠি বসল তার ওপর। বসবার জায়গায় কুমার আর ৎস্নুরিউপার মাঝে অব্রাজৎসোভ ঠেসেঠুসে আসন করে নিল। কুমার টুপিটা কপালের ওপর চেপে নামিয়ে দিলেন। ৎস্নুরিউপা হেঁকে উঠল, "চালাও", অমনি ঘোড়াগুলো ঢালুপথে ছুটল খেয়াঘাট হয়ে কলিভানের দিকে।

৪

তামাকের ধোঁয়ায় ভরে যাওয়া একটা তক্‌তকে ঘরের মাঝখানে সাশা দাঁড়িয়ে। কনুই অবধি খোলা হাত, সবুজ এপ্রণ বুকের নীচে জড়ো করা।

সোজা আর মখমলের মতো ভ্রূ বসানো মিষ্টি মুখটি ফেরানো রয়েছে কুমারের দিকে, তাঁর প্রতি তার ভালোবাসা ঝরে পড়ছে কালো চোখ থেকে। সবেমাত্র গান শেষ করে সাশা দম নেবার জন্য থেমেছে, ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক করা, কারুবার মালা কাঁপছে গলায়।

'আবার গাও, আবার গাও সাশা!' চেঁচিয়ে উঠল অভ্যাগতের দল। সাশা হেসে মাথা নেড়ে নীচুস্বরে গাইতে আরম্ভ করল, যেন বুকের মধ্যে প্রাণ তার গুমরে কেঁদে উঠছে:

সোমরাজ, সোমরাজ,
তিক্ততম ঘাস তুমি,
আমার হাত ত' রোপণ করেনি তোমায়,
আমি ত' তোমায় বপন করিনি,
তুমিই দুষ্ট আপনা আপনি
জন্মেছ পৃথিবীতে,
আমাদের সবুজ বাগানে,
ছড়িয়ে পড়েছ ফুলদলে ...

আবরণশূন্যে টেবিলের তক্তার ওপর কনুই রেখে দপ্‌দপ্‌-করা মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে বসে কুমার মন দিয়ে শুনছিলেন। অব্রাজৎসোভ সাশার পাশ দিয়ে এধার থেকে ওধার পায়চারি করছে তুড়ি দিয়ে আর চোখ উপরে তুলে। রতীশেচভরা জামার বোতাম খুলে একটা বেঞ্চে বসে আছে। ৎস্যুরিউপা পা ছড়িয়ে দিয়ে পকেটে হাত চুকিয়ে বসে সামনে থেকে পিছনে আবার পিছন থেকে সামনে দুলে চলেছে।

সাশা গান শেষ করামাত্র কুমার ধরা গলায় বললেন :

'এখন সেই গানটা সাশা। মনে আছে আমি যেটার কথা বলছি?'

'সেটা মোটে ভাল নয়,' সাশা আস্তে আস্তে বলল। 'ওটা মিথ্যে গান, আমার ভাল লাগে না। শুধু আপনার জন্যে...'

চোখের পাতা নামিয়ে জোরে নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে বেদনাভরা সুরে সে আরম্ভ করল :

মস্কোতে ত' নয়, সে যে পিটার'এ,
নামকরা এক মেশ্চানস্কায়া রাস্তার ওপর
থাকত এক মেয়ে, সে যে খুন
করল তার আপন স্বামীকে,
এক্কেবারে মেরে ফেলল ছোরার আঘাতে।

'সাশা!' চেঁচিয়ে উঠলেন কুমার, গানের শেষ লাইনটা আওড়ে। 'চমৎকার — "ডানহাত তার জানালার ধারে, চোখ-জ্বালা করা অশ্রু তার ঝরে গলে পড়ল জানালার বাইরে" — যা হবার হয়ে গেছে, আর তার প্রেমিক জানালার নীচে দাঁড়িয়ে বুড়ো স্বামীটাকে উপহাস করছে। এই গানটা গাও, সব খুঁটিনাটি তার আমার ভারী পছন্দ...'

গলায় তার জড়াল সে
দড়ির একটা ফাঁস,
দড়ির শেষটা দিল ছুড়ে
প্রেমিকের বাড়ানো হাতে...

'বিলকুল ঠিক—আজকের জন্যে। যেন বিশেষ করে আমাদের জন্যেই লেখা। গেয়ে যাও সাশা...'

সাশা সভয়ে সগভীরে গেয়ে চলল:

শক্ত করে বাঁধল গেরো,
—খুলে যাবে না—
বুড়ো স্বামীর গলা
ছেড়ে যাবে না কো।
ককিয়ে উঠল বুড়ো,
যেন ঘুমোতে চায় সে,
মাটিতে পা ছুঁড়ল
যেন হামা দিতে চায়,
হাত দুটোকে ছড়িয়ে
নাচতে বুঝি চাইল,
দাঁত দু'পাটি বেরিয়ে পড়ল,
বেঁকানো মুখে তাকাল একপাশে।

হঠাৎ গান থামিয়ে সাশা তাড়াতাড়ি বলল:

'আলেক্সেই পেত্রোভিচ, এর চেয়ে বরং একটা নাচের গান গাই।'

কুমার টেবিলটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হাততালি দিয়ে মাটিতে পা ঠুকতে আরম্ভ করলেন। সাশা পাক খেয়ে হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে নাচের সুরে গানের কলি গাইতে সুরু করল।

তার লাল ঘাগরা ফুলেফেঁপে ছড়িয়ে পড়ল, তার তলায় সাদা মোজা আর পাতলা চামড়ার জুতোপরা পা মেঝেতে ঠুকে চলল নাচের তালে...

অব্রাজৎসোভ সাশার চারপাশে ছোটো ছোটো ধাপে ঘুরে ঘুরে চেঁচাতে লাগল, "কেয়াবাৎ, দেখো, দেখো!" ইভান রতীশেচভ আর থাকতে না পেরে কোমরে হাত দিয়ে উবু হয়ে নৃত্য জুড়ে দিল,

কোটের পিছন দুলিয়ে। ৎস্যুরিউপা খিল্‌খিল্‌ করে হেসে সাশার মাথা থেকে ফস্‌ করে রুমালটা খসিয়ে নিল।

'খবরদার ,ওর গায়ে হাত দিও না , জানোয়ার কোথাকার।' চেঁচিয়ে উঠলেন কুমার।

সুডৌল ঘাড়ের ওপর কালো বেণীজড়ানো ছোট্ট মাথাটি সাশা ফেরাল , যেন সূর্যের পানে সূর্যমুখী — তার সূর্য হলেন কুমার। তিনি বসে আছেন পাণ্ডুরমুখে মত্ত অবস্থায় , মুখ শুকনো খট্‌খটে। হঠাৎ সাশা নাচতে নাচতে ঘুরেফিরে কুমার যে বেঞ্চটিতে বসে ছিলেন সেই বেঞ্চে ধপাস্‌ করে বসে পড়ে দু'হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে ঘেঁসে বসল।

রতীশ্চেভরা দুই ভাই হুঙ্কার দিয়ে উঠল:

'আওরত! আওরত লে আও।'

ৎস্যুরিউপা অপমানিত বোধ করে অন্য ঘরে গিয়ে সাশার বিছানায় শুয়ে পড়ল সন্তর্পণে , যাতে তার পোষাকী জামার ভাঁজ নষ্ট না হয়...

'মজার গল্প ,' নিজে নিজেই বলল সে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে। 'বলবার মতো কথা বটে একটা , আমাদের প্রিয় কুমারবাহাদুর কেমন মজা লুটে থাকেন... ঐ তাঁর ডাকসাইটে বাগ্‌দত্তা... "জানোয়ার..." ভাল করে ওঁর মনে পড়াব জানোয়ার বলা। ছ্যা , সব হারামজাদার দল!'

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজাটা দড়াম্‌ করে খুলে গিয়ে শোবার ঘরে আলো পড়ল , অভ্রাজৎসোভ সেই হট্টগোল আর তামাকের ধোঁয়ার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে বাইরের দরজা দিয়ে উঠানে উধাও হয়ে গেল।

'মেয়েমানুষ জোগাড় করতে গেল ,' বলে চলল ৎস্যুরিউপা। 'একটু সবুর করো , আমি একটা বলনাচের ব্যবস্থা কবর। কুকুরগুলোর সামনে মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দেব — মস্কো থেকে নিয়ে আসব শীশ্‌কিনের গানের দল। শুধু শীশ্‌কিন নয় , খোদ শালিয়াপিনকে আনাব... খাতির খুব ভাল জিনিস , কিন্তু টাকার লোভ তোমাদের সবাই'এর।'

অনেকক্ষণ ধরে ৎস্নুরিউপা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল কী তাক্‌-লাগান তাজ্জব কারখানা সে করবে বড়লোকদের টেক্কা দেবার জন্য। অবশেষে চারজন মেয়ে উঠান পেরিয়ে ঘরে এল; তাদের স্বামীরা সেনাদলে কাজ করে অন্য জায়গায়। সঙ্কোচে জড়সড় হয়ে তারা দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করতে লাগল। অভ্রাজৎসোভ তাদের সামনে ঠেলে দিল জোরে ফিসফিসিয়ে:

'ভয় কিসের তোদের, বোকার দল। তোদের খেয়ে ফেলব না। তোদের মিষ্টি মদ কিছু দিয়ে আমরাও একটু গরম হয়ে নেব।'

মেয়েরা পাশের ঘরে ঢুকল, দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের ভিতর থেকে রতীশ্চেভদের চীৎকার আর হিহি হাসি শোনা গেল। তখনি সাশা আর কুমার শোবার ঘরে ঢুকলেন।

'ওগো, তুমি কোথায় যাচ্ছ? যেও না...' সাশা বলল।

কুমার জবাব না দিয়ে বারান্দায় চলে গেলেন। একটা হাত ধোবার মাটির গামলা খুঁটিতে ঝুলছিল। দরজার ভিতর দিয়ে বাইরের ক্ষীণ আলোতে ৎস্নুরিউপা দেখতে পেল কুমার হাতে করে জল নিয়ে মুখে ছিটিয়ে মুখ মুছলেন। সাশা অন্য খুঁটিটা ধরে দাঁড়িয়ে তাঁকে অনুনয় করেই চলল:

'মেয়েটির বয়স কম, শীগ্গির এই ভালোবাসার কথা ভুলে যাবে; আমি তোমার কাছে কিন্তু কিছুই চাই না, যখন মাতাল হয়ে পড়বে তখন তোমায় বিছানায় শুইয়ে দেব। যেও না... তবু যদি যেতেই হয়, কাল যেও ওগো।'

'চুপ করো। কী বকছ তুমি, নেশা হয়েছে তোমার নিজের,' বলে উঠলেন কুমার।

সাশা জবাব দিল না। জোরে দম নিয়ে, গাড়ি ডেকে কুমার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। সাশা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল। সহিস

তোয়াজ করে চালিয়ে নিয়ে এল ঘোড়াগুলোকে। উঠানের ফটক ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে উঠল, তারপর কুমারের গলা শোনা গেল, ''ভোলকভের ওখানে...''

গাড়ি চলে গেল গড়গড় করে। সাশা খুঁটি ছেড়ে সিঁড়িতে বসে পড়ল, সেখান দিয়ে আলেক্সেই পেত্রোভিচ হেঁটে গেছেন। হাঁটুতে কনুই'এর ভর দিয়ে মাথা নীচু করা তার নিথর মূর্তি, মাথার ওপর বাইরের বাড়িগুলোর ছাদ, কুয়োর ওপরকার বাঁশটার ভাঙাচোরা লাইনের আবছা চেহারা দরজার চৌকো ফাঁকটা দিয়ে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যেতে লাগল।

এ সব ৎস্যুরিউপার কাছে এমন সাধারণ আর বিরক্তিকর মনে হল যে তার মুখ বিকৃত হল এই চিন্তায়: "রাশিয়ার দৃশ্য, চুলোয় যাক্ সব। আমি চিরকালের জন্য প্যারিসে চলে যাব। আমার তো যথেষ্ট টাকা আছে... আর কুমারের কথা — আমি দেখব যাতে ঠিক লোকের কানে এসব পেঁছিয়। ও ত একটা আসল শয়তান..."

বন্ধ দরজার ওপারে মেঝেতে পা ঠোকার আওয়াজ আরো চড়েছে, হাসির হর্‌রা আর চীৎকার চলেছে, ওরা সব ফূর্তিতে মেতেছে।

# কাতিয়া

## ১

আলেক্সান্দ্র ভাদীমিচ্ তাঁর মেয়েকে আশীর্বাদ করে, তাকে চুমো খেয়ে, চটি পায়ে সোফার ওপর তাঁর জন্য পাতা বিছানায় গেলেন।

কাতিয়া পড়ার ঘরের দরজা ভেজিয়ে শালটা কাঁধে জড়িয়ে নিয়ে

হলে গেল। পুরোনো পার্কেটবসানো মেঝের ওপর চাঁদের আলোয় জানালার ফ্রেমগুলো নানা ছক এঁকেছে। হলের কোণগুলোতে যেখানে সোফাগুলো পাতা আছে, সেখানে অন্ধকার। মেঝেতে চাঁদের আলোর চৌকো ছকগুলো দেখে কাতিয়া গালে হাত দিয়ে এমন মিষ্টি হাসল যে তার বুকের স্পন্দন যেন হাতুড়ির মতো ধক্‌ধক্‌ করে একেবারে থেমে গেল।

'এখনও সময় হয়নি,' ভাবল সে, 'হয়তো তিনি অপেক্ষা করছেন? না, না, আমাকে আরও ধৈর্য ধরতে হবে।'

স্কার্টের পাশটা তুলে চোখ গোল করে সে ঘূর্ণিপাক খেতে লাগল...

সেই মুহূর্তে অদূরেই একটা দরজার দড়াম্‌ শব্দ হতেই তৎক্ষণাৎ কাতিয়া মাটিতে উবু হয়ে বসে পড়ল। কন্দ্রাতী একটা বাতি আর ভোলকভের কাপড়জামা হাতে নিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে আসছিল।

মেঝের ওপর কাতিয়াকে দেখে থেমে পড়ে ঠোঁট চিবোতে লাগল সে।

'আমি ভাবলাম বুঝি একটা ভূত,' বলল কাতিয়া কথার ফাঁকে প্রায় হেসে উঠে। 'আরে, এ যে দেখছি তুমি কন্দ্রাতী। আমার আংটি হারিয়েছে, এসো, খুঁজে দাও।'

কন্দ্রাতী কাছে এসে বাতি নিয়ে মেঝের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল:

'আংটি কিসের? এখানে তো কোন আংটি নেই।'

কাতিয়া হেসে উঠে প্রবেশপথে দৌড়ে পালাল... দরজার পিছন থেকে কন্দ্রাতীর উদ্দেশে জিভ ভেঙিয়ে ইচ্ছা করে জোরে জোরে পা ফেলে নিজের ঘরের দিকে এগোল, কিন্তু প্রবেশপথের শেষপ্রান্তে পৌঁছবার আগেই, যেখানে দেওয়ালে একটা কার্পেট ঝুলছিল, সেখানে একটা জানালার খোলে লুকিয়ে পড়ে হাসি চাপবার জন্য মুখে হাত চাপা দিল।

প্রবঞ্চিত কন্দ্রাতীর বিড়বিড়ানি আর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই কাতিয়া পা টিপে টিপে হলে ফিরে এসে বারান্দার দরজা দিয়ে সুড়ুৎ করে বাগানে নেমে পড়ল। অন্ধকার গাছের তলায় এসে সে থামল, সহসা বিষণ্ণতায় তার অন্তর ভরে গেছে।

"হয়তো আমাকে নিয়ে উনি এরি মধ্যে হাঁপিয়ে উঠছেন," ভাবল সে। "অন্তত এখন না হলেও শীগ্গিরই অবশ্য হাঁপিয়ে উঠবেন। আমার মধ্যে কী খুঁজে পান উনি? আমি কি কখনও ওঁকে সান্ত্বনা দিতে পারব? কত যাতনা পেয়েছেন উনি, আর আমার ওঁকে দেবার কীই আছে বা আছে বোকামি ছাড়া? বলিহারি নায়িকা আমি সত্যি।"

এত দুঃখ হ'ল যে সে একটা ঘাসে ঢাকা উঁচু বেঞ্চে বসে পড়ল। "আসল নায়িকা অন্নজল ত্যাগ করে, রাত্রে বিছানায় ছটফট করে, তার বুকে গোলাপফুল ফুটে থাকে, মোটেই আমার মতো নয়... আমি তো বালিশে নাক গুঁজে মোষের মতো ঘুমোই..."

কাতিউশা হঠাৎ জোরে হেসে উঠল। কিন্তু দুঃখের ভার তার একেবারেই কেটে যায়নি। দূরে পুকুরে ব্যাঙগুলো ডাকছে চীৎকার করে। গাছগুলোর লম্বা কালো ছায়ার ফাঁকে ঘাসগুলোকে জ্যোৎস্নায় রূপোলি মনে হচ্ছে।

হঠাৎ সে গলা বাড়িয়ে কান পেতে শুনল, তারপর শালের খুঁট দুটো চেপে ধরে গাছের সারির মধ্যে দিয়ে দৌড়ল। একটা মাকড়সার জাল গালে আটকে যেতে সেটাকে ঝেড়ে ফেলে পুকুরের পাড় ঘেঁষে পথটা যেখানে ঘুরে গেছে, সেইখানের ঝোপের ভিতর দিয়ে জলের ধারে তক্তার রাস্তাটার সোজা পথ ধরল কাঁটায় স্কার্ট আটকে যাওয়ার বাধা না মেনে। গ্রীষ্ম কুঞ্জের পিছনে চাঁদ ওপর থেকে আলো ছড়াচ্ছে জলের ওপর, চকচকে শালুক পাতার ওপর। গ্রীষ্ম কুঞ্জের ভিতরে, যে মোড়া টেবিলটাতে সাধারণত তারা অভ্যাগতদের সঙ্গে বসে চা

খায়, তার পাশে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন আলেক্সেই পেত্রোভিচ। কাতিউশার মনে হ'ল তাঁর বড় বড় বিস্ফারিত চোখ দুটি যেন একদৃষ্টে তাকিয়েই আছে কিন্তু কিছু দেখছে না।

"কী হয়েছে ওঁর?" নিমেষে এই কথা ভেবে নিয়েই সে ডাকল:

'আলেক্সেই পেত্রোভিচ!'

কুমার ভীষণ চমকে উঠে দাঁড়ালেন। কাতিয়া হাসতে হাসতে আর "খালি ঘুম আর ঘুম! কী লজ্জার কথা।" বলতে বলতে নড়বড়ে তক্তার ওপর দিয়ে তাঁর কাছে ছুটে এল।

আলেক্সেই পেত্রোভিচ তার হাতে দীর্ঘ চুমো খেয়ে ধরা গলায় যেন অনেকক্ষণ মৌন থাকার পরে বললেন:

'ধন্যবাদ, আপনাকে ধন্যবাদ...'

জীর্ণ রেলিঙটার ওপর কনুই'এর ভর রেখে তাঁর পাশে বেঞ্চে বসে দরদভরা সুরে জিজ্ঞাসা করল কাতিয়া:

'আবার আপনি নিজের কথা ভাবছেন? ভাবতে মানা করেছিলাম না? আপনি খুব ভাল, আমি তো জানি...'

মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে আলেক্সেই পেত্রোভিচ জবাব দিলেন:

'না, কাতিয়া, লক্ষ্মীটি, আমার পক্ষে বলা কী ভয়ানক কঠিন। যখন ভাবি আমি কী করছি।... আপনি আমায় একটু, একটুখানি ভালবাসেন?'

কাতিয়া মুচকি হেসে মুখ ফেরাল, কথার জবাব দিল না। কুমার তার পাশে বসে দেখছিলেন ঘাড়ের কাছে জড়ো করা চুল আর জলের ওপর লম্বাটে গালের পরিষ্কার ছায়া। তার মাথার আরো ওপরে জালের মধ্যে ঝুলছিল একটা মাকড়সা.।

'এখানে আসার পথে ভাবছিলাম, আপনাকে বলা উচিত কি না। যদি না বলি, তাহলে হয়ত আর কখনও এখানে আসার সাহস হবে

না, আর যদি বলি তাহলে আপনি নিজেই আমার প্রতি বিমুখ হবেন, আপনার বড় কষ্ট হবে, আমাকে ভুলে যেতে চেষ্টা করবেন... কী করব আমি?'

গম্ভীরভাবে কাতিয়া বলল:

'বলুন আমায়।'

'ভাববেন না যে আমি মিথ্যা বলছি বা ভান করছি?'

'না, তা ভাবব না।'

কুমার অতি কষ্টে ধরা গলায় বললেন:

'আমি অনেক খারাপ কাজ করেছি, কিন্তু তাদের মধ্যে একটার কথা আমার মনে সর্বদা খঁচ্‌খচ্‌ করে। বরাবর এ রকম হয়: আমরা মনে করি আমরা ভুলে গেছি, এদিকে কতকাল আগে যে কুৎসিৎ কাজ করেছি তা মনে এমন প্রকৃত কুৎসিৎ আকারে উপস্থিত হয় যে আর সহ্য হয় না...'

'দয়া করে বলুন আমায়,' আবার বলল কাতিয়া। শালের খুঁট চেপে ধরা তার হাত দুটো থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল।

'আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম, সব কথা আপনায় বলতেই হবে। এটা অনেকদিন আগের ঘটনা। না, অনেকদিন আগে নয়—মাত্র গেল বছর... একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল... সে ছিল বড় সুন্দর। শুধু তার রূপের জন্য এত মোহিনী ছিল না... সে এমন অদ্ভুত একটা সুগন্ধ ব্যবহার করত যাতে এক অনির্বচনীয় আমেজ ছিল লাম্পট্যের। শুনছেন কাতিয়া, যা বলছি? না, না, অমন করবেন না, মুখ ফেরাবেন না... তাকে দেখার আগে আমি আর কাউকে ভালবাসিনি। সর্বদাই ভাবতাম মেয়েদের প্রকৃতি আমাদেরই মতো। তা ঠিক নয়... কাতিয়া, মেয়েরা আমাদের মধ্যেই বাস করে অদ্ভুত আর ভয়ানক জীব বলে। তাছাড়া এই মেয়েটি ছিল ভ্রষ্টা এবং কীটের মতো ইন্দ্রিয়াসক্ত। ভ্রষ্টা

মেয়ে যে কী ভয়ঙ্কর জিনিস! দেখা হবার পর থেকে আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম ... মনে হল যেন ভীষণভাবে পুড়েছি আমি ...'

হঠাৎ থেমে আলেক্সেই পেত্রোভিচ আঙুল দিয়ে কপাল টিপে ধরলেন।

'যে কথা আমি বলতে চাই তা মোটেই এ নয়। আমি আপনাকে যন্ত্রণা দিচ্ছি। মনে রাখবেন, এসবই অতীতের কথা। এখন আমি তাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি ... সে আমায় জাদু করেছিল, সম্ভোগ করে পুরোনো দস্তানার মতো ছুড়ে ফেলেছিল। আমি জ্ঞানহারা হয়ে তার পিছনে ধাওয়া করেছিলাম ... যেন তৃষ্ণার্ত আমার মুখের কাছে জল এনে তাতে চুমুক দিতে না দিতেই কেউ ছিনিয়ে নিল, আমি আকুল হাত বাড়ালাম, আমার শুকনো মুখের ভিতর যেন আগুন জ্বলছে ... এক সন্ধ্যায় বলনাচের পরে আর কিছুতে থাকতে না পেরে, হয়তো শুধু রাগ করেই আমি সকলের চোখের সামনে তাকে চুমো খেলাম। পরদিন তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হতে সে আমাকে তার বাড়িতে যেতে বলল কী যেন একটা টিকিট ফিকিট নেবার জন্য। আমি বুঝলাম কিসের জন্য আমাকে যেতে বলছে, তবু গেলাম। আমার এখনও মনে আছে, সকালটায় খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল, বরফ দেখে আমার মন অত্যন্ত ভারী হয়ে গিয়েছিল। তার স্বামী পড়ার ঘরে টেবিলের পাশে বসেছিল, আমি যেতেই মাথা নীচু করল। তার মোটা হাতে ছিল একটা রূপোর সিগারেট-কেস। আমি দেখতে লাগলাম সে তার খাটো ঠাণ্ডায় অসাড় আঙুলে সিগারেট বার করবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না, এত কাঁপছে। পরে আমি ঠিক সেই মার্কা সিগারেট কিনেছিলাম। টেবিলে কাগজপত্রের ওপরে একটা সাদা তার-মুড়ানো চাবুক। আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে, কিন্তু সে শুধু সিগারেটের দিকেই তাকিয়ে আছে। হঠাৎ আমি হাল্কা সুরে "নমস্কার, কোথায় আপনার টিকিট?" বলে

হাত বাড়িয়ে দিলাম প্রায় সিগারেট-কেসটা ছুঁয়ে, কিন্তু সে তার হাত বাড়াল না। তার মোটো মুখটা নড়তে লাগল, বলল, "আপনার ব্যবহার আমি অপমানকর আর কদর্য মনে করি ..." তাইতে, মনে হয় না খুব জোরে, কিন্তু চেঁচিয়ে আমি বললাম, "আপনার এত স্পর্ধা হ'ল কী করে?" জ্বরের ঘোরে মানুষের যেমন কাঁপে তেমনি কাঁপতে লাগল সে, মুখ কুঁচকে উঠল আর চাবুকটা হাতে নিয়ে মারল আমার মুখে। আমি নড়লাম না, কোন যন্ত্রণাও টের পেলাম না। আমার চোখে পড়ল তার ওয়েস্টকোটের দুটো বোতাম খোলা, মোটাদের সাধারণত যেমন হয়। আমি সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। "এই নাও," বলে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে সে আমার গলায় আবার চাবকাল। চট্ করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমি একটা রিভলভার বার করলাম। তার হাতেও বেরোল একটা রিভলভার, আমার দিকে এগিয়ে এল সে। রাগের মধ্যে সে হাসছিল, এদিকে আমি তার রিভলভারের কালো ঘরগুলোর মধ্যে সীসের গুলিগুলোকে পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম ... কী ভয়ানক! মনে হল আমি মরতেও পারব না, মারতেও পারব না, তাই পিছিয়ে আসতে গিয়ে আয়নাটার কাছে কার্পেটে পা হড়কে গেল। আয়নায় দেখতে পেলাম মেয়েটা খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে টুপি আর লম্বা দস্তানা পরে। ঠোঁট চেপে সে আমাদের প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছিল। "আমার সহকারীদের পাঠাব আমি," আমি বলতেই তার স্বামী মাটিতে পা ঠুকে চীৎকার করে উঠল, "সহকারী দেখাচ্ছি তোমায়, কুত্তার বাচ্চা। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।" আমি চোখ বুজে রিভলভার তুললাম। সে আমায় প্রথমে হাতে, তারপর চোখে মারল, আমি কার্পেটের ওপর পড়ে গেলাম। তারপর উঠে বাইরের ঘরে গিয়ে নিজের কোট পরলাম। সে চাবুক হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে রইল, যেন আমি একজন অভ্যাগত আর আমায় সে বিদায় জানাচ্ছে, কিন্তু আর মারল না ...'

দম নেবার জন্য একটু থেমে তখনই আবার আরম্ভ করলেন আলেক্সেই পেত্রোভিচ :

'আমার একটিমাত্র করণীয় রইল। তিনদিন ধরে আমি জ্বরের ঘোরে বিছানায় পড়ে রইলাম দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে। ঘুম নেই চোখে, যা কিছু ঘটেছিল সমস্ত অবিকল মনে পড়তে লাগল: কেমন করে সেখানে গেলাম, কেমনভাবে সে সিগারেট-কেসটা ধরেছিল, আমার নিজের সমস্ত কথা, কেমন করে সে আমাকে চাবুক মারল... এপাশ ওপাশ করতে করতে আমি আনুপূর্বিক ভাবতে লাগলাম: আমার কী করা উচিত ছিল? শোধ নেবার জন্য এখন আমি কী করি... বিছানায় উঠে বসে দাঁতে দাঁত ঘষলাম... কিন্তু আমার ইচ্ছাশক্তি চলে গিয়েছিল... আমি বুঝছিলাম যে আমার উচিত উঠে বেরিয়ে একটা নতুন রিভলভার কিনে (পুরোনোটা তার বাইরের ঘরে ফেলে এসেছিলাম) তার ওখানে গিয়ে তাকে খুন করা। কিন্তু তা করতে পারলাম না, বিছানায় চিৎ হয়ে পড়লাম আর দেওয়ালের কাগজের দিকে তাকিয়ে রইলাম একদৃষ্টে। অবশেষে স্থির করলাম যে আমায় অন্য কিছুর কথা ভাবতে হবে: ভাবতে আরম্ভ করলাম আমার সেনাদলের কথা, যে গাঁয়ে ছুটি কাটাতে যেতাম তার কথা। নিজের জন্য আমার অনুকম্পা হতে লাগল, কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে নিজের ওপর ঠিক সেইরকমই করুণা হতে লাগল। আমি বিশ্বাস করতে চাইলাম না যে অন্যায় একটা কিছু ঘটেছে। কিন্তু আমার করার যা বাকি আছে তা আরো খারাপ। কিছু আগে পর্যন্ত আমি ছিলাম স্বাধীন। কিন্তু এখন আমায় এটার হেস্তনেস্ত করতেই হবে, এড়াবার উপায় নেই... সবচেয়ে খারাপ লাগছিল এই যে আমার আর গত্যন্তর ছিল না... জামাকাপড় পরে রাস্তায় বেরিয়ে কলারটা তুলে দিয়ে একটা ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে বন্দুকের দোকানের ঠিকানা দিলাম,

কিন্তু তখনি মত বদলালাম। রিভলভারে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, তার চেয়ে ভাল যদি ওকে তলোয়ারের খোঁচায় শেষ করি... তার বাড়ির কাছে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় পায়চারি করতে লাগলাম।

'এখনও আমার মনে পড়ে গালপাট্টা আর লাল টক্‌টকে নাকওয়ালা একজন জেনারেল পাশ দিয়ে গেলেন। আকাশ পরিষ্কার, ঠাণ্ডায় সব জমে যাচ্ছিল। আমার মনে হল, "যাই, গিয়ে ওর কাছে মার্জনা চাই, তাহলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু না, না, মানুষ বড় নির্দয়, তারা নিষ্ঠুর, বিদ্বেষপরায়ণ, দরকার তাদের অপমান করা, খুন করা, হেয় করা ..." ঠিক সেই মুহূর্তে সৈন্যদলের একজন অফিসার আমার সঙ্গে ধাক্কা খেল। বালক মাত্র—গোলাপের মতো তার গালের রঙ। আমায় খুব ধাক্কা দিয়ে সে ভদ্রভাবে আমার কাছে মাপ চাইল... আমার কিন্তু তখন মাথার ঠিক নেই, চীৎকার করে তাকে বললাম, "গাধা কোথাকার!.." অফিসারটি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হল, কিন্তু আমি সোজা তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছি দেখে সে ভ্রূ কুঁচকে ছোট উপরে-নাক-বাঁকানো মুখটি আমার দিকে তুলে "প্রিয় মহাশয়..." ইত্যাদি আরো কিছু বলল। আমি তাকে অপমান করে তখনি ডুয়েলে আহ্বান করলাম। পরদিন সকালে আমরা লড়লাম। সে আমার পায়ে গুলি বসাল। ছেলেমানুষ বেচারী সমস্ত ব্যাপারটাতে এত ব্যথা পেয়েছিল যে আমার পাশে বসে কাঁদতে লাগল। আমি বরফের ওপর পড়ে রইলাম পরিষ্কার নীল আকাশের দিকে মুখ করে... অদ্ভুত শান্তি এল মনে। ব্যস্...'

কাতিয়া অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না, তার হাত দুটো শালের তলায়। তারপর তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করল:

'আর সেই মেয়েটা?'

আলেক্সেই পেত্রোভিচ বেঞ্চ থেকে পড়ে গেলেন কাতিউশার পায়ের কাছে। তার হাঁটুতে কপাল ছুঁয়ে বললেন হতাশ স্বরে :

'প্রাণের কাতিউশা , আমায় কি ক্ষমা করেছেন ? বুঝতে পেরেছেন ? সহজ নয় জানি ... আমাকে কি ঘৃণা করেন না আপনি ? '

কাতিয়া হাঁটু সরিয়ে নিয়ে জবাব দিল :

'খুব কষ্ট হল আমার। আপনি চলে যান আমার সামনে থেকে , আর আসবেন না কিছুদিনের জন্য।'

উঠে পড়ে আঙ্গুল বাড়িয়ে দিল কুমারের চুম্বনের জন্য , তারপর মুখ ফিরিয়ে পুকুর পাড়ের তক্তার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল অন্ধকার গাছগুলোর দিকে। গাছের আড়ালে চাঁদের আলোয় সাদা তার পোষাক ছায়ায় অদৃশ্য হল।

সে জায়গাটার দিকে আলেক্সেই পেত্রোভিচ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর সিঁড়ি বেয়ে জল পর্যন্ত নেমে আঁজলা আঁজলা জল তুলে মাথায় আর মুখে দিতে লাগলেন।

২

পা টিপে টিপে নিজের ঘরে এসে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনের বাতিগুলো জ্বালিয়ে কাতিয়া শালটা ছুড়ে ফেলল , বোতাম আলগা করে ব্লাউজ খুলে ফেলল , তারপর চুলের কাঁটাগুলো খুলে নিতেই তার চুল ছড়িয়ে পড়ল কাঁধে আর বুকে।

তার হাতে চিরুণী কিন্তু কাঁপতে লাগল ; নরম চুলগুলো মুখে চেপে ধরে সে বসে পড়ল একটা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আরামচেয়ারে।

গত একঘণ্টায় সে এতকিছু শুনেছে , এত অভিজ্ঞতা তার হয়েছে যে যদিও এখনও সে ঠাহর করতে পারছে না কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ , তবু সে অনুভব করছে একটা দুর্বিপাক ঘটে গেছে।

মাত্র একঘণ্টা আগে সে ভেবেছিল কুমার আর সে বুঝি সমস্ত পৃথিবীতে একা, তাদের মতো গভীরভাবে আর কেউ কখনও ভালবাসেনি। ভারী চুলের বোঝার ভারে মাথা যেমন নুয়ে পড়ে তেমনি ভালবাসার ভারে তার বুকটা মুচড়ে উঠছিল। এই ভালবাসবার আগে যেন সে সত্যিকারের বাঁচেনি। কুমারও কি সত্যিকারের বেঁচে ছিলেন তাকে জানার আগে? হঠাৎ তিনি এসেছিলেন তার জীবনে, তাঁর সমস্তটাই ছিল কাতিয়ার, আর কারুর নয়। এই ত ঘণ্টাখানেক আগেকার কথা। ফিস্‌ফিসিয়ে বলল সে:

'কী ভীষণ ব্যাপার, সমস্ত ঘটনা এ রকম খুঁটিয়ে বলা। কলঙ্ক যে থেকেই যাবে, কখনও মুছবে না... এই জন্যই কি কুমার সর্বদা বিষণ্ন? নিশ্চয়ই এখনও সেই মেয়েটাকে ভালবাসে... নিশ্চয়ই তাই, নইলে ওর এত ভাবনা হত না, আমাকে বলতই না। মুখে, চোখে চাবুক খেয়েছে... আর ও চোখে তো চুমো খেতে পারিনি... আর ও কিনা কিছুই করল না, তাকে আক্রমণ করল না, খুন করল না... অক্ষম, তুচ্ছ কোথাকার... কিন্তু না, না... তুচ্ছ হলে আমায় তো কখনও বলত না। তারপর সঙ্গীহীন যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় তিনদিন পড়েছিল, চোখে বেদনা আর যাতনা নিয়ে। আহা, আমি ওর বিছানায় বসে ওর মুখ হাতে নিয়ে বুকে চেপে ধরতাম... ওর সমস্ত দুঃখ, সমস্ত বেদনা নিয়ে ও একা, একেবারে একা পড়ে আছে... কেউ ওকে বোঝে না, ওর দুঃখে কারো প্রাণ কাঁদে না... কিন্তু আমি তো ওকে ব্যথা সইতে দেব না... আমি যাব সেই মেয়েটার কাছে, মুখের ওপর বলব সে কী... হে ভগবান, আমি কী করব?'

শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভটা বুলিয়ে নিয়ে কাতিয়া আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে, কিন্তু চোখ অন্ধকার, কিছুই দেখছিল না। ধীরে ধীরে চুলগুলোকে খালি পিঠের ওপর ছড়িয়ে ফেলল। তার

সুডৌল কাঁধ, বাহু, লেসে আধোঢাকা সুকঠিন স্তনাগ্রচূড়া মর্ম্মরশুভ্র... গাল আগুনের মতো লাল। অবশেষে নিজের চেহারা দেখতে পেয়ে সে গর্বের হাসি হেসে ভাবল, "এই ত আমি, এখন পর্যন্ত কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি, কারুর স্পর্ধা নেই হাত দেবার, আর ও কিনা অশুচি, বেত্রাহত।"

চট্ করে উঠে পোষাক ছেড়ে ফেলে ধীরে ধীরে চুল বিনুনি করতে লাগল সে। বিনুনি করা শেষ হলে এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবল, তারপর মাথা ঝাঁকি দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

দেওয়ালে আর একটা ডিমের মতো আকৃতির আয়নায় প্রতিবিম্বিত হল তার ঠাকুমার আমলের কাজ করা মোটা পায়াওয়ালা নীচু প্রকাণ্ড খাট, তার ওপর বালিশে চেপে থাকা ঘৃণায় কুঁচকে ওঠা কাতিয়ার ঠোঁট আর টকটকে লাল মুখ। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, সে ফিসফিস করে বলে উঠল:

'আমিও ওকে ব্যথা দেব।' তারপর উপুড় হয়ে ছোট মেয়ের মতো কান্নায় ভেঙে পড়ল, কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল তার কাঁধ আর পিঠ।

কেঁদে কেঁদে কাতিয়া ঘুমিয়ে পড়ল। উঁচু সাদা ধবধবে ঘরে দুটো বাতি জ্বলছিল। আসবাবপত্রের কালো উষ্ণ ছায়া কার্পেটের ওপর। এত নিস্তব্ধ ঘর যে মনে হচ্ছিল চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেলা পোষাকটা বুঝি আপনিই খস্‌খস্ করে উঠবে। কোণে একটা ঝিঁঝিঁপোকা নীরস একঘেয়ে ডাক সুরু করল।

তারপর খাটের পিছন থেকে বেরিয়ে এল একটা লম্বা লাল মানুষের মতো মূর্তি, খড়ের মতো শুকনো। মাটি না ছুঁয়ে সেটা পা ছুঁড়ে লাফাতে লাগল; তার হাতে সরু সরু তার। সেই তারগুলো ছুটে এসে কাতিয়াকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলল, লোকটা তখনও নেচে চলছে।

তারপর কম্বলটা যেন গুটিয়ে উঠে তাকে চেপে ধরল পাথরের মতো ভারী হয়ে। পা ঠাণ্ডায় জমে গেল। লাল সরু আংটাগুলো মাথার ওপরে একবার পাকিয়ে উঠে একবার খুলে গিয়ে একাকার হয়ে গেল... লোকটা তার বুকের ওপর লাফিয়ে পড়ে গলাটা চেপে ধরল...

কাতিয়া চীৎকার করে কোনরকমে নিজেকে বালিশের ওপর টেনে তুলল। হাত বাড়িয়ে ভারী বোঝাটা ঠেলে ফেলতে চায়। বাতির আলো বিঁধল তার চোখে, সে আবার ধপ্ করে চিৎ হয়ে পড়ল... জ্বরে তার সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে।

# চুকলিকথা

১

সে রাত্রে আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচের বেশ ভাল ঘুম হয়েছিল — মশা কামড়ায়নি, অভ্যাসমতো বেশ সকালেই জেগে উঠলেন।

ঘুমজড়ানো চোখ খুলে হাত বাড়িয়ে ক্ভাসের মগটা থেকে একঢোক খেয়ে "আঃ" করে পাশ ফিরে চিৎ হয়ে শুতেই গদির স্প্রিঙ্গুলো ক্যাঁচ্কোঁচ্ করে উঠল। মুখটা ভীষণ বিকৃত করে "মারো গোলি" বলে চেঁচিয়ে উঠে বসে সটান ফেল্টের চটিজোড়ার মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিলেন।

তারপর বসে বসেই ঘরের চারিদিক দেখতে লাগলেন খুশীমনে। ঘরটা পুরোনো, দেওয়ালের কাগজ জরাজীর্ণ। তাঁর বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে ঘরের কিছুই বদলানো হয়নি। একদিকে ঝুলছে একটা ঘোড়ার কলার, রঙচঙে গাড়ির জোয়াল আর ঘোড়ার জিনসাজ —

শেষটা আলেক্সেই অর্লোভ্ তাঁর প্রপিতামহকে উপহার দিয়েছিলেন। উল্টোদিকের দেওয়ালের কাছে একটা ডামী কুকুর আর ডাণ্ডায় একটা চেরকেশীয় ঘোড়ার জিন দাঁড় করানো। এককোণে ডাঁই করা কাস্তে কোদালের আদর্শমতো নমুনা। সোফার ওপরে পেরেক দিয়ে আঁটা তাঁর পেয়ারের ঘোড়াগুলোর ছবি। লেখার টেবিলের ওপর অনেক বছর ধরে জমানো একটা কৃষি-পত্রিকার বাঁধানো ফাইল, কাগজের মধ্যে রকমারি বীজ, হিসাব পত্র, সিগারেট-দানির গাদা আর অন্য রকম সব জঞ্জাল।

শীতের কয়েকমাস যখন চারিদিক বরফে ঢেকে যায়, তুষার-ঝড় বইতে থাকে, তখন আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচের সময় কাটানো দুর্ঘট হয় বলে নানারকমের কাজ তিনি খুঁজে বার করেন। যা যা জিনিসের দরকার বার্লিন কিম্বা মস্কো থেকে অর্ডার দিয়ে আনান... একবার তিনি জোগাড় করলেন একটা পেন্সিলের মুখ সরু করার কল। কস্ত্রাতীর কাজ হল রাজ্যের ভাঙা পেন্সিল খুঁজে পেতে এনে কর্তার হাতে দেওয়া ... তারপর আলেক্সান্দ্র] ভাদীমীচের ঝোঁক হল ফটোগ্রাফির দিকে: নেগেটিভে আর কাঁচের টিউবে এ্যাসিডে ঘর বোঝাই হয়ে গেল। আর এক শীতে তিনি কার্ডবোর্ডে খামারবাড়ি, কল, চাষের যন্ত্রপাতির নক্সা কেটে কেটে আঠা দিয়ে জোড়া লাগালেন। একবার এক আগন্তুক সার্ভেয়ারের কাছে শুনলেন যে বাড়িতেই বিজলীর ব্যবস্থা করা যায়, অমনি সমস্ত দরকারী সরঞ্জাম অর্ডার দিয়ে আনিয়ে বহুকষ্টে নিজের পড়ার ঘরে বিজলীবাতি জ্বালাবার ব্যবস্থা করলেন। কাতিউশাকে তিনি প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দিয়েছিলেন যে তার ঘরেও বিজলীর ব্যবস্থা করে দেবেন, কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই খেলা থেকে তাঁর মতিগতি অন্যদিকে চলে গেল। বসন্তকালে নদীর জল কুলকুল করে বইতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরও শিরায় রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, তিনি রীতিমতো

সম্ভ্রান্ত কাজে সম্পূর্ণ মেতে উঠলেন। মার্চ মাসে তিনি ঘোড়াগুলোকে জোড় খাওয়ালেন, এপ্রিলে বাঁধটা শক্ত করে বাঁধালেন, মে মাসে ঘোড়দৌড় করালেন, তারপরেই এসে গেল ঘাসশস্য কাটাই আর মাড়াই'এর সময়, তারপর এল হেমন্ত, যখন সকলের রীতিমতো মাতাল হবার পালা এবং চতুর্দিকে বিয়ের হিড়িক।

বিছানায় বসে বসে বিরক্ত হয়ে উঠে আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ সতেজে হাঁকলেন:

'কল্রাতী। আমার পেণ্টুলেন।'

কন্দ্রাতী ঢিলে পেণ্টুলেন হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে ঝুঁকে সেলাম করে বলল:

'সুপ্রভাত হুজুর।'

'সব ঠিক আছে তো?' জিজ্ঞেস করলেন আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ভগবানের দয়ায় সব ঠিক আছে।'

'কিছু ব্যাপার স্যাপার ঘটেছে?'

'আমি ত কিছু জানি না।'

'চাষাগুলো এসেছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তারা এসেছিল।'

'তাদের কী বললে?'

'আমি বললাম, কর্তার হুকুম তোমাদের খেদিয়ে দেব।'

'তারা করল কী?'

'কিছু না। সরে গেল। গরু চরাবার আর কোন জায়গা না থাকলে তারা করবে আবার কি—মাথা চুলকোনো ছাড়া?...'

'এ আবার কী ধরনের কথা? সাবধান কন্দ্রাতী...' বলে কন্দ্রাতীর দিকে তিনি এমন কট্‌মট্‌ করে তাকালেন যে বেচারী মুখ ফিরিয়ে ঠোঁট চিবিয়ে চিবিয়ে আস্তে আস্তে বলল:

'দিদিমণির বোধ হয় অসুখ করেছে।'

'কী বললে?'

'অসুখ করেছে তাঁর... সারারাত ছট্‌ফট্‌ করেছেন... এই হল ব্যাপার।'

'হুঁ', বলে আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ চোখ কোঁচকালেন। ভোলকভ্‌ বংশের কারো অসুখ হতে পারে, এ তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁর মেয়ের যদি সারারাত ঘুম না হয়ে থাকে তাহলে তার মানে নারীসুলভ বোকামি তাকে কাবু করেছে, অতএব একমাত্র চিকিৎসা তার বিয়ে দেওয়া। মেয়ের বিয়ের চিন্তায় তাঁর চোখ কুঁচকে উঠল। উপ্‌যুক্ত বর কোথায় পাওয়া যায়? কে জানে বাপু। কুমারের কথা নিশ্চয়ই মনে হয়, কিন্তু তাকে দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করানো যায় কী করে? বাড়িতে সে আসে, শোনা যায় রাত্রে বাগানে কাতিয়ার সঙ্গে দেখাও করে, কিন্তু বিয়ের কথাটি তোলে না — পাজি কোথাকার। এই সব চিন্তায় তাঁর বড় ঝামেলা মনে হল। তিনি ভাবলেন একদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই কন্দ্রাতী এসে যদি বলে, "হুজুর, দিদিমণির বিয়ে হয়ে গেছে", তাহলে কত ভাল হয়...

'চুলোয় যাক্‌, তোমরা সবাই আমাকে পাগল করে দেবে,' এই বলে আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ অবশেষে মুখ ফিরিয়ে কেশে থুথু ফেললেন। তারপর কন্দ্রাতীর দিকে পাদুটো বাড়িয়ে দিয়ে ঢিলে পেণ্টুলেনের হাড়ের বোতাম এঁটে উঠে দাঁড়ালেন।

'গাড়িতে ক্লাউজনিৎসাকে যুততে বলো,' এই বলে তিনি মুখ ধুতে গেলেন।

মুখ হাত ধোবার জায়গাটাতে একটা চীনামাটির পাত্র এমনভাবে দুটো কড়ায় ঝোলানো ছিল যে তার মুখটাতে হাত দিলেই একসঙ্গে হুড়হুড় করে জল বেরিয়ে আসত। হাঁপাতে হাঁপাতে মুখ হাত ধুয়ে

আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ একটা মোটা কাপড়ের জামা পরলেন। জামাটা তিনি এতকাল ধরে পরছেন যে সেটার চেহারা তাঁর গায়ের মাপের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে, এমনকি তাঁর বুকের বোঁটাও দেখা যায়। তারপর তিনি ঢুকলেন খাবার ঘরে।

সেখানে কফি খেতে খেতে তাঁর মনে পড়ল মেয়ের কথা। ভ্রূ কুঁচকে চললেন প্রবেশপথ দিয়ে মেয়ের ঘরের দিকে।

কাতিয়া বিছানায় শুয়ে, মুখ শুকনো আর ফ্যাকাসে। উঠে বসে সে বাবাকে চুমো খেল, তার হাত বাবার হাতের মধ্যে ধরা, তারপর আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে গালের নীচে হাত দুটি রেখে চোখ বুজল।

'এ্যাঃ, গলে পড়েছ দেখছি,' বলে আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ নিজের নাক আঙুল দিয়ে সজোরে ঘষে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তার ডাকব?'

কাতিউশা চোখ না খুলেই ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ খালি জেদের বশে তৎক্ষণাৎ কন্দ্রাতীকে হুকুম করলেন, গাড়ি নিয়ে কলিভানে গিয়ে জ্যান্ত বা মরা যে অবস্থায় হোক ডাক্তারকে ধরে নিয়ে আসবে। মেয়ের গাল চাপড়ে অলিন্দে বেরিয়ে এসে কোমরে হাত দিয়ে গাড়িতে যোতা বাদামি ঘুড়ীটার দিকে তাকিয়ে তারিফ করতে লাগলেন।

ক্লাউজনিৎসা ঘুড়ী লালচে চোখ ঘুরিয়ে কান খাড়া করে পিছনের পায়ের উপর চেপে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে কতক্ষণে ছাড়া পেয়ে বদমায়েসী করতে পারবে। কোচওয়ান তার লাগাম ধরে হাসতে হাসতে বলল:

'এটা শয়তান, আজ সকালে আস্তাবলের সহিসের হাতে বেশ কামড়েছে।'

আস্তাবলের সহিস বেচারী টুপি খুলে বলল:

'হুজুর, এ রকম জখমে কিছু পড়া উচিত।'

'ঠিক আছে, বাবুর্চিখানায় গিয়ে কিছু মদ নাও গে,' বললেন আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ। অলিন্দ থেকে নামার সময় আহ্লাদে তাঁর গা একটু কেঁপে উঠল। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে লাগাম হাতে নিয়ে ঠিকঠাক করে সাদা টুপিটা মাথায় চেপে বসিয়ে মৃদুস্বরে বললেন :

'ছেড়ে দাও।'

কোচওয়ান লাগাম ছেড়ে দিল, কিন্তু ক্লাউজনিৎসা নড়ল না। গোলাপী নাক ফুলিয়ে নাক দিয়ে কেবল সজোরে শব্দ করল।

'চল, বেটী,' বলে আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ লাগাম আছড়ালেন। ক্লাউজনিৎসা একটু পিছু হটে পেছনের পায়ে চাপল। কোচওয়ান আবার লাগাম ধরতে যেতেই ভোলকভ চেঁচিয়ে তাকে হাত দিতে মানা করে দুই লাগামে ঘোড়াটার পিঠে মারলেন।

ক্লাউজনিৎসা সামনে লাফিয়ে বসল, তারপর হঠাৎ খাড়া হয়ে দাঁড়াল। ভোলকভ আবার তাকে মারতেই পিছন দিক দুলিয়ে তাঁর সারা গায়ে ময়লা ছিটিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল... সহিস কোচওয়ান ছুটল পিছনে। ক্লাউজনিৎসা ইতিমধ্যেই রাস্তায় উঠেছে, আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ বৃথাই লাগাম টেনে থুথু ফেলে হাঁপিয়ে চোখ ঘুরিয়ে অস্থির হওয়া ছাড়া কিছু করতে পারছেন না। ফটক পর্যন্ত দৌড়ে এসে কোচওয়ান আর সহিস হাঁটু চাপড়ে হেসেই খুন: "নাও, সামলাও—ক্‌ভাসের চেয়ে কড়া জিনিস এবার ..."

ক্লাউজনিৎসা রাস্তা ছেড়ে ছুটে ঘাসের মধ্যে নেমে পড়ল। সেগুলো তার পায়ে বাধতে, পা ছুড়ে চিঁহিঁ শব্দ করে সব রকমে চেষ্টা করল গাড়িটাকে উল্টে ফেলার, কিন্তু আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ শক্ত করে চেপে বসে তাকে চড়াই'এর পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। হাওয়ায় তাঁর গোঁফ উড়তে লাগল ফর্‌ফর্‌ করে।

কোনরকমে তা করলেন তিনি। কিন্তু ক্লাউজনিৎসা বাড়িটা আড়ালকরা চড়াই'এর মাথায় উঠেই এক নতুন প্যাঁচ খেলল: পুরোজোরে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ গাড়ির দুই বমের মাঝে ধপ্ করে শুয়ে পড়ল।

ভোলকভ্ এটা আশা করেননি। ঘোড়াটা শুয়ে পড়তে তিনি গাড়ি থেকে নেমে তাকে ওঠাবার চেষ্টা করলেন।

ক্লাউজনিৎসা কিন্তু নিজেই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে ভোলকভ্‌কে উল্টে ফেলে দিয়ে মাঠ বেয়ে ছুটল। গাড়িটাও ঝড়্ঝড়্ করে চলল পিছনে পিছনে...

আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচের অত্যধিক রাগ হল। তিনি ঘোড়ার পিছনে ছুটতেন, কিন্তু তখনি হেঁপে উঠে থেমে গিয়ে দম নেবার জন্য গেল বছরের খড়ের একটা গাদার পাশে শুয়ে পড়লেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে খড়ের গাদার অল্পদূরে রাস্তার ওপর এল দড়ি দিয়ে বাঁধা দুটো লিক্‌লিকে ঘোড়ায় টানা একটা বেতে-বোনা গাড়ি...

গাড়ির লোকগুলো ভোলকভের দুর্দশা পরিষ্কার দেখেছে। ঘোড়াগুলো থামিয়ে একজন্ন চেনা গলায় হাঁকল:

'আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ, লেগেছে নাকি?'

ভোলকভ্ তাদের দেখে নিজের মনেই বাপান্ত করলেন। অব্রাজৎসোভ ঘুমোচ্ছে গাড়িটার মধ্যে, তার মাথাটা ঝুলে পড়েছে। ৎস্যুরিউপা সান্ধ্য পোষাক আর পেটেণ্ট চামড়ার জুতো পায়ে ঘাসের ওপর দিয়ে খড়ের গাদার দিকে এগিয়ে আসছে...

"শয়তান ব্যাটা দেখেছে," মনে মনে বললেন ভোলকভ্। "এখন সারা জেলার লোকের কানে যাবে যে পাজি ঘুড়ীটা আমাকে জব্দ করেছে।"

ৎস্যুরিউপা দৌড়ে এসে হাঁটু পর্যন্ত পেণ্টুলেন গুটিয়ে ভোলকভের ওপর ঝুঁকে পড়ে বসে বলল:

'কী সর্বনাশ! অজ্ঞান হয়ে গেছেন?'

ভোলকভ্ তড়াক্ করে উঠে বসলেন।

'কী চাও হে তোমরা সব! আমি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম, ক্লান্ত হয়ে গেলাম—তাই ছায়ায় শুয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি।'

'কিন্তু আপনার ঘোড়া কোথায় গেল আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ?'

'পালিয়েছে... জাহান্নমে যাক্... মুস্কিল ত সেইখানে।.. সমস্তক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, বোধ হয় মাছিতে উত্ত্যক্ত করছিল তাকে।'

ৎস্নুরিউপা বলল:

'ঘোড়াটা গেছে খামারের দিকেই, আমরা ঢিবীর ওপর থেকে দেখেছি। কিন্তু সে কিছু নয়... আমি খুসী যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আপনার কাছেই যেতে চাচ্ছিলাম একটা বিশেষ জরুরী কথা বলতে।'

ভোলকভের কানের কাছে মুখ নামিয়ে চুপিচুপি বলল:

'আমি আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই যে কুমার ক্রাস্নপোল্স্কী আলেক্সেই পেত্রোভিচ একটি আসল শয়তান—এ কথা নিশ্চয় কেবল আপনার আমার মধ্যে।'

প্রথমে গুঁড়ি মেরে তারপর সোজা দাঁড়িয়ে উঠে পোষাক ঠিক করে আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ প্রশ্ন করলেন:

'কী ব্যাপার? আরো কেচ্ছা ছড়াচ্ছ?'

'কেচ্ছা আমি মোটেই ভালবাসি না,' তাড়াতাড়ি বলে চলল ৎস্নুরিউপা। 'এটা খুবই খারাপ নীতি, এ কেবল আপনার সঙ্গে হৃদ্যতা আছে বলে; তা ছাড়া ইজ্জতের কথাও ত আছে। গতকাল, বুঝলেন কিনা, আমরা তার ওখানে খেতে গিয়েছিলাম। আমি, রতীশ্চেভরা দুই ভাই আর অব্রাজৎসোভ—দেখুন না ওর অবস্থাটা কী এখন। কুমারের খাবার টেবিলে যা বাড়াবাড়ি হল তা বলতে গেলে

একেবারে জঘন্য। খাওয়ার পরে যত রকম বিশ্রী কাণ্ড, তারপর আবার প্রস্তাব করলেন কলিভানে মেয়েমানুষের কাছে যাওয়া যাক। এ কেমনতর ব্যাভার।... কিন্তু কী করি, দলে পড়ে যেতেই হল। গেলাম গাড়ি করে। কলিভানে সকলে মিলে মদ খাওয়ার চরম করল, তারপর নিয়ে এল চারটে উলঙ্গ মেয়েমানুষ।'

'উলঙ্গ?' আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, তাই তো ... জঘন্য কুৎসিৎ ব্যাপার, কিন্তু আমি ভাবলাম দেখি কুমারের দৌড়টা কতদূর। ভাবতে পারেন তারপর সে কী করল?' ৎস্যুরিউপা এক মুহূর্ত থেমে ভোলকভের দিকে এমন সোজা কট্‌কট্‌ করে তাকাল যে তিনি চোখ পিট্‌পিট্‌ করে হঠাৎ গলা খাঁকারি দিয়ে উঠলেন। 'ভাবুন একবার, প্রায় মাঝরাতে আমাদের কুমারবাহাদুর উঠানে ছুটে বেরিয়ে চীৎকার করল, "হেইয়ো, ঘোড়া লাও, আমি ভোলকভের ওখানে যেতে চাই ..."

'আমার ওখানে?'

'আহা, বুঝতেই তো পারছেন ... কী করেই বা বলি ... লজ্জার কথাটা: আপনার কাছে নিশ্চয় গিয়েছে আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ? কিন্তু কী করেই বা বলি ভদ্রভাবে লোকে এও মনে করতে পারে যে সে ঠিক আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল না।'

কথাটা আরো পরিষ্কার করার জন্য ৎস্যুরিউপা আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচের নাকের কাছে হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিতেই ইঙ্গিতটা বুঝে তিনি ঈষৎ লাল হয়ে উঠলেন:

'চোপরাও গাধা কোথাকার!'

ৎস্যুরিউপার অবস্থা তখন এতদূর গড়িয়েছে যে সে কিছু গায়ে না মেখে আরো তাড়াতাড়ি বলে চলল:

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সত্যিই সে আপনার ওখানে গেল। ওরা সবাই, বুঝলেন কিনা, এদিকে এমন সব কুৎসিৎ ঠাট্টাইয়ার্কি জুড়ে দিল

যে শেষ পর্যন্ত আমি চেঁচিয়ে বলতে গেলে প্রায় হুকুম দিলাম,— নোংরামি ঢের হয়েছে, এবার বাড়ি চল। আমরা এদিকে আমাদের ঘোড়াগুলো ''মীলয়ে''তে ছেড়ে এসেছিলাম। তাই চলেছি এই জেমস্তভোর গাড়িতে। আমি বহুদিন থেকে বলে আসছি এই কুমার ছোকরাটিকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়। ও কি সত্যিকারের রাজকুমার? নাকি একটা ইহুদি?'

ৎস্যুরিউপার কথা কিন্তু আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচের কানে আর যাচ্ছিল না। ক্লাউজনিৎসা তাঁকে অপদস্থ করার ব্যাপারে একেই তিনি চটেছিলেন, তার ওপর এখন আবার একটা গণ্ডগোল। শেষাশেষি তিনি এতই আগুন হয়ে গেলেন যে একটা কথাও বেরোল না তাঁর মুখ দিয়ে। কেবল জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন মুখ হাঁ করে। ৎস্যুরিউপা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ভোলকভ্ বলে উঠলেন:

'কোথায় সেই বদমায়েসটা? এখনি ঘোড়া জোগাড় করে দাও আমাকে! ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলব।'

'বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা। আমরা এই ঘোড়ার গাড়ি করে আমার বাড়িতে যাব, সেখান থেকে একসঙ্গে ''মীলয়ে''তে গিয়ে রতীশ্চেভদের তুলে নেব। কুমার তার কাজের জবাবদিহি করুক।' ফিস্‌ফিস্ করে বলে সাপের মতো এঁকেবেঁকে ৎস্যুরিউপা ভোলকভের পিছনে পিছনে গাড়িটার দিকে ছুটল। তাকে ''জানোয়ার'' বলার শোধ সে নিয়েছে। ভারী খুসী সে।

২

দুপুরের খাওয়ার পর মদ খেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে ঘোড়ায় চড়ে সকলে ৎস্যুরিউপার বাড়ি থেকে ''মীলয়ে''র দিকে রওনা হলেন।

ভোলকভ সকলের সামনে, কনুই ছড়িয়ে দিয়ে একটা ঝাঁকড়াচুলওয়ালা

সাইবেরীয় ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। তাঁর ওজনের ভারে ঘোড়া বেচারা কাতরাচ্ছে। তাঁর পিছনে চলেছে রতীশ্চেভরা দুই ভাই। চাবুকের শব্দ করে চীৎকার করছে তারা :

'একেই তো বলে জীবন। এইরকমই তো চাই! চালাও জোরসে।'

রতীশ্চেভদের কোন তোয়াক্কা নেই তারা কার পক্ষে, কুমারের না ওর বিরুদ্ধে। তাদের কাছে দুইই সমান — শুধু বাতাস ছুটুক কানের পাশে সাঁই সাঁই করে। তাছাড়া ৎস্যুরিউপার প্ররোচনার পর তারা স্থির করেছে যে দুর্নীতির শাস্তি দিতেই হবে।

ৎস্যুরিউপা সকলের পিছনে। তার একটা দুমড়ে-পড়া প্রাণহীন ভাব, কিন্তু ভাল ছাঁটের জ্যাকেট, ব্রীচেস আর পট্টি পরে সে চলেছে একটা বিলাতী ঘোড়ায়।

তারা চলেছে উইলো ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে। ঘোড়াগুলোর খুরের তলা থেকে বালি ছিট্‌কে পড়ছে চারিধারে। যত "মীলয়ে"র কাছে এগিয়ে আসছে তত ভোলকভের একটা লাল্‌চে ভুরু ওপর দিকে উঠছে, অন্যটা নীচে নেমে আসছে প্রায় চোখের ওপর। থুত্‌নি এগিয়ে দিয়ে তিনি কেবল ভাবছেন কুমারকে কী কী রকমের নতুন ভীষণ শাস্তি দেওয়া যায়।

আলেক্সেই পেত্রভিচের বাকি রাতটুকু ভাল ঘুম হয়নি। জেগে উঠে ঠাণ্ডা জলে স্নান করে তোয়ালে দিয়ে বেশ করে গা মুছে তিনি ছোট গোল হলঘরে পিয়ানোর সামনে বসেছেন। ঘরের জানালাগুলোর ওপরের অর্ধেকে রঙীন শার্সি লাগানো।

পিয়ানোটা অনেকটা লায়ারের ছাঁচে, গোলাপী কাঠের তৈরী, জোরালো আর বেসুরো। একহাতে কুমার বাজাচ্ছেন একটা মুখস্থ সুর — "Chanson triste". রঙীন কাঁচের ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো এসে পার্কেট করা মেঝেটা আলোকিত করেছে, নক্সাকাটা মালাগুলো যেন আসল

ফুলের মনে হচ্ছে। নীল কাপড় আঁটা দেওয়ালে একঘেয়ে কতকগুলো ছবি টাঙানো। পিয়ানোর সামনে পাউডারমাখা, লাল ওয়েস্টকোট পরা এক বুড়োর ছবি, হাতে গুটানো কাগজ। পুরোনো সোফাগুলো, গোল টেবিল স্বরলিপির খাতার পোকাখাওয়া বাঁধা — এ সবকিছু জরাজীর্ণ, ছাতাপড়ার গন্ধ ছড়াচ্ছে। আলেক্সেই পেত্রোভিচ পিয়ানোর টুলটার ওপর বসেই ঘুরে ফিরলেন। ভাবলেন, "এরা সব এই বিচিত্র জানালাগুলো দিয়ে তাকিয়ে থেকেছে, ওয়ালজের সুর শুনেছে, সোফাগুলোর ওপরে শুয়েছে, প্রেম করেছে, লুকিয়ে এ ওকে চুমো খেয়েছে — ব্যস্, তারপর মরে গেছে। এই প্রিয় বাড়ি, এই আসবাবপত্র, এই সমস্ত স্মৃতির বোঝা এসে পড়েছে আমার ওপর। কেন? যাতে আমিও তাদের মতো মরে গিয়ে ছাই হয়ে যাই?"

পিয়ানোর ওপর আবার আঙুল চালিয়ে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। স্নানের পর যে শ্রান্তি অল্পক্ষণের জন্য চলে গিয়েছিল সেটা যেন আবার ফিরে এসে তাঁর কাঁধদুটোকে দুমড়ে দিল। ধীরে মৃদুস্বরে তিনি উচ্চারণ করলেন:

'প্রাণের কাতিয়া!'

চোখ বুজে গতকালের কাতিউশাকে দেখলেন — চাঁদের আলোর দিকে তার গাল ফেরানো, ঢালু কাঁধ নরম শালে ঢাকা। সেই কাঁধে মুখ লুকিয়ে তিনি যদি চিরশান্তি লাভ করতে পারতেন!

"আমি কি কাতিয়ার সঙ্গে থাকতে পারি না — শান্ত স্নেহশীল ভাই'এর মতো? কিন্তু সে কি ওই রকম ভালবাসা চায়? সে তো মনেপ্রাণে অনুভব করতে আরম্ভ করেছে যে সে নারী। এ অভিজ্ঞতা তার হওয়াই চাই। ক্ষণিকের এ অসহ্য পুলক সে অনুভব করুক। একদিন, এক সপ্তাহের জন্য যদি ওকে নিয়ে নিজেকে ভুলে থাকতে পারতাম। তারপর চলে যেতাম চিরকালের জন্য। বাকি জীবনভোর

বয়ে বেড়াতাম এই মধুর বিষাদ, এই স্মৃতি যে আমি এক অমূল্য রত্ন বুকে ধরেছিলাম, অতুল সুখের অধিকারী হয়ে নিজেই তা ত্যাগ করেছিলাম। এর চেয়ে বেশী ক্ষমতা কিসের? এর কাছে অন্য সবকিছু নগণ্য। যে বেদনা অশ্রু আনে তা কত মধুর! কী মনোরম! কাল সে দুহাত বাড়িয়ে কেমন আমার দিকে ছুটে এল। কেন আমি তাকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলাম না, হে ভগবান... আমি কিনা তাকে হীনতম কত কী বললাম! কেন? ও তো বুঝবে না... আমাকে নেবে না!"

আলেক্সেই পেত্রোভিচ মুখের ওপর হাত বুলিয়ে পিয়ানো ছেড়ে উঠে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন রৌদ্রে আতপ্ত সোফার ওপর, মাথার তলায় হাত রেখে। ঠিক সেই সময় দরজায় সাবধানে টোকা দিয়ে চাকর বলল খাবার তৈরী।

'দূর হয়ে যা!' বলে উঠলেন আলেক্সেই পেত্রোভিচ। কিন্তু চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে নীচে গেলেন সেই থামওয়ালা বড় ঘরে যেখানে খাবার সাজানো হয়েছে টেবিলে। বিনীত অপেক্ষমান ভাবলেশহীন চাকরের দিকে চকিতে তাকিয়ে ভ্রূ কোঁচকালেন (গতকাল মদ্যপানের ফলে গা বমি-বমি ভাবটা তখনও কাটেনি), তারপর পিছনদিকে হাত রেখে একটা ঠাণ্ডা থামের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। কাঁচের দরজা দিয়ে ফার গাছগুলো আর তার পিছনে প্রকাণ্ড সূর্যটাকে ডুবতে দেখা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে বুনো ঘুঘুর বিষণ্ণ মধুর ডাক। একটা এ্যাশ্ গাছের পাতা ডাঁটায় থর্‌থর্ করে কেঁপে স্থির হয়ে যাচ্ছে। এখানের সবকিছুই বহুকালের, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে, সবকিছুর পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

আলেক্সেই পেত্রোভিচ ভাবতে লাগলেন, "আমি নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলব। তাকে ভালোবাসব সারাজীবন ধরে। তাকে এত

ভালোবাসি যে সে-চিন্তায় আমার চোখ ফেটে জল আসে। প্রাণের প্রিয় কাতিয়া আমার ... সে আমায় সামলাবে। হে ভগবান, আর সকলের মতো আমিও যেন প্রেমে একনিষ্ঠ হই। এই অস্থিরতা, এই চিন্তাবিষ কেড়ে নাও, প্রভু। জীবনের শেষ পর্যন্ত তার পাশে যেন বসে থাকতে পাই, সবকিছু ভুলতে পারি ... কেবল যদি ভালোবাসতে পাই ... আমারও যে পবিত্র জিনিস আছে ... সাশাই জবাবদিহি করুক। ওকে যাতনা দিয়ে পরিত্যাগ করা চলে। ও নম্র, নিজে জ্বলে পুড়ে মরলেও শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমার শুভকামনা করে মরবে।"

আলেক্সেই পেত্রোভিচ ওয়েস্টকোটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, যেন হাত দিয়ে হৃৎস্পন্দন থামাতে চান। এত দ্রুত থেকে দ্রুততর সেটা যে যন্ত্রণা হচ্ছিল তাঁর। থামের গায়ে আরো চেপে ঠেস দিলেন তিনি। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল তাঁর কপালে। "খানিক ব্রোমাইড খেতে হবে," মনে মনে বলে একটা আরামকেদারায় গিয়ে অনড় হয়ে বসে পড়লেন জরাজীর্ণ হৃদয়ের হঠাৎ ব্যথায় দুর্বল হয়ে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির দরজার শব্দ হল দড়াম্ করে, শোনা গেল ভারী পায়ের আওয়াজ। ভীতচকিত চাকর ভারী ওকের দরজার দিকে ছুটে এল। সেটা সহসা খুলে যেতেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন ভোলকভ, তার পিছনে রতীশেচভরা আর ৎস্বরিউপা।

'দাও ওকে আমার হাতে!' চীৎকার করে উঠলেন ভোলকভ। তাঁর ড্যাবড্যাবে চোখ ঘুরছে। খাবার টেবিলে মারলেন এক লাথি, প্লেটগুলো ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। 'খাওয়া হচ্ছে আবার, কী আস্পর্ধা!' এই বলে বারান্দার দরজার দিকে একপা এগিয়ে দেখলেন দুই থামের মধ্যে কুমার চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'তোমার এই ব্যবহারের জন্য,

ভায়া, মারব তোমার মুখে ঘুঁষি।' নীচের চোয়াল তাঁর ঠেলে বেরিয়ে এল।

'ঠিক বলেছেন!' চেঁচিয়ে উঠল রতীশেচভরা।

ৎস্বরিউপা দরজায় দাঁড়িয়ে বারবার বলতে লাগল:

'মশায়গণ, মশায়গণ, আর একটু শান্ত হোন।'

কুমারের মুখ কালি হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন কাতিয়া তার বাবাকে সব বলে দিয়েছে। এখন ক্ষতবিক্ষত তাঁকে আরো অপমান সইতে হবে। আবার চাবুক উঠবে সপাং করে, আবার তাঁকে বালিশ কামড়ে শুয়ে থাকতে হবে...

কিন্তু কুমারের দৃষ্টির সামনে ভোলকভ হঠাৎ নরম হয়ে গেলেন, যেন নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জা পেয়ে গেছেন। সে-দৃষ্টি দেখা যায় আহত কুকুরের চোখে, যখন চাকর দড়ি নিয়ে তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাকে মারতে আসে। তখন নিজেকে রক্ষা করার তার একমাত্র উপায় হ'ল এই দৃষ্টি। এমন লোক আছে যাদের তখন হাত ওঠে না ফাঁস লাগাতে, ফিরে চলে গিয়ে দূর থেকে ছোঁড়ে পাথর।

ভোলকভেরও তাই হ'ল। হঠাৎ হটে গিয়ে ভুরু নামিয়ে তিনি বিড়্ বিড়্ করে বললেন:

'হাঁ করে দেখছ কী? বড় বংশের ছেলে হলেও তুমি অমন কাজ করতে পার না, ভায়া। ভুলে যেও না আমি মেয়ের বাপ। মদ খাও যত ইচ্ছা, কিন্তু আমার মেয়েকে বেইজ্জৎ করার স্পর্ধা করো না!'

এই কথা বলতে বলতে আবার রেগে ফুঁসে উঠে এক পা এগিয়ে চীৎকার করলেন তিনি:

'না, না, মেরে খুন করব তোমায়, আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছি না।'

'কী করেছি আমি?' শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলেন আলেক্সেই পেত্রোভিচ। বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু একটা তীক্ষ্ণ আনন্দের শিহরণ খেলে যাচ্ছে তাঁর শরীরে, সবচেয়ে ভয়ানক যা কেটে গিয়েছে।

'কী বললে? সাশার সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করে তুমি সকলের সামনে বাহাদুরি করে বলেছ যে আমার বাড়িতে আসছ রাত দুপুরে। আর আমি তোমায় চোখেও দেখলাম না। সারা জেলার সামনে আমার মুখে চূর্ণকালি দিয়েছ।'

আলেক্সেই পেত্রোভিচ অল্প না হেসে পারলেন না। চট্ করে উঠে অবাক হয়ে যাওয়া ভোলকভের হাত ধরে, "আসুন, মশায়" বলে তাঁকে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে ঘাম আর ঘোড়ার গায়ের গন্ধে ভরা তাঁর কাঁধের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন:

'আমি কাতিয়াকে ভালোবাসি। আমাকে সে বিয়ে করুক। আমি আর আগের মতো নেই, মশায়... সে সব আমার ফুরিয়েছে...'

তাঁর গলা বুজে এল। ভোলকভের মাথা উত্তেজনার চোটে কাঁপতে লাগল।

'বেশ, বেশ। বুঝলাম। তাহলে তুমি এদিকে ফিরে দাঁড়িয়েছ? আরে এ তো একেবারে অন্য কথা। আমি নিজেও চেয়েছিলাম... কিন্তু তোমার, বাপু সবই তড়িঘড়ি। মোটে তর সয় না, বাপু, তোমার।' কপাল ঘষে হতাশার গলায় বললেন, 'বাগানে ঝোপগুলোর ধারে আমি একটু পায়চারি করি। এটা হ'ল একটা গুরুতর ব্যাপার। ভয় পেয়ো না, আমি শুধু একটু ধাতস্থ হয়ে নিতে চাই...'

ভোলকভ ভারী পা ফেলে বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। কুমার ঘরের মধ্যে ফিরে গিয়ে শুকনো হাত শক্ত মুঠো করে দাঁতে দাঁত ঘষে ৎস্যুরিউপা আর রতীশ্চেভদের বললেন:

'বেরিয়ে যাও এখান থেকে।'

কোন একটা কিছুতে মন বসলে ভাবনা কিম্বা ইতস্তত করাটা ভোলকভ মোটে পছন্দ করতেন না। তাই ঝোপঝাড়ের মধ্যে কিছুক্ষণ বসে থেকে কুমারের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন সেই দিন সন্ধ্যায়ই সব ঠিকঠাক করে ফেলতে হবে। নিজে আস্তাবলে গিয়ে সহিসগুলোকে অনেকক্ষণ ধরে বাপান্ত করলেন, এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁর চোখে ধরা পড়ল তাদের অনেক অবহেলার চিহ্ন। ঘোড়া রাখার প্রত্যেকটা জায়গা, গাড়ি রাখার প্রতি ঘর ভাল করে দেখে বারান্দায় যেখানে কুমার দাঁড়িয়েছিলেন সেই দিকে আসতে আসতে হেঁকে বললেন:

'কিছু মনে করো না বাপু, জমিদারী চালাতে জান না তুমি। আস্তাবলগুলোর ঐ অবস্থা করে রাখা। দেখে নিও, আমি শীগগির সব ঠিকঠাক করে দেব তোমার।'

কুমার শুধু একটু মুচকি হাসলেন। না হেসে তিনি পারলেন না, যদিও সে-হাসিতে তাঁর ভয়, তাঁর মনে হচ্ছিল তাঁর কপালে কোন সুখ নেই। তাই ভোলকভ যখন সবচেয়ে ভাল গাড়িটা বেছে তাতে তিনটে কালো ঘোড়া যুতে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে লাগলেন, তখন তিনি এমন অদ্ভুত ব্যবহার আরম্ভ করলেন যে মাঝপথে ভোলকভ তাঁর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলে উঠলেন:

'তুমি এমন করছ কেন? আমি বলছি, ব্যস্ত হও না — কাতিয়া তোমাকে বাতিল করবে না।'

কিন্তু যখন তাঁরা সূর্যাস্তের সময় ভোলকভোতে পেঁীছলেন তখন একটা অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা অপেক্ষা করছিল তাঁদের জন্য। তার ফলে ব্যাপারটা বেশী তাড়াতাড়ি গড়িয়ে গেল, এবং তার নিদারুণ ফল ফলল শুধু কুমার আর কাতিউশার ওপরে নয়, ডাক্তার গ্রিগোরী ইভানভিচ জাবোতকিনের ওপরেও, সে বেচারী এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে উড়ে এসে পড়েছিল আগুনের মধ্যে পতঙ্গের মতো।

৩

সেইদিন সকালে গ্রিগোরী ইভানোভিচকে আনতে গাড়ি পাঠানো হয়েছিল।

ঘরের সমস্ত দরজা জানালা খুলে তিনি নোংরা ঘরটা সাবান আর গরমজল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে লেগেছিলেন। সবখানটায় পরিষ্কার কাগজ আর স্টোভের তলা থেকে টেনে বার করা কতকগুলো অতি আজেবাজে বই পেতে, হাতে ন্যাকড়া নিয়ে কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে জানালা দিয়ে রোদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। রোদে মেঝে আর বেঞ্চগুলো খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাচ্ছিল।

"পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আমি কত ভালবাসি," ভাবছিলেন তিনি। "এতে মানুষের অন্তর নির্মল আর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে। কী চমৎকার দিন আজ! জলে হাঁস, আকাশে মেঘ। আনন্দ, কী আনন্দ!"

ফাদার ভাসীলী অন্নের জন্য উঁকি মেরে এতই অবাক হয়ে গেলেন যে চিন্তান্বিত স্বরে প্রশ্ন করলেন, "তুমি বেশ ভাল আছ তো, গ্রীশা?" জবারের প্রথম কথা থেকেই কী ঘটেছে বুঝতে পেরে, পাছে এই ক্ষণস্থায়ী (তাঁর তাই ধারণা) আনন্দের ব্যাঘাত হয় এই ভয়ে একটু হেসে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন — গ্রিগোরী ইভানভিচ লক্ষ্যও করলেন না কখন তিনি চলে গেলেন।

তাঁর মনে মনে ধারণা সেদিন তাঁর কপালে সুখ আসবেই। যদি তা না হয়? না, না হয়ে পারে না।

একঘণ্টা বাজার পর দুই কালো ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি এসে ডাক্তারের দরজায় দাঁড়াল। অবাক হয়ে গ্রিগোরী ইভানভিচ ছেঁড়া ন্যাকড়া হাতে নিয়েই জানালার বাইরে মুখ বাড়ালেন। কোচওয়ান গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে জানালার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল:

'আরে ঐ ঝাঁকড়াচুলো, ডাক্তার বাড়ি আছেন না বেরিয়ে গেছেন?' ঘরের ভিতরে নজর করে গ্রিগোরী ইভানভিচের দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে ফের বলল, 'দয়া করে জল্‌দি ডাক্তারকে ডাকো — আমাদের দিদিমণির অসুখ। তাঁকে বলো ভোলকভোতে, আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচের ওখানে যেতে হবে।'

গ্রিগোরী ইভানভিচ তৎক্ষণাৎ জানালা থেকে সরে এলেন। ছেঁড়া ন্যাকড়া হাত থেকে পড়ে গেল। বুকের স্পন্দন হঠাৎ অসহ্য হ'ল তাঁর, নিঃশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে। মনে পড়ল একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভ্‌নাকে, যেমন অবস্থায় তাকে দেখেছিলেন — ভিজে স্কার্ট তুলে ধরে পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, তার ঝক্‌ঝকে চুল, নিটোল কাঁধ, রেশমী পোষাক পরা লম্বা চেহারা ...

"ধরো যদি টাইফস্‌ হয়ে থাকে?" মনে হল তাঁর। "না, না, তা হতে পারে না।"

আবার জানালার কাছে ছুটে এসে চেঁচিয়ে বললেন:

'আরে এই, আমি ডাক্তার। একমিনিটে আসছি।'

টুপিটা হাতে নেওয়া হয়ে গেছে, এমন সময় দুই জানালার মাঝখানে পেরেক দিয়ে আটকানো আয়নার টুকরোটার দিকে নজর পড়তে চোখে পড়ল পাতলা দাড়িভর্তি চওড়া লাল মুখটা, কাঁধ পর্যন্ত বেয়ে আসা খড়ো রঙের চুল। এক পা পিছিয়ে গ্রিগোরী ইভানভিচ নিজের মনেই বললেন:

'কি বিশ্রী! "ঝাঁকড়াচুলোই" বটে। না, যেতে পারব না।'

তাড়াতাড়ি বেঞ্চে বসলেন, কপালে পড়ল রেখা। তখনি আবার লাফিয়ে উঠে একটা কাঁচি নিয়ে চুলের বোঝায় কাঁচি চালিয়ে কানের পাশের চুল কেটে দিলেন, গোছা হয়ে মাটিতে পড়ল চুল। পা দিয়ে সেটা চেপে মুখ একদিকে বেঁকিয়ে আরো কাঁচি চালিয়ে চললেন

দুপাশে। তখন টের পাচ্ছিলেন যে মাথার পিছনদিকে কাঁচি চালাতে পারবেন না, এক কথায়, তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ঘোড়ার সাজের ঘণ্টা বাজতে লাগল বাইরে, কোচওয়ান ইচ্ছা করেই সশব্দে হাই তুলতে লাগল। গ্রিগোরী ইভানভিচ এদিকে ঘেমে নেয়ে হাঁটু একটু মুড়ে ঘাড় কাত করে মাথার পিছনদিকের চুল কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ্ করে কেটে ফেললেন। তারপর কাঁচি ছুড়ে ফেলে মাথা ধুতে গিয়ে দেখলেন পাত্রে জল নেই। কোটটা কোথায় তাও খুঁজে পাচ্ছেন না। কোচওয়ান জানালার খড়খড়িতে চাবুক দিয়ে ঠুকে জিজ্ঞেস করল কত দেরী হবে। জাবোতকিন শুধু মেঝেতে পা ঠুকলেন—এরকম কখনও ঘটেনি তাঁর—যেন স্বপ্নের ঘোরে ছুটে পালান উচিত অথচ পা নড়তে চায় না, যেন আঘাত করতে চাইছেন কিন্তু হাত উঠছে না।

অবশেষে একলাফে গাড়িতে উঠে তিনি হুকুম করলেন:

'প্রাণপণে চালাও।' সারাপথটা নিজের চেহারাটা একটু দুরস্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন, রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন, সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে হাল ছাড়লেন। অবশেষে পুকুর, বাগান, ভোলকভোর ছাত যখন নজরে এল তখন তাঁর ইচ্ছা হ'ল গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়তে। সেদিন তার যা কিছু ঘটেছে সবই যেন স্বপ্নের মতো।

কন্দ্রাতী অলিন্দে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। গ্রিগোরী ইভানভিচ সেই সব পুরোনো ঘরের বাসি গন্ধ নাকে যেতেই পা টিপে টিপে হাঁটতে লাগলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন এখানে তাঁকে সুষ্ঠুভাবে কথা বলতে হবে, মার্জিত হাবভাব দেখাতে হবে, কারণ এই ঘরের মেঝের এমন একটি তক্তা নেই যার ওপর একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনার পা অন্তত একবার পড়েনি, প্রতিটি জানালার ধারে সে দাঁড়িয়েছে। এ তো সাধারণ বাড়ি নয়, এ একটা বিস্ময়।

একটা কার্পেটঢাকা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কন্দ্রাতী বলল: 'এই দিকে।' তারপর ঠোঁট চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আর শুনুন, ওকে একগাদা ওষুধের গুঁড়োটুঁড়ো খাওয়াবেন না।'

সে কার্পেট টেনে দরজা খুলতেই গ্রিগোরী ইভানভিচ "দাঁড়াও, দাঁড়াও, ঠিক আছে", বলে কোটটা টেনেটুনে সোজা করে মুখের ওপর হাতটা একবার বুলিয়ে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। তাঁর দৃষ্টি চারিদিক ঘুরে নিমেষে থামল বালিশগুলোর ওপর, যেখানে দরজার দিকে পিছন ফেরা মেয়েটির মাথা দেখা যাচ্ছে। মাঝখানে ভাগ করা দুই বেণী ঘাড়ের চারপাশে, কনুই অবধি খোলা একখানি হাত পড়ে আছে নীল লেপের ওপর।

গ্রিগোরী ইভানভিচ প্রথমটা চোখ দুটো সজোরে বুজে পরে তাকালেন কার্পেটের ওপর লাল চটি জোড়ার উপর। তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হল তিনি একটা হাতুড়ে মাত্র, নোংরা কাপড়ের পুঁটলি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু আবার সেই মুহূর্তেই ভুলে গেলেন এ সব চিন্তা।

কাতিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে পাশ ফিরল। ভয়ে গ্রিগোরী ইভানভিচ পিছিয়ে এলেন। প্রথমে চোখ মিট্‌মিট্‌ করে, পরে সম্পূর্ণ জেগে উঠে কাতিয়া অবাক হয়ে তাকাল ঘরের মধ্যে উপস্থিত এই আগন্তুকের দিকে। তারপরই চোখের পাতা নামিয়ে নিল, মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

'ওঃ, আপনি, ডাক্তারবাবু,' বলল সে। 'নমস্কার। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য মাপ করবেন... কিন্তু বাবা...'

গ্রিগোরী ইভানভিচ জোর করে বিছানার কাছে এগিয়ে গেলেন। কাতিয়া তার একখানা হাত বাড়িয়ে দিল। হাতখানা তখনও ঘুমের পর গরম। ডাক্তারের মুখ টক্‌টকে লাল হয়ে উঠল, তিনি তার হাত টিপে পরে নিজেকে সংযত করে ঘড়ি বার করলেন। কিন্তু ঘড়ির

কাঁটা দেখতে পেলেন না। তাই পায়ে তাল দিয়ে সেকেণ্ড গুণতে চেষ্টা করলেন। তাও গোলমাল হয়ে গেল, নিজের স্থৈর্য হারালেন তিনি। কাতিয়ার হাত ছেড়ে দিলেন, ঘড়িটাও পড়ে গেল তাঁর হাত থেকে। কাতিয়া আস্তে মুখ ঢাকল হাত দিয়ে, কাঁধ দুটো শিউরে উঠল তার — আর নিজেকে সম্বরণ করতে না পেরে সে হেসে উঠল।

জোর বরফের মধ্যে যেন এমন ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন ডাক্তার স্রাবোতকিন, এমনকি বমি-বমি একটা ভাব এল, বোকার মতো হাসিতে ঠোঁটদুটো বেঁকে উঠল — গোল্লায় যাক! অবশেষে হাসিতে সজল চোখে কাতিয়া কথা বলল তাঁর সঙ্গে:

'আমার ওপর রাগ করবেন না, ডাক্তারবাবু, কিন্তু দোহাই বলুন তো আপনার চুলগুলোর কী হয়েছে?' এই বলে আবার সে খোলাখুলিভাবে হো হো করে হাসতে লাগল।

মরিয়া হয়ে ডাক্তার আয়নায় তাকাতেই নিজের অদ্ভুত চেহারা দেখতে পেলেন। মাথায় খাব্‌লা খাব্‌লা চুল কাটা — যেখানে তিনি কাঁচি চলিয়েছেন, — যেন লাইন কেটে, কোথাও চুল আছে, আর পিছনদিকে একেবারে ছোটো বেণী একটা ...

'অন্ধকারে কেটেছি কিনা,' কোনরকমে বললেন তিনি। 'আমার চিরকালের অভ্যেস ...' এই পর্যন্ত বলেই নিজেকে আর সামলাতে না পেরে হটতে হটতে তারপর ছিট্‌কে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

## ৪

কন্দ্রাতী দরজার বাইরে প্রবেশপথে অপেক্ষা করছিল।

'ওহে শোনো!' গ্রিগোরী ইভানোভিচ হতাশার সঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন কন্দ্রাতীকে, 'দৌড়ে গিয়ে ঘোড়া ঠিক করতে বলো। এক্ষণি আমি চলে যাব, আর সহ্য হচ্ছে না।'

কন্দ্রাতী কড়াস্বরে বলল:

'অমন জেদ করবেন না। আপনি এখন নিজের বাড়িতে নেই। আসুন আমার সঙ্গে।'

'আচ্ছা,' বলে গ্রিগোরী ইভানভিচ বাধ্য হয়ে চললেন কন্দ্রাতীর পিছনে পিছনে প্রবেশপথ ধরে সিঁড়ির তলায় ছোট একটা ঘরে, সেখানে বনাত ঢাকা একটা সিন্দুকের ওপর বসে পড়লেন।

একটু থেমে দরজার ফ্রেমে হেলান দিয়ে কন্দ্রাতী বলল:

'আমার নাম কন্দ্রাতী ইভানভিচ—"ওহে শোনো" নয়, বুঝলেন? আপনি কী করতে এখানে এসেছেন? দিদিমণিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে? আপনি কি নিজের চুল ইচ্ছে করে ঐ রকম করে কেটেছেন, না জানেন না বলে?'

চেঁচিয়ে বলে উঠলেন ডাক্তার:

'কন্দ্রাতী ইভানভিচ, চুপ করুন। আমি নিজেই বেশ বুঝতে পাচ্ছি।'

'ডাক্তারসাহেব, আমার কথা শুনুন, বাড়াবাড়ি করবেন না। আর যাই হোক, ঘোড়া আপনাকে দেব না। যখন শিশু ছিল তখন কাতিউশাকে আমি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি। যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ওর ওপর হাত পাকাতে দেব না কাউকে। মিষ্টি কথা বলে ওর অসুখ সারাতে হবে, ওষুধের গুঁড়ো খাইয়ে নয়—ওর রোগ সেয়ানাবয়সের মেয়ের রোগ, বুঝেছেন? বেশ। আপনার বোকা বোকা চেহারা নিয়ে ওকে আপনি হাসিয়েছেন—এ খুব ভাল কথা। আমিও ছোকরা ছিলাম এককালে, হাসিতামাসা ভালবাসতাম। কর্তা যখন বহালতবিয়তে বাড়িময় কর্তামি করে বেড়ান তখন সব কিছু ঠিক মতো চলে, চাকরবাকররাও যে যার কর্তব্য কাজ করে যায়। আসুন, আপনার চেহারাটা একটু দুরস্ত করে দিই। ঐ মূর্তি নিয়ে ফের ওর কাছে যাওয়া হবে ধাষ্টামো, রঙ্গ নয়।'

কন্দ্রাতী একটা কাঁচি তুলে নিল। গ্রিগোরী ইভানভিচ শান্তশিষ্টভাবে মাথা পেতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

'কন্দ্রাতী ইভানভিচ, সত্যিই আপনি ওঁকে কোলেপিঠে করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, কোলেপিঠে করেছিলাম,' বলেই হঠাৎ কাঁচি নামিয়ে কী যেন শুনল কান পেতে। কে যেন প্রবেশপথে হাঁটতে হাঁটতে দরজার হাতলগুলো ঘুরিয়ে হয় কাশছিল নয় নীচু গলায় কাঁদছিল।

'কোন বাইরের লোক মনে হচ্ছে, নয়?' বলল কন্দ্রাতী।

শব্দটা থেমে যেতে বুড়ো ব্যস্তমুখে বেরিয়ে গেল।

অল্প পরেই তার গলার আওয়াজ ডাক্তারের কানে এল, "না, না, কখখনো না, যাও এখান থেকে।" তারপরেই আর একটা গলার আওয়াজ, একজন মেয়ের। সে যেন অনুনয় করে তাড়াতাড়ি কী কথা বলছে। কিন্তু গ্রিগোরী ইভানভিচের তাতে কিছুই আসে যায় না। হাতমুখ ধুয়ে চুলটা ঠিক করে নিয়ে ফ্রককোটটা ঝেড়েঝুড়ে তিনি ভাবলেন মনে মনে, "অবশ্যই আমি দেখতে সুপুরুষ নই, বরং একটু কুচ্ছিৎ আসলে, কিন্তু মুখে আমার একটা যৌবনের ছাপ আর বিশেষ করে চোখে আছে ভাষা।" চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বাইরে বাগানে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন যতক্ষণ না রোগী দেখতে তাঁর ডাক পড়ে।

বাগানে এসে পড়ে তিনি বাড়ির কোণটা ঘুরে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে একটা লোহার বেঞ্চের ওপর বসলেন। কাছেই দাঁড় করানো একটা সবুজ ঝারির ওপর রাখলেন তাঁর হাত একটা।

পায়ের চারিপাশে ঘাসের ওপর মৌমাছিরা গুন্‌গুন্ করছে, বাতাসে মিষ্টি ঘাসের গন্ধ, এ সব আর গাছের পাতাগুলোর ফাঁক দিয়ে চূণকাম করা বাড়ির দেওয়ালে, পর্দাটানা কাতিয়ার জানালায় (পর্দা থেকে তিনি আন্দাজ করলেন সেটা কাতিয়ার ঘরের জানালা)

আলো ফেলা উষ্ণ অস্তগামী সূর্য সঙ্গীতের মূর্ছনার মতো তাঁকে দোলা দিল। গ্রিগোরী ইভানভিচ চোখ বুজে রৌদ্রের দিকে পিঠ করে বসলেন। তাঁর মনে হল সমস্ত শরীরে যেন জোর নেই (আর কিসের দরকার এই নিজের জোরের?): তিনি যেন এই আলো, এই নিস্তব্ধতা, এই সমস্ত কিছুর মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছেন। আকাশ, আকাশের মেঘ, জল, গাছপালা, মাঠ—সব যেন তাঁর মধ্যে মিশে গেছে। অথবা নাকি তিনিই গলে যাচ্ছেন নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে—আকাশকে দিয়ে চোখ, মেঘকে—অন্তর, জলে ঢেলে দিয়ে রক্ত, গাছকে সমর্পণ করে হাত আর মাটিকে দিয়ে দেহ? এ অনুভূতি ঠিক যেন মৃত্যুর, স্বপ্নের অথবা প্রেমের। ভাবলেন তিনি, "কাটুক আমার সারাজীবন দুর্গন্ধময় কুঁড়েঘরের আশেপাশে, আমি দেখতে কুৎসিৎ এবং ওর জন্য প্রাণ দিতে অক্ষম—এও থাক, কিন্তু না, ও যদি বলে তাহলে আমি অনায়াসে মরতে পারি। কী চাই আমি? কিছু না। আমি শুধু চাই বাঁচতে, অনুভব করতে, বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে..."

ঠিক এই সময়ে কুমার আলেক্সেই পেত্রোভিচকে দেখা গেল বারান্দায় থামগুলোর মাঝে, যেগুলোর জায়গায় জায়গায় চূণবালি খসে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। তাঁর পরনে কালো ফ্রককোট আর ডোরাদার পেণ্টুলেন ডানহাতের ছড়ির ওপর ভর দিয়ে, দস্তানা ধরে বাঁ হাত দিয়ে একটা মৌমাছি সভয়ে তাড়াচ্ছেন। উড়ে গেল মৌমাছিটা। কুমার দ্রুত নেমে এলেন বাগানের মধ্যে। জাবোতকিনকে তিনি দেখতেই পেলেন না এবং অস্বাভাবিক উত্তেজনার সঙ্গে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে পর্দাটানা জানালাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'এ অসম্ভব, অতিশয় বাড়াবাড়ি।' মুখ দিয়ে বেরোল তাঁর। ছড়িটা একবার সজোরে হাওয়ায় চালালেন তিনি। তারপর ফিরে গ্রিগোরী ইভানভিচকে দেখে নীচের ঠোঁট বাড়িয়ে দিলেন।

ডাক্তারও কুমারের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, "এ আবার কে?"

আলেক্সেই পেত্রোভিচ প্রশ্ন করলেন:

'আপনিই কি ডাক্তার? একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনার কাছে এখন কে আছেন? আপনি জানেন কিছু?'

'কিন্তু হয়েছে কী? কোন বিপদ নাকি?'

'না, কিন্তু আমি তো কিছু জানি না,' বলে আলেক্সেই পেত্রোভিচ বেঞ্চে বসে পড়ে গ্রিগোরী ইভানভিচের হাত ছুঁয়ে খুব নরম সুরে আরম্ভ করলেন, 'পাদ্রী আর ডাক্তারদের কাছে কেউ কিছু লুকোয় না, কী বলেন? বলুন তো, এমন কোন ওষুধ আছে যাতে হৃদয়ের ব্যথাটা কমে, যাতে তার অস্থিরতা সামলাতে পারি?'

গ্রিগোরী ইভানভিচ বললেন:

'ব্রোমাইড।'

'তা ঠিক, কিন্তু আমি তা বলছি না। মনে করুন, যেন একজন কয়েদীর সামনে জেলের ফটক খোলা হল, দরজায় দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেল সূর্যকে আর সেই মুহূর্তে তাকে কেউ বলল, "তোমার পুরোনো পাপের কথা আমাদের মনে পড়েছে, তুমি ফিরে যাও ..." — "কিন্তু আমি তো শুধরেছি ..." — "না, তুমি ফিরে যাও ..."। ডাক্তার, একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনার স্বামীর হওয়া উচিত মুক্ত নিষ্পাপ — নয় কি?'

'আপনি কি ওঁকে বিয়ে করবেন?' প্রশ্ন করলেন গ্রিগোরী ইভানভিচ, কুমারের টক্‌টকে লাল ঠোঁট আর অস্থির চোখের দিকে ভাল করে চেয়ে। "কী সাদা ধবধবে হাত!" ভাবলেন তিনি, হঠাৎ তাঁর মন ভরে উঠল অপরিসীম বিষণ্ণতায়।

কুমার বলে চললেন:

'আমি নিজের শত্রু নই, ওও যেন বিশ্বাস করে যে আমি ওরও শত্রু নই। আমার যন্ত্রণা ওর চেয়ে বেশী। আমি ফুর্তি করবার জন্য

কলিভানে যাইনি... আরে, আপনি এসব কিছু জানেন না... আমি এসেছিলাম ওর পাণিপ্রার্থী হয়ে... ডাক্তার, যদি বিপদ কিছু ঘটে, আপনি সাহায্য করবেন? আমি জানি ঐ জানালার ওধারে আমার নামে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে এই মুহূর্তে।'

দম নেবার জন্য থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা ডাক্তারের চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি করুণ হাসি হাসলেন।

'একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা যে কোন লোকের কৃচ্ছ্র সাধনার যোগ্য,' বললেন গ্রিগোরী ইভানভিচ। কেন বললেন তা নিজেই জানেন না। অপ্রতিভ হয়ে ঝারিটা নোয়াতে লাগলেন তিনি। সেটার নল দিয়ে হুড়হুড় করে জল বেরিয়ে পড়ল। সেই মুহূর্তে কাতিয়ার জানালা থেকে একটা চীৎকার আর সেটাকে ডুবিয়ে একটা মোটা ভারী গলার আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন ছুটে এল খোলা জানালা পর্যন্ত, পর্দাগুলো কেঁপে উঠল আর একটি মেয়ের খালি মাথা ঘরের ভিতর থেকে জানালার ধারিতে হেলে পড়ল। কে যেন লোমশ আঙুল দিয়ে তার গলা টিপে ধরেছে, মেয়েটির খালি হাত তা ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে।

তারপর শোনা গেল আর একটি মেয়ের মরিয়া চীৎকার, শুনে জাবোতৃকিনের গা হিম হয়ে গেল, কুমার ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে যন্ত্রণাকাতর স্বরে বারবার বলতে লাগলেন, "ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ওর গায়ে হাত দিও না..." লোমশ আঙুলগুলো গলা থেকে আলগা হয়ে যেতে মেয়েটির মাথা জানালার ধারি থেকে পিছলে পড়ে গেল। গ্রিগোরী ইভানভিচ ওঠবার চেষ্টা করতেই কুমার পড়লেন তাঁর হাঁটুর ওপর, অবশ আঙুল দিয়ে তাঁকে আঁকড়ে ধরলেন, তাঁর মাথাটা পড়ল এলিয়ে।

'কিছু হয়নি, পিছনে ঠেস দিন, এই ঠিক হয়েছে, শীগ্গির এভাবটা কেটে যাবে,' বিড়বিড় করে বলে গ্রিগোরী ইভানভিচ ঝারি থেকে জল নিয়ে কুমারের কপাল ভিজিয়ে দিতে লাগলেন।

# আবর্ত

১

গ্রিগোরী ইভানভিচ কুমারকে ধরে ধরে বারান্দা দিয়ে হলে নিয়ে এসে তাঁকে আরামে শুইয়ে দেবার একটা জায়গার জন্য চারিদিকে তাকালেন। ডানদিকের দরজাটা দিয়ে লাইব্রেরিতে যাওয়া যায়। "এখানে," বলে কুমার তাঁর হাত চেপে ধরলেন। ঠিক সেই সময় অনেকে গলার আওয়াজ, চীৎকার আর পা ঠোকার শব্দ এল বাড়ির মধ্যে কোথা থেকে।

কুমার আর জাবোতকিন লাইব্রেরি ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই প্রবেশপথের দরজাটা দড়াম্ করে খুলে গেল। আধো-আলোতে দেখা গেল সহিস আর কোচওয়ান সাশার কনুই ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার কালো সারাফান ছিঁড়ে গেছে, চুল এলোমেলো, ভ্রূজোড়া ওপরে উঠে গেছে, অশ্রুসিক্ত মুখ পিছনে হেলান। মৃদু হতাশাভরা স্বরে সে বলে চলেছে:

'কী করছ তোমরা? কী করছ?'

কন্দ্রাতী তাকে পিছনে থেকে ধাক্কা দিতে দিতে চলেছে। ভোলকভ দরজায় ঘুঁষি মেরে গালাগালি দিয়ে চীৎকার করলেন:

'গোলাঘরে বন্ধ করে রাখো হারামজাদীকে।...'—কুমার আর জাবোতকিনের দিকে তাঁর চোখ পড়ল না, তারা ততক্ষণে লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়েছে।

সাশাকে টেনে নিয়ে বার হয়ে গেল তারা। ভোলকভ বারান্দার দরজা সশব্দে বন্ধ করে আবার গালিগালাজ করতে করতে বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন।

গ্রিগোরী ইভানভিচ আর কুমার অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন বই'এর আলমারির পাশে সোফার ওপর। ডাক্তারের পা কাঁপছে, কুমার নিশ্চলভাবে বসে আছেন সোফায় মাথা ঠেস দিয়ে দুচোখ বুজে।

কুমারের সুন্দর মুখ অন্ধকারে প্রায় দেখা যাচ্ছে না। তার দিকে তাকিয়ে অবশেষে ডাক্তার চুপিচুপি বললেন:

'ওকে নিয়ে ওরা অমন করছে কেন?' ভাবলেন তিনি, "এমনি করেই ভালোবাসতে হয়, মধুরভাবে সকল শক্তি দিয়ে, অসাধারণ ভাবাবেগ অনুভব করতে, জ্ঞানহারা হয়ে যেতে হয়! একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনার ইনিই হবেন উপযুক্ত স্বামী। এঁদের মতো মানুষ নিয়েই বই লেখা হয়।" সাবধানে হাত বাড়িয়ে তিনি কুমারের হাতে হাত বুলোলেন।

'ডাক্তার, আপনি আমার পাশে থাকবেন?' তৎক্ষণাৎ মৃদুকণ্ঠে বললেন আলেক্সেই পেত্রোভিচ।

গ্রিগোরী ইভানভিচ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

'ওকে কি নিয়ে গেছে ওরা?' জিজ্ঞেস করলেন কুমার। 'কী ভয়ানক! জীবন অত সহজ নয়, ডাক্তার বাবু। আহা, বেচারী সাশা!'

আলেক্সেই পেত্রোভিচ যেন মুখোস খুলে ফেলে হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠে বসলেন।

'কোনটা ভদ্র, কোনটা সৎ আমি জানি, তবু অভদ্র আর অসৎ কাজ করি। আর যে কাজ যত বেশী ঘৃণ্য তত যেন বেশী ভাল লাগে আমার... এতে পাগল হয়ে যাওয়া সম্ভব। তবে অন্যে আমাকে যে চোখে দেখে সেই চোখ দিয়ে বাইরে থেকে দেখার চেয়ে ভাল আর

কী হতে পারে? একটা পাপিষ্ঠ ধূসর টুপি আর দস্তানা পরে সেজে-গুজে গাড়িতে বসে চলেছে, কেউ তার চোখেমুখে মারে না এক ঘা, সবাই তাকে খাতির করে, সে নিজেও নিজের ওপর খুব খুসী। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করলে দম আটকে আসে। এটা কি অদ্ভুত নয় যে এখান থেকে রাত্রে একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি চলেছি, আকাশে তাকিয়ে দেখি চাঁদ (চাঁদ থাকা চাইই), সুখের আবেশে মৃদুমন্দ হাসছি—এত মৃদু যাতে সে-হাসি কোচওয়ান পর্যন্ত শুনতে না পায়। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে নিজের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি যে কুৎসিত কিছু করা কত কদর্য। আমার হাতে এখনও লেগে রয়েছে তার পুষ্পসারের সৌরভ। সেই ভাবাবেগে যখন গলা একেবারে বুজে যায় তখন সাশার দরজায় গাড়ি থামিয়ে তার ঘরে ঢুকে তার হাত ধরে তার বুকে মাথা রেখে ছলনা করে বলি, "প্রাণের সাশা আমার, আমাকে সান্ত্বনা দাও"। সে যেমন জানে সেই উপায়েই আমাকে সান্ত্বনা দেয়। সান্ত্বনা পেয়ে তাকে বলি কেন এসেছি—এইটেই হল আরো বেশী কুৎসিত। আবার তাকে মিথ্যা কথা বলি, আর বেচারীর বুক ভেঙে যায়... আকুল থেকে আকুলতর হয়ে ওঠে সে, অবশেষে মনের বাঁধন ছিঁড়ে যায়—যেমন এইমাত্র হল।'

'কিন্তু শুনুন, এসব যে অতি জঘন্য কথা, আপনার নিশ্চয় মাথার ঠিক নেই,' চুপিচুপি বলে গ্রিগোরী ইভানভিচ তাঁর কাছ থেকে তফাতে সরে গেলেন। সবকিছু বুঝতে না পারলেও তিনি টের পাচ্ছিলেন যে কুমার পিছলিয়ে আর পাক খেয়ে সাপ যেমন কুণ্ডলী ছাড়ায়, তেমনি করে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করছেন। কেমন বিরক্তিকর লাগল গ্রিগোরী ইভানভিচের, আর হল ঘৃণা। দাড়ি হাত দিয়ে এলোমেলো করতে করতে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন।

'হ্যাঁ, অতি জঘন্য কাজ এটা,' বলে চললেন কুমার। গলার স্বর ওঠানামা করছে না, যেন নিজের ওপর তিনি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন। 'কিন্তু তার চেয়েও খারাপ কী জানেন? এইমাত্র আপনার কাছেও মিথ্যা বলেছি... আসল সত্যকথাটা বলা অত্যন্ত কঠিন। তার আশেপাশে ঘুর ঘুর করে যেই বলতে যাবেন অমনি দেখবেন যে সত্যিটাকে আর দেখতে পাচ্ছেন না, যেন বাঁকাচোরা পথে তার থেকে অনেক দূরে ছিট্‌কে এসে পড়েছেন। ডায়েরি রাখার মতো... কখনও চেষ্টা করেছেন ডায়েরি লিখতে? না? তাহলে করবেন না চেষ্টা... আমি আপনার সামনে এইমাত্র নিজেকে দেখিয়েছি যেন এক অতিশয় যন্ত্রণাক্লিষ্ট লোক... কিন্তু কোথায় সে-যন্ত্রণা। আমি শুধু এমন একটা লোক যার একটা ত্রুটি আছে, যেন কোথাও ফাট আছে — এই পাখানার মতো। এইখানটায় ঢুকেছিল গুলিটা। মনে হয় পাটা বুঝি সোজা করতে পারছি, তারপরেই আর বাগ মানে না — এই দেখুন আবার একপাশে বেঁকে গেছে... আসল দরকার হচ্ছে নিজের স্বরূপ ঠিকমত প্রকাশ না করা... হ্যাঁ, হ্যাঁ আসলে লোকটা কী তা একজনকে দেখাতে হলে অত্যধিক মদ গিলতে হবে... ডাক্তারবাবু, বিশ্বাস করুন, আমি আমার প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসি একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনাকে। সে যদি আমায় প্রত্যাখ্যান করে, আমি নষ্ট হয়ে যাব। এই প্রকৃত সত্য... গতকাল আমি তা টের পেলাম। কালই ছিল আমার শেষ পরীক্ষার দিন, আমি তা উত্তীর্ণ হতে পারিনি। যদিও আসলে সেটা কোনো পরীক্ষা ছিল না, ছিল শুধু নির্লজ্জ উচ্ছৃঙ্খলতা — গভীর রাতে গাড়ি করে এখানে এসে আমি একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনার রূপ, চাঁদের আলো আর আমার স্বীকারোক্তি দিয়ে নিজেকে শুদ্ধ করলাম... বেচারীর ওপর আমি আমার সমস্ত বোঝা চাপালাম। আবার আজ সকালে কোচওয়ানকে পাঠালাম সাশার কাছে এই কথা বলতে যে "আর

মালিকের কথা ভাববার যেন স্পর্ধা করে না, মালিক বিয়ে করতে চলেছেন...'' সাশা সহ্য করতে না পেরে ছুটে এসেছে এখানে... আমি জানতাম ও সব বলে দেবে এদের।'

'সব মিথ্যা কথা।' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন গ্রিগোরী ইভানভিচ। আরো কিছু বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শুধু হিক্কার আওয়াজ বেরুল। আবার দাড়ি টেনে ঘরময় ছুটোছুটি করতে লাগলেন।

প্রায় শোনা যায় না এত আস্তে অনুনয়ের সুরে বললেন কুমার:

'ডাক্তার, একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনার কাছে গিয়ে সমস্ত বলুন। সে বুঝবে...'

'আমি যাব না, কিছু বলব না তাঁকে।' চীৎকার করে উঠলেন গ্রিগোরী ইভানভিচ। 'বুঝিয়ে বলুন নিজেই। আমি কোন কথা বুঝি না, পাগলকেও বরদাস্ত করতে পারি না।'

উত্তপ্ত কপাল চেপে ধরলেন জানালার কাঁচের ওপর। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। গাছের আড়ালে এ পর্যন্ত আলো না ফেলেও কমলালেবুর রঙের চাঁদ উঠছে একটা প্রায় গোল আয়নার মতো, সেখানে বিষাদে ভরা সারা পৃথিবীটার ছায়া যেন পড়েছে।

''কী বলব তাঁকে আমি?'' ভাবতে লাগলেন গ্রিগোরী ইভানভিচ। ''যে ইনি একটি আত্মপরায়ণ পাগল? কিন্তু তাঁকে ভালোবাসেন তো? কী জানি... আমি বুঝতে পারি না এমন ভালোবাসা। আমি তো তাঁর দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলতাম, একটা কথাও বলতে পারতাম না... মেঘকে কি কেউ বলতে পারে কেমন সে ভালোবাসে তাকে?''

গ্রিগোরী ইভানভিচ চিন্তায় ডুবে আছেন, এদিকে চাঁদের আলো আরো হালকা হয়ে এল, পাতার শিশিরবিন্দুর ওপর পড়ল ঠাণ্ডা আলো, লম্বা ছায়া পড়ল মাটিতে। ঘাসের ওপর পাতলা কুয়াশা পাকিয়ে উঠতে লাগল। লাইব্রেরি-ঘরের জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে আলোকিত করল

আলেক্সেই পেত্রোভিচের আধখানা মুখ আর ওয়েস্টকোটের ভিতর আঙুল ঢোকানো একখানা হাত। বই'এর আলমারির তামার কোণাগুলো ঝকমকিয়ে উঠল।

সহসা গ্রিগোরী ইভানভিচের শরীরে শিহরণ খেলে গেল — একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা দ্রুতপায়ে জানালার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল (তাকে চিনতে পারা গেল তার সুডৌল কাঁধ আর গর্বোন্নত মাথা দেখে)। বীথিকার বাঁকে পৌঁছে একবার মুখ ফিরিয়েই ছুটে চলল সে — সাদা শাল পিছনে উড়তে লাগল ...

চট্ করে ফিরে ডাক্তার বললেন:

'উনি বাগানে ছুটে গেলেন!'

কুমার লাফিয়ে উঠে জানালাটা খুলে চুপিচুপি বললেন, 'চলুন, যাই শীগ্গির।'

দুজনে ছুটে চললেন বাগানের মধ্যে।

২

বাগানের সীমানা-খাল আর খড়ের গাদাগুলোর মাঝামাঝি মাঠে একটা কাঠের গোলাঘর একা দাঁড়িয়ে। ছাঁদের তলায় গাদাকরা স্লেজ আর বিদে। দরজার তলায় দিকে বিড়ালের আসা যাওয়ার জন্য একটা চৌকো ফুকর কাটা। একটা ভারী তালা দিয়ে দরজাটা বন্ধ।

বন্ধ দরজার ভিতর থেকে দীর্ঘশ্বাস আর মৃদু কান্না শোনা যাচ্ছিল।

একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা খালের দিক থেকে মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে গোলাঘরটার দরজার কাছে এসে হাঁপাতে লাগল। হাঁটু গেড়ে বসে ফুটোটার কাছে মুখ নামিয়ে বলল:

'সাশা, তুমি কি এখানে? কাঁদছ তুমি?'

দরজার আড়ালে কান্না থেমে গেল। কাতিয়া টের পেল তার মুখে লাগছে সাশার নিঃশ্বাস, এমনকি তার চোখদুটোও দেখা যাচ্ছে।

'আমি তোমায় বার করে দিতাম,' কাতিয়া বলল, 'কিন্তু চাবি তো আমার কাছে নেই।'

সাশার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কাতিয়া ফুটো দিয়ে হাত বাড়িয়ে সাশার গালে হাত বুলোল।

'আমি কন্দ্রাতীকে বলব, তাহলে ও বাবার কাছ থেকে চাবিটা সরিয়ে নেবে, বাবা জানতেও পারবেন না — তখন তোমায় ছেড়ে দেব আমরা। কিন্তু সেটা একটু পরে। সাশা, একটা কথা বলো আমায়... গাল আমার দিকে ফেরাও, তোমায় চুমো খাব... সাশা, ভাই, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? যাতে ও তোমার কাছে ফিরে যায় তাই নিশ্চয় করব আমি। তুমি বুঝতে পারনি, ও তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছে। আমার সম্বন্ধে ও আজেবাজে কত কী বলেছে... ও শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতেই আসেনি, বাবার সঙ্গেও দেখা করতে আসছিল। তুমিও কী ভুলই করেছ — বাবার সামনে সবকিছু বলতে গেলে কেন... কিন্তু মন্দ কিছুই ঘটেনি, সাশা। চুপচাপ বসে ভেবে দেখো সবকিছু। ও কালই তোমার কাছে ফিরে যাবে।'

সাশা কিন্তু ভীষণ কাঁদতে লাগল, দরজায় মাথা কুটতে লাগল। কাতিয়া রগ চেপে ধরে চারিদিকে তাকাল — কী উপায়ে ওকে সান্ত্বনা দেবে? সাশা বলল:

'আমার চেয়ে অভাগিনী - আর কেউ নেই দিদিমণি। ওঁর জন্য আমি সব যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি — তাছাড়া আমি জানি সবই, জানি উনি আমার কাছে মিছে কথা বলে আমায় ঠাট্টা করছিলেন এবং আমার যন্ত্রণা দেখে মনে মনে খুসী হচ্ছিলেন। কিন্তু আমি আর সইতে পারলাম না... যখন সহিসটা এসে আমায় এই কথা বলল,

''বাবুর হুকুম তুমি তাঁর কথা একেবারে ভুলে যাও। হ্যাঁ গো, তাঁর আরো হুকুম তোমাকে আমার সঙ্গে শুতে হবে'', আর অনবরত হাসতে লাগল, তখন আমার মাথায় বাজ পড়ল... আমার বোকা বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেল, ফটক দিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লাম। ভেবে পেলাম না, তাঁর কাছে ছুটে যাই কিম্বা নদীতে ঝাঁপ দিই। ঠিক সেই সময়ে আমার খুড়তুত বোন পাশ দিয়ে গাড়ি করে যেতে যেতে হেসে উঠল, বলল, ''কি গো,, তোমার কুমার সাহেবের আসার তর সইছে না বুঝি? পথে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ডাকো তাঁকে'', আমার মাথা এত খারাপ হয়ে যেতে পারে কখনও ভাবতে পারিনি... তারপর মনে হল, আপনাকে বলে আসি দিদিমণি, আপনিও জানবেন কী রকম সে লোকটা আমাদের...'

একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা নিমেষে উঠে পড়ে ফের বসল দরজার চৌকাঠের ওপর, পুকুরের দিকে মুখ করে। পাড়ে দেখা যাচ্ছে ঘোড়াগুলোর অস্পষ্ট কালো চেহারা। মাথার ওপরে আসা নিঃসঙ্গ চাঁদটা অনেক উঁচুতে উঠেছে, তার আলোয় আশেপাশের সব তারা অদৃশ্য।

থুতনিতে হাত দিয়ে কাতিয়া ভাবতে লাগল উদ্‌গত অশ্রু রোধ করে, ''কী পাগলামি এ সব। খুব শাস্তি হয়েছে আমার। ওকে আমায় ভুলতে হবে, যেতেই হবে ভুলে।'' তার চোখে শুধু নীল নির্জনে চাঁদের আলোটা যেন ধোঁয়াটে ঘোলাটে মনে হতে লাগল। সাশা বলে উঠল:

'লক্ষ্মী দিদিমণি, ওঁর দোষত্রুটি ধরবেন না, ওঁকে ভালোবাসবেন— আপনিও তো মেয়েমানুষ। আমার ক্ষমতা থাকলে আমি ওঁকে ছেড়ে দিতাম না আপনার হাতে। বড় কষ্ট আমার! কিন্তু আমার বসন্তকাল ফুরিয়েছে, এখন আপনার পালা যাতনা সইবার...'

কাতিয়া শেষ পর্যন্ত না শুনেই দাঁড়িয়ে উঠে দরজাটার দিকে তাকাল। জবাব দেবার ইচ্ছে হল তার, কিন্তু কিছু না বলেই চলে এল। গোলাঘরটার কোণ ঘুরে আসতেই মুখ দিয়ে নীচু চীৎকার করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দাঁত নীচু করিয়ে দাঁড় করানো বিদেগুলোর ওপর কুমার বসে আছেন।

দূরে মাঠে যেখানে ডাক্তার দাঁড়িয়ে ব্যাকুল হয়ে কুমারকে হাতের ইশারা করছেন সেইদিকে চোখ রেখে কাতিয়া বলল:

'রাত কত হবে? বাবা বোধ হয় খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছেন।'

কুমার নড়েচড়ে উঠতেই সে চকিতে মুখ ফিরিয়ে বাড়ির দিকে চলে গেল।

৩

আর কিছু না হোক, ভোলকভ ছিলেন অসম্ভব জেদী মানুষ। কুমারের প্রস্তাবে তাঁর সব ঝামেলার নিশ্পত্তি হচ্ছে অপ্রত্যাশিতভাবে; তাছাড়া এ প্রস্তাব আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়: ক্রাস্নপোল্স্কীরা হলেন রুরিকের বংশধর, এক সময়ে তাঁরা একটা মুলুক শাসন করতেন। রুরিকের কথা মনে পড়াতে (মীলয়ে থেকে ফিরবার পথে) আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ একটু অপমানিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে কুমার নিজেকে খুব হামবড়া মনে করতে পারেন। এই কথা মনে হওয়াতে তিনি কাঁধ দিয়ে কুমারকে এমন ঠেসে ধরেছিলেন গাড়ির কোণে যে কুমারের লাগছিল। আলেক্সেই পেত্রোভিচ কিন্তু এ সব সূক্ষ্ম ব্যাপার বোঝেন না, ভোলকভও বেশীক্ষণ রেগে থাকতে পারেননি। অপমানের কথা মন থেকে মুছে ফেলার জন্য তিনি তক্ষুণি স্থির করলেন তাঁর মেয়েকে এমন যৌতুক দেবেন যে কেউ কখনও কানেও

শোনেনি। এ বিষয়ে গল্পও করতে আরম্ভ করেছিলেন তিনি। এমন সময়ে, তাঁরা ভোলকভোতে পৌঁছতে না পৌঁছতে নির্বোধ মেয়েটা কেলেঙ্কারি সুরু করল আর সব গেল পণ্ড হয়ে।

সাশার ওপর রাগের প্রথম চোটটা শান্ত হতেই আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ বুঝতে পারলেন যে চেঁচামেচি করে কিছু লাভ হবে না। ব্যাপারটা কিন্তু আসলে সত্যি অসহ্য, তিনি বেশ দমে গিয়েছিলেন, তাই পড়বার ঘরে গিয়ে টেবিলের পাশে বসলেন।

তাঁর মনে হ'ল, "আমার বুক ফেটে যাবে, কিন্তু ঐ বদমায়েসটার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেব।" কষে কুমারের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করলেন তিনি, তারপর রেগে উঠলেন কন্যার ওপর।

অনেকক্ষণ ধরে গভীর চিন্তা করে আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচের মনে এই অদ্ভুত ধারণা বদ্ধমূল হল যে এসব বাজে, আসলে কাতিয়া আর কুমারের মধ্যে কোন দুর্ঘটনাই ঘটেনি। কুমারের যদি একটু বেচালই হয়ে থাকে তাতে কী এসে যায়? ঐ জন্যেই তো পৃথিবীতে মেয়ে পুরুষ দুটো জাতের সৃষ্টি হয়েছে। একটু আধটু ওরকম না হলে জীবন একঘেয়ে হয়ে যাবে যে!

অমনি তিনি টেবিলে প্রচণ্ড থাপড় মেরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "দুজনের মধ্যে ভাব করাবই।" মনটাকে ঠিক প্রস্তুত করে হাল্কা করে নেবার জন্য তিনি জোর করে কমবেশী প্রীতিকর জিনিসের কথা ভাবতে আরম্ভ করলেন।

এই মতলবে একটা পেন্সিল আর একটুকরো মাছির-দাগ-ধরা কাগজ নিয়ে তিনি আঁকতে বসলেন, প্রথমে একটা খরগোশ। আপন মনেই বলে চললেন:

'আহা, টেরা-চোখ, পা নিয়ে ছুটে পালানো হচ্ছে—দেব একটা শেয়াল লেলিয়ে?' আঁকলেন একটা শেয়াল খরগোশের পিছনে।

'খরগোশ ধরতে চাও, কেমন? শয়তান বুড়ী কোথাকার, নেকড়েবাঘকে ভয় পাও? এই যে পাঠাচ্ছি, হামদোমুখো নেকড়ে ল্যাজ টান করে তাড়া করেছে। তোমাদের দুজনকেই খাবে বাছাধনরা। আর তোমার পিছনেও পাঠাচ্ছি বড় বড় লোমওয়ালা ছিটেকাটা কুকুরের পাল। ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে তোমায়। মার ব্যাটাকে বাছারা আমার, ছাড়িসনে—টালি হো।'

কুকুরগুলো এঁকে ভোলকভ এতেই উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যে চেয়ার ছেড়ে উঠে নিজের পিছনদিকে প্রচণ্ড একটা ঘুঁষি লাগালেন যেন সেটা একটা ঘোড়া। তারপর পেন্সিলটা রেখে হেসে উঠে নিজের ওপর খুব খুসী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার পথে চাকরকে ডেকে হুকুম দিলেন খাবার জন্য সকলকে ডাকতে।

বাবুর্চির দুই ছেলে খাবার জন্য গেল সকলের পাত্তায়। ভোলকভ গেলেন মেয়ের ঘরে। কাতিয়া তখন সমস্ত জামাকাপড় পরে বিছানার ওপরে বসে। বললেন তাকে:

'চলো মা, অনেক হৈচৈ গেছে, এখন খাবে চলো।' কাতিয়া যাব না বলতেই এমন ফোঁস ফোঁস করে উঠলেন তিনি যে সে তৎক্ষণাৎ বলল:

'আচ্ছা বাবা, আমি যাচ্ছি।'

বাবুর্চির ছেলেরা দুই অতিথিকে দেখতে পেল মাঠে। কুমার আর ডাক্তার গোলাঘর আর খানের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। ডাকবামাত্র কুমার বাড়ির দিকে এলেন, কিন্তু ডাক্তার ছেলেদুটিকে বলতে লাগলেন যে তাঁর খাবার ইচ্ছা নেই, তাঁর জন্য ঘোড়া ঠিক করে দিতে হবে। অথচ তারপরই কুমারের পিছনে দৌড়লেন।

ছোট খানাকামরায় আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ তাঁদের এই বলে অভ্যর্থনা করালেন:

'মশায়গণ, আমি মনে করি যে এখানে যা কিছুই ঘটে থাকুক, পেট মানবে না। অতএব দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।'

গোল টেবিল দেখিয়ে প্রথমেই নিজে বসে পড়ে গলায় ন্যাপ্‌কিন জড়ালেন।

এমন সময়ে ঢুকল একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা। ফ্যাকাসে চেহারা, চোখের কোলে কালি। কারো দিকে না তাকিয়ে ঝপ্ করে তার বাবার সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। মুখ শান্ত অথচ গর্বিত, কিন্তু খালি গলায় ঘাড়ের কাছে শিরার দপ্‌দপানি, অল্প হলেও চোখে পড়ছে।

'এই যে, আমাদের রুগী মানুষ এলেন!' চেঁচিয়ে উঠলেন আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ। 'কাতিউশা, তুমি কুমারকে নমস্কার করলে না...'

'করেছি,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল কাতিয়া।

আলেক্সেই পেত্রোভিচ খাড়া হয়ে বসলেন চেয়ারে। মনে হল যেন হাওয়ার অভাবে তাঁর দমবন্ধ হয়ে আসছে। গ্রিগোরী ইভানভিচ মাথা নীচু করে কাঁটা দিয়ে টেবিলঢাকা কাপড়টায় আঁচড় কাটতে লাগলেন।

আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ কিন্তু এত সহজে দমে যাবার পাত্র নন। তিনি গোঁফ টেনে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে সকলের দিকে তাকালেন খুসীভরা চোখ নাচিয়ে। সবাই কিন্তু চুপচাপই রইল। কন্দ্রাতী নিঃশব্দ পায়ে প্লেটগুলো এগিয়ে দিয়ে গেলাসে গেলাসে মদ ঢেলে দিচ্ছিল। ডাক্তারের হাত পর্যন্ত ঘামে ভিজে উঠেছে। তিনিই সর্বপ্রথম কর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচের চোখে অদম্য হাসির ঝিলিক।

'এ সব কী পাগলামি!' জোর গলায় বলে উঠলেন তিনি সশব্দে টেবিল চাপড়ে। 'সবাই মুখ গোঁজ করে বসে আছেন। যেন কিছু এসে যায় ওতে! কাতিয়া, মুখভার করো না! আর এখানে যখন একজন ডাক্তার উপস্থিত আছেন তখন আমি বলি আমার অভিলাষ

কী। আমার চাই একটি নাতি। আহা, শয়তানদের বুঝি লজ্জা হচ্ছে? সব ঠিক্‌ঠাক হয়ে গেছে... ব্যস্‌, খতম।'

কথায় আরো জোর দেবার জন্য তিনি হেসে উঠলেন হো হো করে। হাসিটা এতই সংক্রামক যে তাঁর মনে হল সকলকেই, এমনকি কন্দ্রাতীকেও, হাসির চোটে পেটে হাতচাপা দিতে হবে। আধবোজা চোখের ফাঁক দিয়ে কিন্তু আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ বেশ দেখতে পেলেন যে হাসিটা জমল না। কুমারের মুখে একটু কাষ্ঠহাসি দেখা গেল, গ্রিগোরী ইভানভিচ একটা মুরগীর ঠ্যাঙ নিয়ে কামড়াতে গিয়ে শূন্যে সেটা ধরেই রইলেন, তাঁর কপালে যন্ত্রণার রেখা দেখা দিল। কাতিয়া তার বাবার মুখের দিকে চোখ তুলল, দেখা গেল সে চোখ রাগে, দুঃখে অন্ধকার।

নিজেকে বহুকষ্টে সম্বরণ করে সে বলল:

'বাবা থামুন বলছি, নইলে আমি বেরিয়ে যাব ঘর থেকে।' তার গাল হয়ে উঠেছে টক্‌টকে লাল। সে দাঁড়িয়ে উঠল।

এতক্ষণে ভোলকভ রেগে উঠেছেন। চীৎকার করে উঠলেন:

'দাঁড়াও। খবরদার, বেরিয়ে যেও না! আমি সকলের সামনে বলছি—এই বর, এই কনে। কুমার, যাও, ওর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাও।'

একেবারে পাঙাশমুখে কুমার আস্তে আস্তে ন্যাপ্‌কিনটা নামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ফুলবাবুর মতো কাঁধ দুটো উঁচু করলেন তিনি। পা কাঁপছে তাঁর। একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনার কাছে গিয়ে বিরস কণ্ঠে বললেন:

'আশা করি লক্ষ্মী, আপনি আমার অতীতকে ক্ষমা করবেন।' এই কথা বলে তার হাত ধরে চাপ দিলেন।

কাতিয়া ধীরে, যেন স্বপ্নের ঘোরে হাত টেনে নিল আর মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে জোরে এক চড় মারল কুমারের মুখে।

৪

ভোলকভের অত চালাকি করে তোড়জোড় করা খানাপিনার এইভাবে সহসা অবসান হল। কুমার মাথা হেঁট করে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন সেই দরজার দিকে যেখান দিয়ে কাতিয়া দ্রুত প্রস্থান করেছে। গ্রিগোরী ইভানভিচ দুহাতে মুখ ঢেকেছেন। ভোলকভ হাতে ছুরি আর কাঁটা ধরে রাগে ফেটে পড়ছিলেন, তাঁর চোখ ঘুরছিল।

হঠাৎ কন্দ্রাতী ঢুকল ঘরে। ঠোঁটে ঠোঁট চাপা, চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। আঙ্গুল দিয়ে পিছন দিকে দেখিয়ে সে বলল:

'আস্তাবলের ছোকরা-সহিস বলছে সেই মেয়েটা, যে আজকে এখানে এসেছিল, গোলাঘর থেকে পালিয়েছে। সেটা জলের বিষয়ে খুব অসাবধান নাকি...'

'চুলোয় যাক মেয়েটা। জাহান্নমে যাক্। বুঝেছ?' চীৎকার ফেটে পড়লেন আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ। গলার স্বর যেন তাঁর নিজের নয়।

কন্দ্রাতী মাথা নেড়ে সরে পড়ল। ভোলকভ গলা থেকে ন্যাপ্‌কিনটা টেনে নিয়ে একমুহূর্ত ভেবে সেটাকে ছিঁড়ে দ্রুতপায়ে প্রবেশপথ দিয়ে ছুটে গেলেন তাঁর মেয়ের সন্ধানে।

কুমার টেবিলে বসে পড়ে নিজের জন্য খানিকটা মদ ঢাললেন। রাঙা গালে হাত রেখে মুখে শুকনো হাসি টেনে বললেন:

'এতে কিছুই আসে যায় না।'

গ্রিগোরী ইভানভিচ তৎক্ষণাৎ টেবিল ছেড়ে উঠলেন। সর্বশরীর তাঁর এত কাঁপছে যে দাঁত পর্যন্ত ঠক্‌ঠক্ করছে। দূরে প্রবেশপথের শেষপ্রান্তে ভোলকভের ভারী পায়ের আর অস্পষ্ট গলার আওয়াজ শোনা গেল।

'"জলের বিষয়ে খুব অসাবধান"—হাস্যকর কথা নয় কি?' বলে কুমার একটু মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে পা টিপে দরজা পর্যন্ত

গিয়ে নিমেষের জন্য দরজার কাঠামোয় ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন, যেন তাঁর শরীরে হঠাৎ কোন জোর নেই, তারপর বেরিয়ে গেলেন।

"সব ক'টা মরবে আজ," ভাবলেন গ্রিগোরী ইভানভিচ। "করছে কী ওরা? সব দোষ ঐ কুমারের... ও একটা সংক্রামক ব্যাধির মতো। ওকে তাড়িয়ে দেয় না কেন?... আমিই যদি ওকে দূর করে দিয়ে বলি: ভাববেন না একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা, আমি আপনাকে এত ভালোবাসি যেমন... কেমন ভালোবাসি আমি? আমি একটা গাধা। এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত আমার, পায়ে হেঁটেই। আমার মাথায় ঢুকছে না এখানে কী সব ঘটছে। ওরা কী জাতের ভালোবাসা চায়? ওরা তো ভালোবাসা চায় না, চায় যন্ত্রণা — আর কিছু না। আমার ওকে ছাড়াও চলবে। অনেক আছে আমার সারাজীবন কেটে যাবার মতো... কিন্তু এই মুহূর্তে একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা বিষ খাবে — নিশ্চয় বিষ খাবেই... আর আমি শুধু নিজের চিন্তায় আকুল হচ্ছি! কিসে আমার এত আনন্দ এইমাত্র? তাহলে আমার মতো পাপিষ্ঠ যে পৃথিবীতে কেউ নেই। সবাই খালি নিজের কথা ভাবছি, কুমার, তোলকভ, আমি — সবাই। এই করেই আমরা মেয়েটাকে এত কষ্ট দিচ্ছি... আহা বেচারী..."

গ্রিগোরী ইভানভিচের চিন্তা এত এলোমেলো হয়ে পড়ল যে মনের দুঃখে তিনি ভেবে উঠতে পারলেন না তাঁর চলে যাওয়া উচিত না থাকা উচিত। প্রবেশপথের প্রান্তের সেই ভয়ানক গলার আওয়াজের থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তিনি বাগানে গিয়ে অন্ধকার ঝোপগুলোর কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে, আরো কী কী দুঃখকর ঘটনা ঘটেছে তাই তোলাপাড়া করতে করতে মাঠের ওপর দিয়ে সেই গোলাঘরের দিকে চললেন।

"সাশাকেও এই আবর্তের মধ্যে টেনে এনেছে," ভাবলেন তিনি গোলাঘরের খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে "নলের মুখে জল ঘুরপাক খেলে সবকিছু টেনে নেয়..."

হঠাৎ তাঁর খেয়াল হ'ল কুমারের সেই কথার কী মানে—"জলের বিষয়ে খুব অসাবধান—কি হাস্যকর কথা"। সাশা নিশ্চয় পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছে... নিশ্চয় তাই... গোলাঘরের দরজা থেকে মাঠের ওপর দিয়ে সোজা ছুটে এসে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে!

চমকে উঠে গ্রিগোরী ইভানভিচ ছুটলেন হাত দুলিয়ে। পুকুরের ধারে, জলটা যেখানে উইলোর ছায়ায় অন্ধকার কন্দ্রাতী আর সহিস দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের কাছে ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে সাশা। ছোকরা-সহিসটা উবু হয়ে বসে সেই অনড় ফ্যাকাসে হাঁ-করা মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। গ্রিগোরী ইভানভিচকে ছুটে আসতে দেখে সহিসটা বলল:

'ঠিক আছে। আমি যখন ওকে টেনে তুললাম তখনও নিঃশ্বাস পড়ছিল ওর। এখন এর হুঁশ ফিরে আসছে।'

কন্দ্রাতীও বলল:

'দম ফিরে আসবে, শুধু মূর্ছা গেছে।'

গ্রিগোরী ইভানভিচ সাশার পাশে বসে পড়ে বোতামগুলো পট্‌পট্‌ করে ছিঁড়ে কালো ব্লাউজটা খুলে ফেলে কান পাতলেন তার কঠিন উঁচু স্তনের তলায়। গা তখনও গরম আছে। তারপর তার হাতদুটো ওঠানামা করে পেটে চাপ দিয়ে তার ভারী দেহটাকে তুলতে আর নামাতে লাগলেন। সারাক্ষণ বক্‌বক্‌ করতে করতে সহিসটাও তাঁকে সাহায্য করতে লাগল।

'দেখলাম একটা মেয়ে ছুটছে। আমি বলি, "নিশ্চয়ই সেই মেয়েটা"। ডাকলাম, "সাশা, এই সাশা!" সে কাছে এল কিন্তু কাঁপছিল যেন

জ্বরের ঘোরে। আমি জিজ্ঞেস করলাম কর্তা ওকে ছেড়ে দিয়েছেন নাকি। ও বলল, হ্যাঁ। তারপর জলের দিকে তাকাল। "কোথায় যাচ্ছো সাশা?" জিজ্ঞেস করলাম। "বিদায়", বলে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে বাঁধটার দিকে চলল। এত চেঁচিয়ে কাঁদছিল যে আমি হেসে উঠলাম। বাঁধে উঠে চেঁচাল, "সহিস, তুমি আছ এখনও?" আমি বললাম, "পার করো বাঁধটা।" আমার কিন্তু তখন ভয় লাগছিল... হঠাৎ ও পড়ল ঝপাং করে... জলের মধ্যে...'

ছোকরা-সহিসটা বলে উঠল:

'বাঁধের ওপর থেকে অন্য এক জনকে ডেকেছে হে।'

'তুই থাম্,' বলে উঠে সহিস ছোকরার কদমছাঁট মাথায় টোকা মারল, 'ফাজিল কোথাকার।'

গ্রিগোরী ইভানভিচ সাশার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফুঁ দিয়ে তার মুখের মধ্যে হাওয়া ঢোকাবার চেষ্টা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুই কাঁধ ফাঁক করলেন যাতে বুকের মধ্যে হাওয়া যায়। হঠাৎ ওর ঠাণ্ডাহিম ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল। গ্রিগোরী ইভানভিচ চট্ করে মুখ সরিয়ে নিলেন, যেন হঠাৎ চুমোর থেকে। সাশা নড়েচড়ে উঠল। তখন তারা তাকে উঠিয়ে বসাতেই তার হাঁ করা মুখ দিয়ে হুড়হুড় করে জল বেরোল। সাশা চোখ উল্টে কাতর শব্দ করল। কন্দ্রাতী হুকুম করল:

'নিয়ে যা ওকে মালীর ঘরে। মেয়েছেলে মাত্রেই কী বোকা...'

৫

চূর্ণকাম-করা প্রবেশপথের শেষপ্রান্তে বন্ধ দরজার পর্দায় মাথা ঠেস দিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কাতিয়া তার বাবার কথা শুনছিল। তিনি চেষ্টা করছিলেন তার হাত ধরতে, কিন্তু সে হাত দুটো পিছনে লুকিয়েছিল। অদূরে একটা ঝোলানো বাতির নীচে কুমার দাঁড়িয়েছিলেন।

'আমি তোকে মাপ চাওয়াবই,' বারে বারে বলছিলেন ভোলকভ, রাগে তোতলাতে তোতলাতে। 'এ অভ্যাস কোথায় পেলি তুই — লোকের গালে চড় মারা? কে শেখাল তোকে? দে হাত, বের কর্ হাত — ক্ষমা চা বলছি।'

কাতিয়া কিন্তু আরো জোরে চেপে রইল চক্‌চকে রঙীন পর্দাটাকে। বিনুনি খুলে চুল তার ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধের ওপর। পুরুষ্টু হাঁটু দিয়ে টান করে চেপে রেখেছে ধূসর রঙের রেশমী পোষাক। উঁচু বুকের তলায় সরু কোমরে সেটা টান করে বাঁধা।

কুমার তার এই ভঙ্গী লক্ষ্য করেছিলেন। হাঁটুর দিকে তাকাতেই তাঁর বুকটা টন্‌টন্ করে উঠল এক পরিচিত ব্যথায়। এ অনুভূতি যেমন স্পষ্ট তেমনি তীব্র। অকস্মাৎ ভাঁজ করা সেই হাঁটু যেন সব আবরণ ছিঁড়ে খান খান করে দিল। তিনি কাতিয়াকে দেখলেন স্ত্রী, নারী, প্রেমিকারূপে। শুকনো ঠোঁট কামড়ে তিনি দেওয়াল ঘেঁসে এগিয়ে এলেন।

'তুই কি মা ঠাট্টা করছিস না আমি ঘুমিয়ে আছি?' বলে চলেছেন আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ। একসঙ্গে এতগুলো অপ্রীতিকর ঘটনা তাঁর জীবনে আর কখনও ঘটেনি। মুহূর্তের জন্য তিনি ভেবে পেলেন না এ সমস্ত একটা দুঃস্বপ্ন কিনা। তখনি পা ঠুকে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'জবাব দে, পাথরের মূর্তি কোথাকার।' মেয়ে কিন্তু একটি কথাও না বলাতে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে আবার বললেন তিনি, 'ক্ষমা চা, আয়, ক্ষমা চেয়ে নে ওর কাছে।'

'না, তার চেয়ে আমার মরণ ভাল।' বলে উঠল কাতিয়া। কুমারকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে দেখে তার ভ্রূ কুঁচকে এল। সে প্রথমে বুঝতে পারেনি কুমার তার কী দেখছেন, কেন তার দিকে এগিয়ে

আসছেন। এমনকি গলা বাড়িয়ে সে দেখল তাঁর দিকে। হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে সে হাত তুলল ওপরে...

আলেক্সান্দ্র ভার্দীমীচ হাত বাড়ালেন মেয়ের হাত ধরে ফেলতে। ধরতে না পেরে রাগে ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠলেন। কুমার ততক্ষণে তার খুব কাছে এসে গভীর গলায় বললেন:

'একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা, আর একবার গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি আপনার পাণিপ্রার্থনা করছি। দয়া করে আমায় প্রত্যাখ্যান করবেন না।'

চোখ তাঁর নিষ্প্রভ পলকহীন ভয়ানক, মুখ শুকনো হয়ে গেছে।

'দেখলি তো কাতিয়া!' ফের বলে উঠলেন ভোলকভ, 'আঃ, ছেলেমেয়ে, বোকামি না করে চুমো খা দুজনে।'

কিন্তু কাতিয়া জবাব না দিয়ে শুধু মাথা হেঁট করল। তারপর তার বাবা কুমারকে ঠেলে তার দিকে এগিয়ে দিতেই তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে সরে গিয়ে দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে দিল।

'দেখলে একবার?' চীৎকার করলেন ভোলকভ। 'চলবে না এসব, চলবে না বলছি!' বলে কাঁধ দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলেন। দরজা নড়ল না দেখে দমাদ্দম ঘুঁষি মারতে লাগলেন, অবশেষে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে জুতোর গোড়ালি দিয়ে লাথি মারলেন।

'থাক্, ছেড়ে দিন ওকে, চলুন আমরা যাই,' মৃদুস্বরে বললেন কুমার। তাঁর মুখে চোখে অস্বাভাবিক উত্তেজনা। 'আমি জানি ও কী জবাব দেবে। দোহাই ভগবানের, চলুন যাই।'

জেদী ভোলকভকে বোঝাতে তাঁর অনেক সময় লাগল। শেষ পর্যন্ত ভোলকভ মুখের ঘাম মুছে বললেন:

'দেখছ তো বাপু, মেয়ের বিয়ে দেওয়া সোজা কথা নয়—ঘেমে নেয়ে উঠতে হয়। তুমি কেবল দয়া করে চুপটি থেকো, এ ব্যাপারে নাক গলিও না। আমি নিজেই সব ব্যবস্থা করব।'

দরজায় ঘা-পড়া বন্ধ হল, প্রবেশপথে পায়ের শব্দও মিলিয়ে গেল। তখন কাতিয়া বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে দু'হাতে বালিশ আঁকড়ে ধরল।

"এই ওর দরকার ছিল, ভালো হল," বারবার বলতে লাগল সে। (যেন স্বচ্ছ বালিশটার মধ্যে দিয়ে) তার চোখে ভাসতে লাগল আলেক্সেই পেত্রোভিচের শুকনো ভয়ঙ্কর চোখজোড়া। তার ভাষা বুঝতে তার ভয় হচ্ছিল। তাই কাতিয়া রাগের কথা বারবার বলতে লাগল, কিন্তু সেগুলোর জোর, এমনকি মানে পর্যন্ত যেন ফুরিয়ে গেছে। যেন সেই একটি বিশ্রী চড় মারাতেই তার রাগের সমস্ত শক্তি উজাড় হয়ে গেছে। সেই একটি আঘাত দিয়ে সে যেন কুমারের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে, প্রেমের বাঁধনের চেয়ে নিবিড়ভাবে।

"হে ভগবান, আজকের দিনটা সময়ের পাতা থেকে মুছে যাক্," মনে মনে বলতে লাগল সে। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার, আর কোন উদ্ধারের রাস্তা দেখতে পাচ্ছে না। তার ঘৃণা, রাগ, ঈর্ষা, অহঙ্কার সেই একটি আঘাতে যেন কাঁচের মতো ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙে গেছে। কুমার এখন তাকে তুলে নেবে আপন অধিকারে, ইচ্ছা হলে ত্যাগ করে যাবে... তার যা ইচ্ছা তাই করবে ওকে নিয়ে...

কী ভাবে কুমার জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে তার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "আশা করি লক্ষ্মীটি, আপনি আমার অতীতকে..." এই সবের স্মৃতি তাকে পোড়াতে লাগল আগুনের মতো। "এ সব নিশ্চয় ছল — গ্রীষ্ম কুঞ্জে আমাকে সেই গল্পটা বলার সময় ওর যে যন্ত্রণা দেখেছিলাম। কিন্তু হয়ত তখন মিথ্যা বলছিল? সাশার কথা তো কিছুই বলেনি... এমন একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিল।... এই বুঝি ভালোবাসা? এ তো ঘৃণ্য অসহনীয় লাম্পট্য! বাবা কি অমনি সাশার গলা টিপে মারতে গিয়েছিলেন?" সাশার সেই আজকের আর্ত চীৎকার আবার কাতিয়ার কানে বাজল। ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসে

মনে মনে প্রশ্ন করল সে, "লোককে এত কষ্ট দেবার ওর কী অধিকার? ওর কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে? কাকে চায় ও? সেই অন্য মেয়েটা, সাশা, আমি—এদের সকলকেই নিয়ে ও কী চায়?.. কাকে ভালোবাসে? আমাকেই বা চায় কেন? তার একটা কারণ নিশ্চয় আছে? ও কি আপনার লোক নয়? কখনো আমাকে ভালোবাসেনি? কী করব আমি?... আমি জানি ও জোর করবে যাতে আমি ওকে বিয়ে করি—জানি আমি। আর আমি করবও তাই। বিয়ে করে প্রতিশোধ নেব। সকলের ওপর রাগ করে ওকে বিয়ে করব। আমাকেও অন্যেদের সমান দৃষ্টিতে দেখুক না... ইচ্ছা করে এই যন্ত্রণা নেব। ভালোবাসতে পারিনি; ভালোবাসতেও চাই না ... আর কারো ভালোবাসাও চাই না ..."

সাদা মোজাপরা পা বিছানা থেকে নামিয়ে গালে হাত দিয়ে সে বসল আর দরদর করে অশ্রু বেয়ে পড়তে লাগল তার জামায়, তার হাঁটুতে। আবার যেন নতুন করে তীব্রভাবে সে অনুভব করল এখন তার জীবন অসার, তার কোনো পথ নেই। বুক ফাটা চীৎকার চাপল, চোখের জল আরো হুহু করে পড়তে লাগল।

অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে অবশেষে শান্ত হল সে। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ছে তখনও, কাঁধ তখনও শিউরে উঠছে। ধীরে ধীরে পোষাক খুলে আয়নার কাছে গেল সে। দুধারে আলো বসানো লম্বা আয়নায় নিজের মুখের যেন নতুন চেহারা দেখতে পেল। "বেচারী কাতিউশা, রূপসী তুমি বটে," হতাশার সুরে চুপিচুপি এই কথা বলে নিজের মুখ আরো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তারপর মাঝরাতের পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত আয়নার সামনে বসে নির্বাক বিষণ্ণভাবে চিন্তা করতে লাগল নিজের কথা—যেন সেই দিনটা বয়ে নিয়ে গিয়েছে তার জীবনের সব আনন্দ।

# অদৃষ্ট

১

কুমার ভোলকভোতে থেকে গেলেন। তাঁকে সবচেয়ে ভাল ক'খানা ঘর দেওয়া হল, তাঁর যা কিছু প্রয়োজন সব জিনিস "মীলয়ে" থেকে আনিয়ে নেওয়া হল। আলেক্সেই পেত্রোভিচ তাঁর ঐ ঘর ক'খানা থেকে কোথাও বেরোতেন না। সকাল হতেই দাড়ি কামিয়ে, পরিপাটী করে জামাকাপড় পরে সোফাতে শুয়ে পড়তেন। তারপর সারাক্ষণ শুয়েই কাটাতেন হাতের আঙুলের নখগুলোর দিকে তাকিয়ে, চিন্তায় ডুবে গিয়ে। যখনই আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ দরজা দিয়ে উঁকি মেরে বলতে আসতেন মেয়ের সঙ্গে তাঁর আলোচনা কতদূর এগোল, তখন কুমার ঘুমিয়ে পড়ার ভান করতেন।

আলেক্সেই পেত্রোভিচ পুরোমাত্রায় উপলব্ধি করেছিলেন যে মাত্র এইখানেই, কাতিয়ার সান্নিধ্যেই তাঁর শেষ মুক্তির আশা। আরো বুঝেছিলেন যে যতদিন তিনি ভোলকভোতে থাকবেন ততই কাতিয়ার সম্মতির সম্ভাবনা বেশী হবে। সারা জেলায় লোকে ইতিমধ্যেই বলাবলি করছে তাঁকে থাপ্পড় মারার কথা, সাশার কথা, এমন সব রং চড়িয়ে যে শুনলে মহিলারা ঘর ছেড়ে পালান। আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচের কাছেও এই রকম পরিস্থিতি মনে হল সবচেয়ে সুবিধাজনক। সকালবেলায় তিনি মেয়ের ঘরে গিয়ে জানালার ধারে আরাম কেদারায় বসে বলতেন:

'উঃ, কী পাউডারের গন্ধ রে বাবা এখানে। সাজগোজ হচ্ছে বুঝি?' মেয়ের নিরুৎসাহ দৃষ্টির জবাবে রেগেমেগে বলতেন, 'বুঝি না মা, তোমরা মেয়েরা কী চাও! স্বর্গের দেবতা নাকি? এই ধরো তোমার মা'র কথা—ভাল ঘরে ভালভাবে ইংরাজী কেতায় মানুষ হয়েছিলেন। আমি তাঁর পিছনে লাগলাম, তিনি আমায় বিয়ে করলেন।

যদিও অনেক চোখের জল ফেলেছিলেন এই নিয়ে। ব্যাপার হ'ল ঐ রকম মা, কাঁদবি বটে তুই, কিন্তু রাজরাণী হবি।'

মেয়ের কাছ থেকে তিনি যেতেন আলেক্সেই পেত্রোভিচের কাছে। তিনি ঘুমের ভান করে পড়ে না থাকলে সোফার ওপর তার পায়ের কাছে বসে পড়ে তাঁর হাঁটুতে টোকা মেরে বলতেন:

'মেয়ে আমার বাগ মানছে। শয়তানী বটে। আর তুমি কিনা এইরকম একটা কেলেঙ্কারির মধ্যে জড়িয়ে পড়লে। আরে, ভুল একটা যদি করেইছিলে, তাহলে চুপ করে থাকতে হয়। একটা কথা বুঝে উঠতে পারি না। আগেই কেন বিয়ের প্রস্তাব করনি? আমি কবে বিয়ে দিয়ে দিতাম, তোমরা দিব্যি বিদেশে বেড়াতে চলে যেতে।'

কুমার জবাব দিলেন:

'সত্যিই জানি না কেন আগেই বিয়ের কথা তুলিনি।' তারপর ভোলকভ চলে যেতে নিজের মনেই হাসলেন।

বরকনের প্রথম দেখা হ'ল বাগানের একটা বেঞ্চে। ভোলকভ প্রথমে কুমারকে, পরে কাতিয়াকে এনে হাজির করে, "ঐ যাঃ, বাছুরগুলো রাস্পবেরির ঝোপে ঢুকেছে," বলেই দৌড় দিলেন।

অনেকক্ষণ কুমার আর কাতিয়া চুপচাপ বসে রইলেন। কাতিয়া শালের পাড়টা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল, কুমার সিগারেট খেলেন। অবশেষে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন:

'আপনি যদি স্বেচ্ছায় আমার কাছে আসতেন আর ভালোবাসতেন, তাহলে আমি আপনাকে বিয়ে করতাম না।'

কাতিয়ার মুখ একেবারে পাংশু হয়ে গেল, আঙুলগুলো শালের কিনার থেকে ছাড়াতে পারছে না সে, কিন্তু তবু কোন কথা বলল না।

অতি ধীরে দুঃখের সঙ্গে কুমার বললেন:

'এসব চুকিয়ে দিই—আসুন আমরা বিয়ে করি।'

কাতিয়ার মুখ লজ্জায় রাগে টকটকে হয়ে উঠল। তাঁর দিকে এক ঝটকায় ফিরে বলল সে :

'আমি আপনাকে ঘৃণা করি। আপনি আমাকে যন্ত্রণা দেন। ইচ্ছে করেই আমার সর্বনাশ করছেন। পৃথিবীতে আর কাউকে খুঁজে পেলেন না আপনি?'

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন কুমার :

'কাতিয়া, আপনি খুব বুদ্ধিমতী, আপনার সব বোঝা উচিত। আগামী সপ্তাহেই আমাদের বিয়ে হোক, কী বলেন?'

প্রায় শোনা গেল না এমন মৃদু স্বরে "বেশ" বলে উঠে দাঁড়িয়ে একমুহূর্ত স্থির থেকে চলে গেল সে; আর একবারও ফিরে তাকাল না।

২

লোকে যাকে বলে "মৃত-সঞ্জীবনী" তার ব্যবহার চলে আসছে পুরাতন কাল থেকে। সেটা তৈরী হয় কুচোন বাঁধাকপি, মূলো, কুচোন মূলো আচারের শশার রস দিয়ে, আর খাওয়া হয় বড় ভোজের পরে।

এমন কোন "মৃত-সঞ্জীবনী" ছিল না যাতে ভোলকভের বিয়েবাড়ির ধাক্কা সামলাতে পারে। সেই ভোজে এসে জুটেছিল জেলার প্রায় সমস্ত লোক। কত রকমের গাড়ি বড় রাস্তা আর অলিগলি দিয়ে গড়গড় করে চলেছে—যেন মেলায়। ও জেলায় এত বাবুলোক জুটল কোথা থেকে ভেবে পাওয়াই দুর্ঘট।

কলিভানের ছোট গির্জাতে কেবল বুড়োমানুষ মহিলা আর কুমারীর স্থান সঙ্কুলান হল। বাকি সব নিমন্ত্রিত গির্জার অলিন্দের চারপাশে বসলেন ফুল আর যই'এর বীজ হাতে নিয়ে। সেগুলো কুমার আর তাঁর স্ত্রীর মাথায় বৃষ্টি করা হবে।

ফাদার ভাসীলী সোনালি পোষাক পরে মধুমাখা স্বরে বিয়ের মন্ত্র পড়লেন। নব পরিণীত দুজনে লাল বড় রুমালের ওপর দাঁড়িয়ে, তাদের কাছে নীল সার্ট পরা একটি ছেলের হাতে আইকন। গির্জার ভিতরটা সুসজ্জিতা মহিলাদের হাল্কা কথা আর কানাকানিতে সরগরম। একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা একটা বাতি হাতে নিয়ে তার শিখার দিকে শান্ত গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'কী সুন্দর দেখতে! যেন পরীর মতো!' ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন নিমন্ত্রিতা মহিলারা।

কুমারকে কালো ফ্রককোটে খুব ছোট দেখাচ্ছিল। শান্ত ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে তিনি বিয়ের ক্রিয়াকাণ্ড বেশ গম্ভীরভাবে করে যাচ্ছিলেন।

পুরোহিত যখন তাঁদের হাতে মদের পাত্র দিলেন তখন কুমার তাতে মাত্র ঠোঁট ছোঁয়ালেন, কিন্তু কাতিয়া এক নিঃশ্বাসে শেষবিন্দু পর্যন্ত সবটা মদ শেষ করল, যেন সে বেজায় তৃষ্ণার্ত। গানের দল ধর্মসঙ্গীত গাইল, পুরোহিত বরবধূর হাত একত্র করলেন। কাতিয়া হাঁটু দিয়ে খড়খড়ে রেশমী পোষাকের বাধা হটিয়ে লম্বা আঁচলা পিছনে সরসরিয়ে খুব তাড়াতাড়ি টেবিলের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে চলল, এবং সকলেরই চোখে পড়ল তার সঙ্গে সমান তাল রাখতে গিয়ে কুমারকে কী রকম খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছে।

মহিলারা রায় দিলেন, 'কনের তুলনায় বর ক্ষুদে।'

বরকনে সকলের আগে, তারপরে নিমন্ত্রিতরা গির্জা থেকে ভোলকভোর দিকে রওনা হলেন। কলিভান থেকে যাবার সময় কাতিয়া দেখতে পেল ডাক্তার জাবোতকিনকে। তিনি কঞ্চির বেড়ার ওপর চড়ে রুমাল নাড়াচ্ছিলেন। কাতিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল।

আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ প্রকাণ্ড হলে 'দৈব রক্ষাকর্তার' প্রাচীন আইকন হাতে নিয়ে নবপরিণীতদের অভ্যাগত জানালেন, তাদের আশীর্বাদ

করে সমবেত অতিথিদের সামনেই যৌতুক এনে হাজির করতে হুকুম দিলেন। টকটকে লাল সার্ট পরা চারজন ছোকরা মোহর-দাঁড়-করানো প্রকাণ্ড এক রূপোর রেকাবি বয়ে নিয়ে এল।

ভোলকভ বললেন:

'রাজকুমার, আমাদের নিন্দা করো না। যা আমাদের সাধ্য তাই দিচ্ছি।'

তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে বরবধূ দুজনে আলাদা আলাদা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর পোষাক বদলে আবার দেখা হল তাদের বাগানের মধ্যে। পুকুরের ধারে বসল তারা যতক্ষণ না গাড়ি তৈরী হয়। নিমন্ত্রিতরা ভীড় করে দাঁড়ালেন বারান্দায়, জানালার কাছে। চীৎকার করে বরবধূকে বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন। ভোলকভের চোখ ছলছল করতে লাগল। ভোজপর্ব চলল সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সন্ধ্যাবেলায় পাশের ঘরে অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল, যে ঘরে একমাস আগেও কাতিয়া ঘুরপাক খেয়েছিল চাঁদের আলোয়...

তখন বেশীর ভাগ ভদ্রলোকের আর নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, কাজেই মেয়েরা নিজেরাই একে অন্যের সঙ্গে নাচতে লাগল। হুল্লোড়ে ছোকরার দল সিগারেট খাবার আলাদা ঘরে জুটল আর সেখান থেকে হাসির হুর্‌রা শোনা যেতে লাগল। বুড়োরা বসলেন তাসের টেবিলে। রাত দুপুর নাগাদ অর্কেস্ট্রা-পরিচালক সমানে ছড়ি দিয়ে তাল দিতে দিতে সটান লম্বা হয়ে সামনের দিকে পড়ে গেলেন নাক থুবড়ে, বড় ঢোলকটা আঁকড়ে ধরে মেঝের ওপর গড়িয়ে গেলেন মড়ার মতো।

এইখানে নাচ হল খতম। মহিলারা তাঁদের মেয়েদের নিয়ে গাড়ি করে বিদায় নিলেন। ছোকরার দল এবং বিবাহিত ভদ্রলোকরা সেখানেই রাত কাটাতে রয়ে গেলেন, কেউ তাস খেলে, কেউবা সকাল পর্যন্ত

বাড়ির মধ্যে হৈহল্লা করে। বাগানে রতীশেভেরা গায়ের জোরের কসরত দেখাল। আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচের হুঁশ চলে গেছে অনেক আগেই, তিনি হয় ঝগড়ার মধ্যস্থতা করে, নয় তাসের টেবিলে বসে শূন্যদৃষ্টিতে তাস আর বাতিগুলোর দিকে তাকিয়ে সময় কাটাতে লাগলেন, সর্বক্ষণ কী যেন একটা মনে করবার চেষ্টায়।

ভোরের হাল্কা আলো ফুটল, জুলাই'এর গরম দিন এল — কিন্তু নিমন্ত্রিতরা শান্ত হলেন না। শুধু তৃতীয় দিনের দিন তাঁদের শেষদল ভোলকভো থেকে বিদায় হলেন। পাগলের মতো তাজা অস্থির ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন তাঁরা। একটা গাড়ি আর একটাকে ছাড়িয়ে ছুটেছে, ঘোড়ার গলার ঘণ্টা বেজে চলেছে। চাষাভুষোরা হকচকিয়ে মাথার টুপি খুলে অনেকক্ষণ ধরে ছুটে-চলা গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে চলেছে:

'দুত্তোর ভুঁড়িওলা শয়তান সব, ধূলো ওড়াচ্ছে দেখো!'

৩

ডাক্তার জাবোতকিন বেড়ার ওপর বসে নব দম্পতির দিকে রুমাল নাড়ছিলেন। অবশেষে সবকিছু সুরাহা হয়ে গেছে দেখে তিনি ভারী খুসী। এ কটা দিন গ্রিগোরী ইভানভিচের নিজের এবং দুনিয়াশুদ্ধ সকলের ওপর একটা আবেগময় খুসীর আমেজে কেটেছে। এই ভাবটা প্রথম আসে যখন সাশাকে মালীর ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে একটা তক্তপোশের ওপর শোয়ানো হল আর তিনি রইলেন একলা বসে ঘুমন্ত মেয়েটির পাশে।

কাঠের পিপের ওপর একটা বোতল, তার মধ্যে গোঁজা একটা শেষ হয়ে আসা বাতির আলোয় ঘরটার কাঠের দেওয়াল আলোকিত। কোণে কোণে মাকড়সার জাল, ভাঙা জানালা চক্‌চকে কালোরঙের

আইভিলতায় ঢাকা। সাশার গায়ে ঢাকা একটা ভেড়ার লোমের কোট; সে শুয়ে আছে দেওয়াল আর স্টোভের মধ্যিখানে পাতা বিছানার ওপর।

মাঝে মাঝে সে অসুস্থতায় কেঁপে উঠে কোটটা যেই টেনে নিচ্ছে অমনি তার নিরাবরণ পা বেরিয়ে পড়ছে, কখনও বা কোটের প্রান্ত পিছলে পড়ে যায়—তখন গ্রিগোরী ইভানভিচ উঠে যত্ন করে সেটা ঠিক করে দিচ্ছেন।

ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে তার মুখের দিকে তাকালেন তিনি—স্বপ্নেও শান্তশিষ্ট মুখটি। তাঁর মনে হল কোথায় যেন দেখেছেন সেই মধুর মুখখানিকে, ভালোবেসে ফেলেছেন। মন তাঁর প্রশান্ত। সারাদিনটার ঘটনাগুলো এখন স্মৃতিমাত্র। সেই ভাঙা কুঁড়ে আর ঘুমন্ত সাশা ছাড়া অন্য কোন জগতের কথা ভাবতেও যেন অদ্ভুত লাগে এখন।

গ্রিগোরী ইভানভিচ বাতির পাশে আবার বসে আলোটা হাত দিয়ে আড়াল করে সাশার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে লাগলেন। হঠাৎ ঝোপে জেগে ওঠা কোন পাখির পাতা খস্‌খস্‌ করার শব্দ, কিম্বা হঠাৎ মর্মরিয়ে ওঠা এ্যাস্‌পেন পাতার শব্দ কানে আসতে লাগল তাঁর। জানালা দিয়ে বাতাস এসে বাতির শিখাকে কাঁপিয়ে দিল। সাশার চোখের কোলে খেলে যাওয়া ছায়াতে মনে হচ্ছিল সে বুঝি ভুরু কুঁচকে আছে। গ্রিগোরী ইভানভিচের মনে হল শুধু এই গভীর গোপন অর্থপূর্ণ নিস্তব্ধতাকে ভালোবাসা তাঁর উচিত, উচিত সাশার মুখের ওপর পড়া ছায়ার মতো শান্ত আর কোমল হওয়া।

"কী দারুণ হতাশায়, কী যাতনা পেয়ে তবে সে একটি অভিযোগও না করে ছুটে গিয়েছিল পুকুরের জলে সব শেষ করে দিতে। এ যাতনার কাছে আমি কী? একটা হীন নগণ্য প্রাণী, একটা মশা," ভাবলেন গ্রিগোরী ইভানভিচ। "নিদারুণ ন্যক্কারজনক সুখী বড়লোকের কাছে আমার লালচে মুখখানা নিয়ে ঔদ্ধত্যভরে এসেছিলাম...

ছি-ছি, কী ঘৃণা। এদিকে জেগে উঠেই ও তো জিজ্ঞেস করবে, ও এখন বাঁচবে কী করে? কী জবাব দেব আমি? জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি ওর সেবা করব—এই হওয়া উচিত আমার জবাব। এই তো আমার পরিষ্কার সোজা কাজ পড়ে রয়েছে, জীবনে পাওয়া যাচ্ছে উদ্দেশ্য—এই রকম একটি মেয়ের সেবা করা, সবকিছু ভুলতে তাকে সাহায্য করা ...''

গ্রিগোরী ইভানভিচ খেয়ালই করেননি যে তিনি মনের কথা মুখে উচ্চারণ করছিলেন। সাশা নড়ে উঠতেই ফিরে তাকিয়ে তিনি দেখলেন সে বিছানায় ভর দিয়ে একটু উঠে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে ডাগর কালো চোখে। তাঁর কথায় ভয় পেয়েই হোক, সদ্য ঘটনার কথা মনে করেই হোক, কিম্বা অতিশয় দুর্বলতার জন্যই হোক, সে শুধু পাজোড়া টেনে নিয়ে, থুতনি পর্যন্ত কোটটা টেনে নিয়ে কাতরিয়ে উঠল।

গ্রিগোরী ইভানভিচ অমনি তার মাথার কাছে বসে চুলে হাত বুলোতে বুলোতে তাঁর সদ্য মনের কথা বলতে লাগলেন।

সাশা উত্তরে বলল, 'কর্তা, আপনি বরং আমার কাছ থেকে চলে যান। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু কিছুই চাই না আমার।' দুজনেই কাঁদতে লাগল, সাশা ডুকরে উঠে, ডাক্তার অনুকম্পার আনন্দে।

সরাইখানায় ফিরে যাবার পর সাশার প্রথম কয়েক দিনের ব্যবহারে মনে হল যেন সে সব ভুলে গেছে। গ্রিগোরী ইভানভিচ প্রত্যহ তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন তাকে কিছু সাহায্য করতে পারেন কিনা, সিগারেট মুখে অলিন্দে বসে থাকতেন। সাশা পাশ দিয়ে যাওয়া আসার সময় তাঁকে বলত বরং ভিতরে গিয়ে বসতে, কারণ উঠানে বড় পিশুর উপদ্রব। সারাক্ষণ সে কিছু না কিছু কাজ নিয়েই ব্যস্ত, হয় উঠানে নাহয় ঘরের মধ্যে কাজ। একদিন তিনি দেখলেন সাশা সবজি বাগানে

বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে স্তেপ্'এর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। মুখ প্রশান্ত, বিষণ্ণ চোখে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি, মাথায় একটা কালো রুমাল বাঁধা।

'আমি আর কোথাও চলে যেতে চাই। আর সহ্য করতে পারি না, সব সময় ভাবি,' বলল সে।

তৎক্ষণাৎ গ্রিগোরী ইভানভিচের মনে হল তাহলে তাঁর যেন বাঁচার কোন অর্থ নেই। এত আকুল, এত মনমরা হয়ে গেলেন তিনি যে এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারলেন না:

'সাশা, আমাকে যদি নেহাৎ ঘৃণা না কর, তাহলে বিয়ে কর আমায়।'

সাশার কেবল আবছা মনে পড়ে সে রাত্রে গ্রিগোরী ইভানভিচ তাকে কী বলেছিলেন। এখন সে বুঝতে পারল "তিনি অসুখী" এবং তাঁর দুঃখে দুঃখিত হল। তিনি ছোট শিশুর মতো প্রিয় হয়ে উঠলেন তার কাছে।

এখন সে রোজ ডাক্তারের কাছে ছুটে যায়। ঘর ধোয়, ঘরের জানালা দরজা ধুয়ে পরিষ্কার করে, কাপড় মোজা রিপু করে দেয়। নদীর খাড়া পাড়ের ওপরে ভেঙে পড়া স্নানের ঘরের স্টোভটা নিজে মেরামত করে দিল। তারপর ঘরটা গরম করে গ্রিগোরী ইভানভিচকে বলল বেশ করে বাষ্পস্নান করে নিতে। খুব ভাল করে স্নান করে ক্লান্ত এবং খুশী হয়ে ফিরে তিনি দেখলেন সাশা সামোভার নিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে—ঘরদোর পরিচ্ছন্ন, সদ্য ধোওয়া মেঝের গন্ধ উঠছে, তার সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে ঘাসের আর এক কোণে জ্বলন্ত বাতিটা থেকে পোড়া মোমের গন্ধ।

কিন্তু যখনই বিয়ের কথা তুলতেন তখনই মাথা নেড়ে সে বলত, 'তার দরকার আমাদের নেই, গ্রিগোরী ইভানভিচ। বিয়ে করা হবে পাপ, অন্যায়।'

তারপর সে দেখতে পেল যে তাঁর ঘুম ঠিকমতো হচ্ছে না, কষ্ট হচ্ছে তাঁর। কখনও হঠাৎ তার গা ছুঁলেই শিউরে ওঠেন। এই দেখে সে রাজী হল।

কান্নায় ভেঙে পড়ল সে, কিন্তু রাজী হল। মানুষের সাধারণ তাগিদের বিরুদ্ধে সে যায় কী করে। এই ব্যাপারে ফাদার ভাসীলী খুব খুসী হলেন, তিনিই তাদের বিয়ে দিলেন গ্রীষ্মের শেষে। বিয়েতে তিনি তিন গেলাস ভোদ্‌কা খেয়ে নাচলেন পর্যন্ত। গ্রিগোরী ইভানভিচ হাততালি দিতে লাগলেন আর ফাদার ভাসীলী পা ঠুকে চীৎকার করলেন, 'ঘুরে ঘুরে ঘরের চারিদিক, ঘুরে ঘুরে স্টোভের চারিধার…'

৪

দুটো বিয়েতে মনে হল গ্রীষ্মের শেষটা ভালোয় ভালোয় হয়েছে। গ্রিগোরী ইভানভিচ আর সাশা তাঁদের ছোট কুঁড়েঘরে বাস করতে লাগলেন যতদিন না জেম্‌স্তভোর নতুন হাসপাতাল তৈরী হচ্ছে।

সাশা সরাইখানাটা ভাড়া দিয়ে তার সমস্ত সময় স্বামীর সেবায় নিয়োজিত করল। চেষ্টা করত তাঁর মনের কথা বুঝতে, তাঁকে খুসী করতে, যেন তার গেঁয়ো চেহারায় তাঁর বিরক্তি না আসে। যদিও গাঁয়ের সবাই বিয়ের পর থেকেই তাকে ''ডাক্তার-গিন্নী'' বলে ডাকতে আরম্ভ করল, সে কিন্তু তার মাথায় বাঁধা রুমাল আর কালো ছিট-কাপড়ের পোষাক ছাড়ল না। গ্রিগোরী ইভানভিচ সব বুঝলেন, তাই বদলাবার কথা বলতেন না। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যে বেলায় তাকে চেঁচিয়ে পড়ে শোনাতেন, একটিও কাজ কিম্বা চিন্তা তার কাছে লুকোতেন না, যাতে দুজনে একপ্রাণ একমন হতে পারেন।

কুমার আর শ্রীমতী ক্রাস্নপোল্‌স্কী ইউরোপ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন আর নানান সহর থেকে বাড়িতে পোস্টকার্ড পাঠাতে লাগলেন

ভোলকভকে তাক লাগিয়ে দিয়ে,—বেচারীর ভূগোলের জ্ঞান বেশী দূর ছিল না। আজ হয়ত একটি চিঠি এল ইটালী থেকে, কাল আর একখানা ফ্রান্স থেকে। "পিশুর মতো লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ওরা," বলতেন তিনি কন্দ্রাতীকে। সে নম্রভাবে জানাত, "হ্যাঁ..."।

ফসল ঘরে ওঠার পর আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ লাগলেন কুমারের "মীলয়ের" বাড়িটা চেলে সাজাতে। একদল চূণকাম করা মিস্ত্রী, কাগজ-মিস্ত্রী, ছুতোরমিস্ত্রী উঁচু উঁচু হলগুলোতে ঠকাঠক্ হাতুড়ি ঠুকতে লাগল। বাড়িময় আঠা, চূণ আর কাঠের কুচির গন্ধ ছুটল। ভোলকভ নিজে সকাল বেলায় "মীলয়েতে" গিয়ে রীতিমতো এমন চেঁচামেচি লাগাতেন যে মজুররা তাঁর নাম দিল "কামানদাগা হুজুর"। তারা কিন্তু মোটে ভয় পেত না তাঁর হাঁকডাকে।

সেপ্টেম্বরের শেষে, যখন প্রাদেশিক ঘোড়ার মেলা দিয়ে সারা জেলা জেগে ওঠে, সান্ধ্য-পার্টি, শিকার-পার্টি আর বিয়েবাড়ির হিড়িক লাগে তখন ওরা দুজন ফিরবে আশা করে আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ "মীলয়ের" মেরামতির কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করালেন। হঠাৎ চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেল। "মার্কিন দেশে চলে যায়নি ত?" ভাবলেন ভোলকভ। কিছুদিন পরেই তিনি একটা টেলিগ্রাম পেলেন, "আসছি, কাতিয়া"।

আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ হৈচৈ লাগিয়ে দিলেন। সাদা ধবধবে তিনটে সবচেয়ে ভাল ঘোড়া বেছে (এগুলো মেয়ে জামাই ফিরলে তাদের উপহার দেওয়া হবে) অনেকক্ষণ ধরে দোটানায় পড়ে গেলেন। স্টেশনে নিজে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছা তাঁর কিন্তু নিজেকে সংবরণ করে শুধু কোচওয়ানকে কড়া হুকুম দিলেন তার কপালে টোকা মেরে মেরে বুঝিয়ে, "ভাল করে শোন্ যা বলছি; হাওয়ার মতো উড়ে চলে যা। রাজকুমার রাজকুমারীকে বাড়িতে পৌঁছে

দিয়েই ঊর্ধশ্বাসে ফিরে আসবি। আর বলতে ভুলিস না যেন, ঘোড়াগুলো ওদের উপহার।" ঘোড়াগুলো পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতেই আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন, মনভার করে জানালার ধারে বসে পড়লেন। কী কারণে জানি না। তাঁর দুঃখ হতে লাগল মেয়ে কাতিয়ার জন্য। "বড্ড তাড়াতাড়ি ওর বিয়েটা দিয়ে ফেললাম। এত চমৎকার মেয়েটা, নম্র চেহারা... তখন আমি ভাবছিলাম কী, ছাই! হায় ভগবান, যা হওয়া উচিত ছিল কিছুই হয়নি... ওর কি ঐ রকম স্বামী পাওয়া উচিত ছিল?..."

কোচওয়ান সন্ধ্যাবেলায় ফিরল কুমারের আস্তাবলের একটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে। অলিন্দের কাছে ঘোড়া থেকে নেমে সোজা চলে এল আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচের কাছে। উত্তেজনায় তাঁর সর্বশরীর কাঁপছে তখন...

'তারপর? নির্বিঘ্নে পৌঁছেছে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঈশ্বরের ইচ্ছায় — নির্বিঘ্নে পৌঁছেছে।'

'ওদের বেশ স্ফূর্তি দেখলি তো?'

'হ্যাঁ, ভগবানের ইচ্ছায় সবই ভাল...'

'কুমার কেমন আছেন?'

'আমি... মানে... আমি তাঁকে দেখতে পাইনি।'

'বলিস কী রে। তাঁকে দেখতে পাসনি কী রকম? কথা কচ্ছিস না যে?... বল্, নইলে তোর মাথা ভাঙব।'

'আজ্ঞে, কুমার আসেননি। দিদিমণি একাই এসেছেন।'

আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ খালি হাঁ করে রইলেন। কম্প্রাতী বাতি হাতে নিয়ে আসতে চেয়ারে বসে বসেই ভোলকভ তার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন:

'কন্দ্রাতী ইভানভিচ, কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে...'

'কী গণ্ডগোল হয়েছে?'

'এখনি সেখানে চলে গিয়ে খোঁজ নাও... হায় ভগবান... আমার অন্তর বলছিল...'

৫

একাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনা সত্যিই একা ফিরেছিল, স্বামী ছাড়া। নায়েব তাকে অভ্যর্থনা করতেই সে ড্রইং-রুমে গিয়ে বেড়াবার কোট, টুপি আর ওড়না খুলে জানালায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল বাগান, বাড়ির নীচে ভোল্‌গা আর নদীর ওপারের মাঠগুলো। বহুক্ষণ জানালা দিয়ে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফিরে তাকাল নায়েবের দিকে। সে তখন যাতে ভুঁড়িটা বড্ড বেশী বেরিয়ে না পড়ে তাই নীল কোর্তাটা যতটা পারে এঁটে বিনীতভাবে অপেক্ষা করছিল।

'কুমার পরে আসবেন,' বলে আরম্ভ করল সে ভ্রূ কুঁচকে। 'তিনি কাজে আটকে পড়েছেন। আপনি আমাকে বাড়ির সমস্ত ব্যাপারের হিসেবনিকেশ দেবেন আর সমস্ত হিসেবের খাতা আমাকে দেখাবেন...'

'আজ্ঞে আপনি প্রথমে বাড়িটা দেখবেন, না হিসেবের খাতা?' জিজ্ঞেস করল নায়েব।

'হিসেবের খাতা পরে আনবেন,' বলে সব ঘরগুলো ঘুরে দেখতে লাগল কাতিয়া, প্রশ্ন করতে লাগল কোনটা কুমারের পড়বার ঘর, কোনটা শোবার, কোথায় বসতে তিনি সব চেয়ে ভালোবাসতেন...

একতলার হলগুলো উঁচু উঁচু আর ঠাণ্ডা। কাতিয়া ওপরতলায় কুমারের ঘরগুলো একনজর দেখেই হুকুম দিল খাবার ঘর ছাড়া ওপরে নীচে আর সমস্ত ঘর বসন্তকাল আসা পর্যন্ত তালা দিয়ে রাখতে। নিজের জন্য সে পছন্দ করল একটি ছোট হল যার জানালাগুলোতে রঙীন

সার্শি দেওয়া আর যেখানে একটা পিয়ানো দাঁড় করানো। তার পাশের ছোট ধবধবে ঘরটিকে সে করল শোবার ঘর। সেখানে রইল তার বিছানা আর হাত মুখ ধোবার জায়গাটা, সেগুলো রাখা হল গম্বুজের মতো গোল টালিছাওয়া স্টোভের পাশে...

নায়েব জুতোর মস্‌মস্‌ আওয়াজ করে চলে যেতে কাতিয়া ড্রইং-রুমে ফিরে থামগুলোর পিছনে একটা টেবিলের পাশে বসল তার ওপর ঝুঁকে। আয়নার মতো চকচকে টেবিলটাতে ছায়া পড়েছিল তার কনুই অবধি আস্তিন পরা সুন্দর হাত দুটির। আঙুলে আঙুল জড়িয়ে তার ওপর মুখটি রেখে আবার সে তাকাল বাগান নদী আর মাঠের দিকে।

তার মুখ আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছে। চুলের ঢাল আরো কালো দেখাচ্ছে। সেগুলো মাথায় বেড়া-বিনুনি করে বাঁধা। তার কালো রঙের, গলায় লেস দেওয়া বেড়াবার পোষাকটা দেখতে কড়া আর গরম। এ পোষাক সেই মেয়ের জন্য যে নিজের শান্তির ব্যাঘাত করে আচম্বিতে নড়াচড়াও করবে না বা একটিও বিপজ্জনক চিন্তাকে মনে ঠাঁই দেবে না।

বাইরে বাগানে গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ছে। ফার গাছগুলোর কালো মূর্তির ফাঁকে ফাঁকে নুয়ে পড়া পাতলা হয়ে যাওয়া বার্চগুলোতে নরম হলদে রঙের ছোপ, আকাশ উঁকি দিচ্ছে তাদের সরু ডালের ফাঁক দিয়ে। বনের খোলা জায়গায় বুড়ো মেপ্‌ল্‌ গাছটা ডালপালা ছড়িয়ে লাল টক্‌টকে দেখাচ্ছে, যেন তখনি নিঝুম বিষণ্ণ ঘুমে চলে পড়বে। লিণ্ডেনগুলো তখনও সবুজ কিন্তু উঁচু পপ্‌লারগুলো একেবারে ন্যাড়া। তাদের তামাটে পাতায় পথ আর ছাঁটা ঘাস ঢেকে গেছে। বাগানটার জৌলুষ শেষ হয়ে আসছে, নীল নদীর ওপর একটা খেয়ানৌকা আস্তে আস্তে আসছে, এই দৃশ্য দেখতে দেখতে কাতিয়ার মনে হল এই হচ্ছে আগামী দীর্ঘ দিনের প্রশান্তির আরম্ভ।

বিগত তিনমাসের কথা সে মনে আনবে না বলে দৃঢ়সঙ্কল্প — সে চায় সেই স্মৃতিকে তালা দেওয়ার মতো করে রেখে বুদ্ধি আর কঠিন শাসনে নিজের জীবনকে নিয়মিত করতে।

অর্ধেক খোলা জানালা দিয়ে বাতাসের সঙ্গে বয়ে আসা মুমূর্ষু বাগানের গন্ধ নাকে আসতে সে টের পেল তার গালে উষ্ণ জলের ফোঁটা।

'না, এ চলবে না,' বলল সে নিজেকে। 'যা স্থির করেছি তা করবই।'

চকিতে মুখ ফিরিয়ে রুমাল খুঁজল। উঠে হাতব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে আঙুলে খানিক সুগন্ধি ঢেলে নিয়ে কপালের দু'পাশে ঘষে ঘণ্টা বাজাল। চাকর আসতে তাকে বলল ব্যাগ থেকে চিঠি লেখার সরঞ্জাম নিয়ে আসতে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। এই সময়টাকেই কাতিয়ার সবচেয়ে বেশী ভয়। জানালার দিকে পিছন ফিরে রইল সে যতক্ষণ না আলোগুলো জ্বালানো হল। চাকর ফিরে এল চিঠি কাগজের লাল মরক্কোবাঁধাই ফাইলটা নিয়ে। তারপর চেয়ারে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের উপরকার ঝাড়টার বাতিগুলো জ্বেলে দিল একে একে।

অমনি নরম আলো ছড়িয়ে পড়ল ছাদের পলস্তারা করা কারুকার্যের ওপর, সাদা দেওয়ালের ওপর। থামের পিছনের নীলচে ছায়াগুলো দূর হয়ে সেগুলোর সোনালি কাজ করা মাথাগুলো ঝক্‌ঝক্ করে উঠল।

কাতিয়া বড় টেবিলটার পাশে বসে একটু ভাবল, তারপর লিখল:

"আলেক্সেই, আমি আপনাকে ক্ষমা করছি। বাড়ি আসার পথে আমি অনেক ভেবে স্থির করেছি যে আপনাকে আমার সঙ্গে বাস

করতেই হবে। আমার শান্তির জন্য সেটা অবশ্য প্রয়োজনীয়। আমরা থাকব ভাইবোনের মতো, বন্ধুর মতো।"

নিজের লেখাটা পড়ে পার্কেট করা মেঝেতে গোড়ালি ঠুকে খড়খড়ে কাগজটা সে তুলে ধরল সেটা ছিঁড়ে ফেলবার জন্য। কিন্তু আবার মত পরিবর্তন করে খামে ভরে সেটা এঁটে দিল।

ঠিক সেই সময়ে ঘরের প্রান্তে ওককাঠের উঁচু দরজাটা ধীরে ধীরে ফাঁক হয়ে একটি বলিরেখাঙ্কিত পরিষ্কার কামানো মুখ দেখা গেল।

'কন্দ্রাতী।' চেঁচিয়ে উঠল কাতিয়া।

কন্দ্রাতী ডুকরে উঠে তার দিকে দৌড়ে গিয়ে তার কাঁধে চুমো খেল।

বুড়োর রগে হাত দিয়ে তাকে চুমো খেয়ে একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা বলল, 'সুখে থাকো ভাই। বাড়িতে সবাই কেমন আছে? বাবা কেমন আছেন?...'

'প্রাণের কাতিউশা আমার, তোমাকে আবার কবে দেখব ভেবে আমরা অস্থির হয়েছিলাম, আমাদের মতো বুড়োদের আর আছে কী? আমরা কেবল তোমার কথাই ভেবেছি।'

'সত্যি? আমিও তাই ভেবেছিলাম। অবিশ্যি আমার যাওয়া উচিত ছিল সোজা বাবার কাছে, কিন্তু এখানেই চলে এলাম। আমার বড় খারাপ লাগছিল কন্দ্রাতী।'

'কুমার কোথায়?' চুপিচুপি শুধোল সে।

'আমি জানি না কন্দ্রাতী, আমি কিছুই জানি না। আমার একটু রাগ হয়েছিল।'

ব্যাগ থেকে আবার রুমাল বের করে সে কেঁদে উঠল। কন্দ্রাতী তার মাথা ছুঁয়ে মুখের দিকে তাকাল। কাতিয়া বলল:

'কন্দ্রাতী, আমার স্বামী আমাকে যে ছেড়ে চলে গেছেন।'

'কী সর্বনাশ!..'

একটু শান্ত হয়ে সে যা যা ঘটেছে সব তাকে বলল। অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না কন্দ্রাতী। তার থরথর করে কাঁপা ঠোঁটে ঠোঁট চাপা। অবশেষে আঙুল উঁচিয়ে বলল সে:

'এইরকম লোক সে তাহলে! না, কাতিউশা, এ কাজ করে সে পার পেয়ে যাবে না।'

''নীলয়েতে'' রাত কাটাতে চাইল না কাতিয়া। প্রায় মাঝরাতে সে আর কন্দ্রাতী গাড়ি চড়ে ভোলকভোতে ঢুকল। বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছেই সেই পুকুরগুলো আর পাখির বাসাগুলোর চেনা গন্ধে কাতিয়ার উত্তেজনার শেষ নেই। গাড়ির আলোতে দেখা যাচ্ছে খাদের ওপরে পায়ে-চলা পথটা, অলিন্দের পাশে গোলাঘরের কোণটা (কত সরু আর ছোট মনে হচ্ছে অলিন্দটাকে)। বাড়ির প্রথম দুটো জানালায় আলো। তার একটাতে কাতিয়া দেখতে পেল তার বাবা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছেন।

'শোনো, একটি কথাও ঘুণাক্ষরে বলো না, বুঝেছো?' তাড়াতাড়ি কন্দ্রাতীর কানে কানে বলল সে, তার জামার হাতাটা টেনে।

৬

আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ ড্রেসিং গাউনটা ধরে সদর দরজা অবধি ছুটে সোজা মেয়ের কাছে এসে যখন জিজ্ঞেস করলেন, ''মাগো, আমার চোখের মণি, কী হয়েছে বল্ ত?'' তখন কাতিয়া মিথ্যা করে তাঁকে বলল যে কুমারকে বিশেষ কাজে সেণ্ট-পিতার্সবুর্গে আটকে যেতে হয়েছে।

ভোলকভ তার কথা বিশ্বাস করলেন — অবিশ্বাস করা তাঁর স্বভাব নয়; চালাকি তিনি বুঝতেন না। কুমার কী কাজে আটকে গেছেন তার বিস্তারিত বিবরণও জানতে চাইলেন না — পরের কাজ নিয়ে বেশী জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে মাকড়সার জালে মৌমাছি আটকানোর মতো জড়িয়ে পড়া সম্ভব।

তখন থেকেই তিনি কাতিয়াকে ছোট্ট রাজকুমারী বলে ডাকতে আরম্ভ করে তাকে নিয়ে গেলেন ছোট খাবার ঘরটায়, যেখানে প্রকাণ্ড এক সামোভার থেকে ধোঁয়া উঠছিল ছাদ অবধি।

'বাস্তবিক কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে কাতেরীনা — ঠিক বড় ঘরের মেয়ের মতো,' এই বলে আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ মেয়ের কাঁধদুটো ধরে তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। নিজের হাতে তার জন্য চা ঢেলে সঙ্গে কত রকম খাবার দিলেন খেতে। কাতিয়ার চোখ ছলছল করল, কিন্তু জোর করে চোখ চেপে সে অশ্রু রোধ করল।

'তোকে ছেড়ে আমার যে কী কষ্ট গেছে!' বলে চললেন তার বাবা। 'জানিস তো, একলা থাকার অভ্যাস আমার একেবারে গেছে... কোথাও যাই না। সবাই আমার ওপর চটা। তাছাড়া আর এক বিপদ। একটা স্টীম এঞ্জিন কিনেছিলাম। সেটাকে টেনে কলিভাঙ্কা নদীর ওপর আনতেই পুল ভেঙে সেটা জলে পড়ে গেল। চোঙাটা এখনও জলের ওপর বেরিয়ে আছে। তা, তোর দেশ বেড়ান কেমন লাগল? আমি তোদের বলতাম দুটো পিশু। আরে, কুমার আছেন কেমন? ও হ্যাঁ, তোর পুরোনো বিছানাতেই শুবি তো? পথের কষ্টে তুই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিস বুঝি। বুঝলি কাতিয়া, আমি তোকে দেখে ভারী খুশী হয়েছি।'

চা খাওয়ার পরে বক্‌বক্ করতে করতে আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ তাঁর মেয়েকে তার কুমারী বেলাকার পুরোনো ঘরে নিয়ে এলেন। কাতিয়ার দুঃখ উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। বাড়ি আসার পথে তার প্রাণে এত

আনন্দ হয়েছিল, কিন্তু তার বাবা, তাঁর কথাবার্তা আর চারপাশের সবকিছু যেন হঠাৎ ঝাপ্‌সা হয়ে গেল। সে কি এরি মধ্যে এ সবে অনভ্যস্ত হয়ে গেছে, না শুধু বয়স বেড়েছে তার? সেই পর্দাফেলা দরজায় দাঁড়িয়ে যখন তার বাবাকে রাত্রের মতো বিদায় জানাল, তখনি আগের চেয়ে বেশী করে বুঝতে পারল যে সে একেবারে একা আর এ নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার জন্য সে কিছু করতে পারে না।

তার ঘরের কিছুই বদলানো হয়নি। ঘরে ঢুকে তার ড্রেসিং টেবিল, তার কারেলীয় বার্চের কাঠের আরামচেয়ার, বিছানা, এমনকি কার্পেটের ওপর রাখা তার চটি জোড়া দেখে তার বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল। কিন্তু আগের সেই আরাম, সেই সেণ্টের সুগন্ধ, সেই ঠাণ্ডা জল পড়ে সোঁদা গন্ধ সেখানে আর নেই। অনেকদিন কেউ এ ঘরে বাস না করায় ঠাণ্ডা ঘরটা তার শরীর হিম করে দিল যখন সে জামাকাপড় খুলে বিছানায় বসে অন্ধকার জানালার দিকে তাকিয়ে রইল।

মনে হচ্ছিল যেন অন্য একটি কাতিয়া থাকত এখানে, একটি সুখী সে মেয়ে যে মরে গেছে, যার জন্য এখন তার খুব দুঃখ হচ্ছে। আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচের কথা ভেবেও তার দুঃখ হল। তিনি তাকে খুশী করতে এত ব্যগ্র! ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন তাকে নিয়ে, ছোটখাট ব্যাপারের কত গল্প করছেন, এখন অবশ্য নিজেকে অপমানিত বোধ করছেন কারণ সে কোন কিছুতে উৎসাহ দেখায়নি, রাত্রের বিদায়ের সময় তাঁকে চুমো না খেয়েই সোজা এত তাড়াতাড়ি শুতে চলে এসেছে। নিশ্চয় তিনি পড়ার ঘরে বসে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।

কাতিয়া উঠে একবার ভাবল তার বাবার কাছে গিয়ে বলে যে সে তাঁকে খুব ভালোবাসে এবং নিজেও একটু স্নেহ চায়। কিন্তু আবার মাথা নেড়ে ঠাণ্ডাহিম বিছানার চাদরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

"কপাল খারাপ যে আমার একটি ছোট বোন নেই," ভাবল সে। "আমি তাহলে তাকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে তার আদুরে চুলে চুমো খেয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতাম, 'মেয়েমানুষের জীবন কী ভয়ঙ্কর কঠিন'।"

পরের সমস্ত দিনগুলো কাটতে লাগল চুপচাপ শান্ত বিষণ্ণতায়। কাতিয়া ধীরে ধীরে বাড়িময় ঘুরে বেড়ায়, মুখে হাসি টেনে বাবার কথা শোনে। তাঁর মেজাজ এখন খুব খোশ হয়েছে, ওকে দেখাতে থাকেন তাঁর সমস্ত গোছ করা চিঠিপত্র আর তাঁর সর্বশেষ খেয়াল— ডায়েরিগুলো। বাগানের বেঞ্চে বসে সে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে একটা শুকনো পাতা মাটিতে পড়বার সময় মাকড়সার জালে আটকে গিয়ে দুলছে—পড়তে পারে না, ঘননীল আকাশের গায়ে গাছগুলোকে সোনার মতো দেখাচ্ছে, ঠিক যেমন দেখায় গরম হেমন্তের স্বচ্ছ শুকনো দিনে।

তারপর সে ফিরে গেল "মীলয়েতে"। বাবার কাছ থেকে আসল কথাটা লুকিয়ে রাখা বেজায় শক্ত হয়ে পড়ছিল। সময় কাটতে লাগল একটানা একঘেয়েমির মধ্যে, বিশেষত্বহীন তার গতিকে ব্যাহত করার মতো কিছুই ঘটে না। আশপাশের জমিদাররা তরুণী রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন বটে, কিন্তু তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা অসুস্থ।

এতে জমিদারদের রাগ হল। এ দিকে ৎস্যুরিউপা তলে তলে নানা গুজব রটাতে আরম্ভ করল।

৭

কাতিয়া তার স্বামীর উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল। চিন্তা আর একঘেয়েমির হাত এড়াবার জন্য সে রোজ জমিদারী টহল দিতে বেরোত একটা ধূসর ফার লাগানো ভেলভেটের কোট পরে।

হেমন্ত আসছিল। সকালবেলায় হলদে ঘাসের ওপর হিমকণা জমে সেগুলোকে দেখাত ঘুঘুপাখির গায়ের রঙের মতো। অনেকক্ষণ ধরে কণা রইত ছাদের ঢালুতে, কূয়োর পাড়ে, যে কূয়োর অনেক নীচে থেকে পলির গন্ধওয়ালা বরফের মতো ঠাণ্ডা জল তুলে ঢালা হত পাশে দাঁড় করানো কাঠের পিপেতে, আর থাকত রেলিঙে এবং গাছের পাতায়।

প্রত্যহ সকালে কাতিয়া আস্তাবলে যেত। আস্তাবলের সহিসেরা তার প্রশ্নের চটপট জবাব দিত তার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে যেন সে ছোট মেয়ে। নায়েব তাকে জমিদারী তদারক করে ঘোরাফেরা করতে দেখলেই দূর থেকে সেলাম করে চাবিগুলো খুব ঝন্‌ঝনিয়ে ভাঁড়ারের কোথাও যেত (কাতিয়া নায়েবকে পছন্দ করল না, আর সেও নিজেকে অপমানিত বোধ করছিল যেহেতু কাতিয়া কখনও তাকে তার সঙ্গে এক টেবিলে খেতে ডাকেনি)। ভেড়ার রাখালের কাছে সে ভেড়াগুলোর খবর নিত—রাতের বেলায় নেকড়েবাঘে একটাও টেনে নিয়ে গেছে কিনা,—গোবরের লেপ দেওয়া খোঁয়াড়ে উঁকি দিত। গরুর দোহালনী টুলে বসে গাই দুইছে, গরম দুধ সশব্দে পড়ছে ঝনঝন করা বালতিতে—সে তখন গরুর বাঁট ছেড়ে দিয়ে হাত দিয়ে মুখ মুছে মাথা নামিয়ে অল্পবয়সী কর্ত্রীকে নমস্কার করত। একদিন সে কাতিয়াকে জিজ্ঞেস করল তার বয়স কত। বয়স বলাতে সে তাকে "দিদিমণি" আর "লক্ষ্মী-মেয়ে" বলে ডাকল।

চাকরদের ঘরের কাছে আটজন মেয়ে-মজুর ছোট গামলায় বাঁধাকপি কুচিয়ে চলেছে। সারাদিন তাদের কুচোন ছুরি চলেছে খচ্‌খচ্‌ করে। বাঁধাকপির মাথাগুলো পাশে একটা তেরপলের ওপর পড়ে আছে; দুটো নোংরামুখো ছেলে উবু হয়ে বসে ধারাল দাঁত দিয়ে ঠাণ্ডা কপির ডাঁটাগুলো চিবিয়ে চলেছে।

মেয়েগুলো কর্ত্রীঠাকরুণকে দেখতে পেয়ে তার দিকে তাদের গোলাপী রঙের মুখগুলো ফিরিয়ে সবাই মিলে ফিস্‌ফিস্‌ করতে লাগল। কাতিয়া গামলাটায় উঁকি মেরে কপির মিষ্টি একটু একটু রসুনের মতো গন্ধ শুঁকে তাদের জিজ্ঞেস করল, অনেক কেটেছে কিনা। তারপর হাসিমুখ স্বাস্থ্যে ভরা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল:

'তোমাদের কারো বিয়ে হয়নি এখনও?'

'ঐ ত ফ্রোস্‌কা বিয়ে করতে চায়, কিন্তু ছোঁড়াগুলো ওর ট্যারা চোখ দেখে ভয়ে সব পালিয়েছে। তাদের ভয় ও অন্ধকারে স্বামীকে চিনতেই পারবে না।'

ফ্রোস্‌কা দেখতে খারাপ। সে বেচারীকে নিয়ে ঠাট্টা করে তারা সবাই খুব একচোট হেসে নিল। সেখান থেকে চলে যেতে যেতে মনের দুঃখে কাতিয়া ভাবল আবার তাকে দিন কাটাতে হবে একা।

বাড়ি ফিরে হাত দুটো পিছনে রেখে ঘরের এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করল, স্টোভের পাশে বসল গরম টালিগুলোতে পিঠ আর মাথা ঠেস দিয়ে, জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল যেখানে তুষারভরা মেঘ উড়ে আসছিল উত্তর থেকে।

বরফ পড়ল হঠাৎ। সকালেই ঢেকে গেল ঘাস, বাগানের বেঞ্চ, গাছের গুঁড়ির ওপর জমল পুরু গদির মতো। গাছগুলো হিমকণায় সাদা। উঁচু ঘরগুলোতে এল ঠাণ্ডা সাদা নরম আলো। স্টোভগুলোতে আগুন জ্বালানো হল। মেঝেতে পাতা হল সরু মাদুর। বাইরের দরজার কাছে পড়ল ফেল্টের জুতোর ছাপ।

সকালে উঠে সেই ঝকঝকে সাদা আলো, জানালার ধারিতে বরফ আর স্টোভের গন্‌গনে আগুন কাতিয়ার এত ভাল লাগল যে সে তাড়াতাড়ি ফারকোট আর জুতো পরে কাঁচের দরজা খুলে ছুটে গেল বাগানে।

ঠাণ্ডায় গাল চড়চড় করছে। বরফে গভীর হয়ে পড়ছে তার জুতোর দাগ, একেবারে জমে যাওয়া ঘাস পর্যন্ত। মুঠো করে বরফ তুলে নিয়ে কাতিয়া হেসে উঠল:

'চমৎকার, হে ভগবান, অদ্ভুত ভালো।'

যেন এই তুষারের রাশি, পাহাড়ের ঢালুর দিকের পিছন থেকে উঁকি দেওয়া বরফঢাকা নিশ্চল সাদা রৌদ্রোজ্জ্বল গাছগুলো তার মনকে বলতে লাগল, তার দুঃখের অবসান হবে।

তোলকভোতে থাকতে সে যেমন করত তেমনি বরফঢাকা মসৃণ ঢালু জায়গা বেছে নিয়ে কোট আর স্কার্ট এঁটে পায়ে জড়িয়ে নিয়ে বসে সরসরিয়ে পিছলে নামল নদী পর্যন্ত। হেসে উঠে আবার ঢালু দিয়ে উঠতে গিয়ে দেখল হাঁপিয়ে পড়েছে, তাই হেঁটে গেল জল পর্যন্ত। তীরের কাছে নদীর জল জমে গেছে, কিন্তু মাঝদরিয়ায় কালচে তেলা জল কুলকুল করে বয়ে চলেছে ফেনা ভাসিয়ে নিয়ে। ঠাণ্ডায় শিউরে উঠে কাতিয়া গাছের তলায় বসল নদীর দিকে মুখ করে। তারপর ওপরে একটি কুকুর ডেকে উঠল। একটা চাকর তাকে হাঁক দিয়ে ডাকল প্রাতরাশ খাবার জন্য।

কুকুরের ডাক শুনে একটা খরগোশ কাছাকাছি একটা ঝোপ থেকে লাফিয়ে বেরোতেই একতালের মতো কুকুরটা পড়ল ঢালুপথে সেটাকে তাড়া করে। তাই দেখে কাতিয়া আবার হেসে উঠল।

সেই দিনটা সবকিছুতেই কাতিয়ার বড় আনন্দ। সে অপেক্ষা করে রইল তার বাবা স্লেজে আসবেন এই আশায়। কিন্তু তিনি এলেন না। কাতিয়াকে একাই সন্ধ্যাটা কাটাতে হল স্টোভের ধারে আরামচেয়ারে বসে।

হয় সে ঠাণ্ডায় অতিরিক্ত কাটিয়েছে বলে মাথা ধরেছে, নয় তো স্টোভটাই অতিরিক্ত গরম করা হয়েছে, যে কোন কারণে কাতিয়া

দেখল তার একটু ঠাণ্ডা লেগেছে। পিঠটা উপর থেকে নীচে অবধি ঠক্‌ঠক্‌ করছে, গাল দুটো হয়ে উঠেছে গরম আগুন... আরামচেয়ারে আরো চেপে বসে আগুনের দিকে চেয়ে তার মুখে হাসি ফুটল, পায়ের ওপর পা দিল সে... আলেক্সেই পেত্রোভিচকে মনে পড়ল তার, যখন প্রথমবার—সেটা ছিল মস্কোতে—তিনি তাকে চুমো খেতে খেতে জেদে পাণ্ডুর হয়ে গিয়ে এমন সবকথা বলেছিলেন যা তার এই নিঃসঙ্গতার সময়ে চিন্তা করা পর্যন্ত চলবে না।

তক্ষুণি খেয়াল ফিরতেই কাতিয়া উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু মধুর আচ্ছন্ন করা ক্লান্তি তাকে নড়তে দিল না, মনে নানা স্মৃতি আর উন্মাদনাময় গন্ধ দ্রুত মেলে ধরেছে, যেন কেউ তার চোখের সামনে আলো জ্বালাতে আর নিবোতে আরম্ভ করল নানা ছবি দেখিয়ে—এতদিন ধরে কঠিন সংযমে জোর করে যে সব বন্ধ রাখা ছিল। খুব চেপে চোখ বন্ধ করে বুকে হাত রেখে রইল সে, স্বপ্নের রাশি তাকে ঝলসে দিয়ে তার চোখ ধাঁধাল তুষারঝড়ের মতো।

৮

পুরোপুরি শীত এসে গেছে। সোঁ সোঁ করে তুষারঝঞ্ঝা বয়ে চলেছে জমে যাওয়া নদীর ওপর দিয়ে, পাতাহীন উইলোর ঝোপের মধ্যে দিয়ে, মাঠের ওপর ঘূর্ণি ছড়িয়ে, জমে যাওয়া ঝোপঝাড়, খড়ের গাদা, স্তেপের মধ্যে পতিত পথচারীর গা বরফে ঢাকিয়ে।

এই শীতকালটায় গ্রিগোরী ইভানভিচ অনেক পড়লেন সেণ্ট-পিতার্সবুর্গ থেকে বই আর পত্রিকা অর্ডার দিয়ে আনিয়ে। প্রথমে পত্রিকাগুলোর প্রবন্ধগুলি আরম্ভ করলেন। কোন কোন লাইন পেন্সিলে দাগ দিয়ে সে সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করলেন। তারপর গল্পগুলো পড়ে

শোনালেন সাশাকে, খুঁজতে লাগলেন এই প্রশ্নের উত্তর —কেমনভাবে বাঁচা উচিত?

গ্রীষ্মকালে তাঁর ত্যাগস্বীকারের পর গ্রিগোরী ইভানভিচ কিছুটা শান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তা বেশী দিনের জন্য নয়। এ ত্যাগকে বলতে গেলে প্রকৃত ত্যাগ মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল বরং আনন্দভোগ। তিনি চেয়েছিলেন কিন্তু অনেক কিছু।

তখন ছিল ওলটপালটের সময়, আগের মতো নয়। খবরের কাগজে প্রকাশিত কতকগুলো প্রবন্ধ এমনই গরম গরম আর দুঃসাহসিক যে পড়লে দম আটকে আসে — তার তুলনায় তাঁর কাজানে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোকে মনে হয় ছেলেখেলা। একটা প্রবন্ধ (মফস্বলে সে কাগজটা কেবল গ্রাহকদের কাছে এসেছিল, কিন্তু সেণ্ট-পিতার্সবুর্গে সেই সংখ্যা বিক্রী হয়েছিল পঞ্চাশ রুবল দামে) গ্রিগোরী ইভানভিচের যেন চোখ খুলে দিল। তিনি দেখলেন বিবেকসম্পন্ন মানুষের সামনে রয়েছে একটি পথ। আর সে কী পথ। সে পথে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া যায়।

অনেক রাত হত, গ্রিগোরী ইভানভিচ মানুষের কেমনভাবে বাঁচা উচিত সাশাকে তাই বোঝাবার চেষ্টায় ঘরময় ছুটোছুটি করে বেড়াতেন, সাশাকে ঘুমোতে দিতেন না। তাঁর ছায়া ছুটোছুটি করত দেওয়ালে তাঁর পিছনে পিছনে, সাশা শুনতে শুনতে ভয়ে চেয়ে থাকত তার দিকে। ডাক্তারের মেজাজ খুব গরম বলে তিনি স্থির করলেন আর বিলম্ব না করে নতুন জীবন আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু হঠাৎ এ সবের বড় শোচনীয় পরিণতি হল।

তুষারঝড়ের কনকনে এক রাত্রিতে গ্রিগোরী ইভানভিচ পাইন-কাঠের টেবিলে বসে পড়ছেন, সাশা কাঠের পর্দার আড়ালে ব্যস্ত। পেয়ালাপিরিচের ঠুংঠাং আওয়াজে ডাক্তার টের পাচ্ছেন চা তৈরী হল বলে।

বাড়ির বাইরে ঝড়ের হুঙ্কার। শব্দে মনে হচ্ছে যেন শয়তান খাবা গুটিয়ে ছাদে বসে শীতের বিরুদ্ধে নালিশ করছে।

পর্দার পিছন থেকে সাশা বলল, 'কী ভয়ানক ঝড়, বাপরে! স্তেপে হয়ত কেউ বরফচাপা পড়বে।'

ডাক্তার হাত দিয়ে বাতিটা আড়াল করে বরফজমা জানালার দিকে তাকালেন। কাঁচের ওপরকার ছুঁচের আর পালকের মতো দেখতে বরফ মাঝে মাঝে চাঁদের নীলাভ আলোয় চমকে উঠছে। বহু উঁচুতে বরফঝরানো মেঘের টুকরোর আড়ালে চাঁদ লুকোচুরি খেলছে ...

গ্রিগোরী ইভানভিচ বলতে আরম্ভ করলেন, 'জানো, আমার কেবলি মনে হচ্ছে সেণ্ট-পিতার্সবুর্গে কোথাও এক টেবিলে বসে এক বুদ্ধিমান সৎলোক লিখে চলেছেন আর দু হাজার ভার্স্ত দূরে বসে আমি তাঁর চিন্তা অনুধাবন করছি—আশ্চর্য।.. কী অধিকার আমার নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকার।'

'কে তিনি?' জিজ্ঞেস করল সাশা। 'এখানকার কেউ, না তাঁকে তুমি কোথাও দেখেছ?'

'আঃ, তুমি বুঝতে পারছ না,' জবাব দিলেন ডাক্তার বই'এর ওপর হাত রেখে। 'আমি তোমায় বলছি, সাশা, আমি ঠিকমতো জীবন কাটাচ্ছি না, এ জীবন নির্লজ্জ আরামের আর শান্তির। এ জীবন সমর্থনের অযোগ্য। বুঝলে এ কথা?... এমনভাবে চলতে পারে না। সেখানে লোক প্রাণ দিচ্ছে আমার জন্য, তাই আমার কোন অধিকার নেই আরামে থাকার। "মাথা তুলতে" হবে আমাকে—এ বিষয়ে বলা যায় এইখানে... এবং তোমার কর্তব্য হচ্ছে আমাকে পিছনে জলার মধ্যে টেনে না নিয়ে বরং উৎসাহ দেওয়া, উত্তেজিত করা। প্রকৃত নারীর কাজ তাই ...'

বিরক্তিতে গ্রিগোরী ইভানভিচের গলার স্বর পর্যন্ত কাঁপতে লাগল... সাশা পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে স্বামীর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে হাত জড়ো করে নীচের দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বলল:

'আমারি দোষ গ্রিগোরী ইভানভিচ...'

তখনি তাঁর উচিত ছিল হেসে উঠে সাশাকে সবটা বুঝিয়ে বলা— সে বুঝতে পারত সবকিছু। তিনি কিন্তু তা করলেন না। নিজের দুর্বলতায় নিজের ওপর রেগে উঠে দোষ দিলেন তাঁর স্ত্রীর, তাঁর বিশ্বাস এই "সঙ্কীর্ণ সংসারী আরাম" তারই সৃষ্টি।

ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল বাড়ির বাইরে ঝড়ের দাপটে বেজে উঠা স্লেজ গাড়ির ঘণ্টাধ্বনি, বরফের ওপর মচ্‌মচ্‌ আওয়াজ আর কাছাকাছি আসা ঘোড়ার নিঃশ্বাসের শব্দ।

'এই দুর্যোগের মধ্যে বেরোবে গ্রিগোরী ইভানভিচ? বরফের তলায় যে চাপা পড়বে,' বলল সাশা পর্দার পিছনে যেতে যেতে।

'বড় সুখের কথা নয়,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি, 'কোন জমিদারবাবুর বুঝি পেট কামড়াচ্ছে।' মাথা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো পিছনে ফেলে বইটা সশব্দে বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। অনেক কষ্টে হাঁটু দিয়ে ঠেলে ফেঁপে ফুলে আঁট হয়ে বন্ধ সদর দরজাটা খুললেন।

বাইরের ঘরে ঢুকে পড়ল রাশি রাশি বাষ্পের ধোঁয়ার কুণ্ডলী। তাইতে তিনি কিছু দেখতে পেলেন না, কিন্তু কে যেন ঘরে ঢুকেছে। গ্রিগোরী ইভানভিচ লক্ষ্য করে তাকিয়ে এক পা পিছিয়ে হাঁ হয়ে গেলেন — দরজায় দাঁড়িয়ে কাতিয়া।

তার কালো ফারকোট বরফে ঢেকে গেছে। মাথার টুপির তলায় মুখ দেখাচ্ছে রাঙা, চোখের পাতাগুলো সাদা। দরজাটা বন্ধ করে হাতের দস্তানা খুলে পা ঠুকে ঠুকে বলল সে:

'আমায় দেখার আশা করেননি নিশ্চয়? আমি প্রায় পথ হারিয়ে গিয়েছিলাম। বাবার কাছে যাচ্ছিলাম। এদিকে ঝড়ের এমন জোর যে পুল পার হবার জো নেই। আলো দেখে এইখানে ঢুকে পড়লাম। ভিতরে আসতে পারি কি?'

কোটের বড় বোতামগুলো খুলে ফেলল সে। গ্রিগোরী ইভানভিচের সম্বিৎ ফিরে এল, তিনি তার কোট খুলে নিলেন, হাতে নিলেন টুপি। কোটের ভিতরটা খুব গরম, ফার আর সেণ্টের গন্ধে ভরপুর।

টুপির নীচে কাতিয়ার চুল অগোছাল হয়ে গিয়েছিল। চুল ঠিক করে নিয়ে সে টেবিলের পাশে বসে জিজ্ঞেস করল:

'সাশা কোথায়?'

'ঐ যে, ভিতরে,' কাঠের আড়ালের দিকে মাথা নেড়ে জবাব দিলেন গ্রিগোরী ইভানভিচ। 'আমরা পড়ছিলাম আর এখনই একটু চা খেতে যাচ্ছিলাম।' একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনার দিকে তিনি আড়চোখে তাকালেন, যেন লুকিয়ে পড়তে কিম্বা পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচেন।

'সাশা, আমি এসেছি, আমি। বেরিয়ে এসো।' কাতিয়া তার কালো পোষাকের লেসটা ঠিক করতে করতে হঠাৎ মুচকি হেসে ফেলল।

গ্রিগোরী ইভানভিচ মুখ হাঁ করে বহু কষ্টে নিঃশ্বাস নিলেন।

অবশেষে সাশা বেরিয়ে এল, কালো ব্লাউজের তলায় হাতদুটো লুকিয়ে। ধীরে সসম্ভ্রমে শুধু মাথা নুইয়ে সে নমস্কার করল। কাতিয়া তার গলা জড়িয়ে চুমো খেয়ে বলল:

'এখনও ঠিক তেমনি রূপ। কেমন আছো? সব ভাল তো?'

'ধন্যবাদ। সব ভাল,' ধীরে ধীরে চোখ না তুলে জবাব দিল সাশা।

কাতিয়া আবার চুমো খেল তাকে, কিন্তু সাশা কোন সাড়া দিল না। সে যেন পাথরের মূর্তি। কাতিয়া তার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিল। গ্রিগোরী ইভানোভিচ দুজনের দিকেই তাকালেন। কষ্টে তাঁর কপালে রেখা পড়ল। এই দেখা সাশার পক্ষে কত যন্ত্রণাকর তা তিনি বুঝলেন বটে, কিন্তু ভ্রূ কুঁচকে দুজনের তুলনা করতে লাগলেন। সাশা দেখতে কেমন যেন ভারী আর মোটা অথচ একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনার সবকিছু কেমন সুষ্ঠু, তার ভঙ্গি, উঁচু করে বাঁধা চমৎকার সরু চুল, বাঁশির মতো গলার স্বর, তার পোষাক নরম আর চমৎকার...

এই রকম চিন্তা তাঁর মনে আসছে বলে গ্রিগোরী ইভানভিচের ভীষণ রাগ হল, কিন্তু উদাসীন ভাব দেখাবার তিনি যতই চেষ্টা করুন, তাঁর চোখ আপনা থেকে দেখতে লাগল সেই সব জিনিস যা তাঁর দেখা উচিত নয়, যা দেখা তাঁর পক্ষে পাপ—তার কুঞ্চিত কেশ, একটু ওপরদিকে তোলা তার ঠোঁটের কোণ, তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওঠাপড়া বুকের ওপর জামার ভাঁজ।

অবশেষে তাঁর হাঁটুর নীচের একটা পেশীবন্ধনী কাঁপতে লাগল ইঁদুরের মতো। সেটা অনুভব করে এত বিশ্রী মনে হল যে তিনি কড়াস্বরে বললেন:

'আরে, সামোভার তৈরী হল শেষ পর্যন্ত?'

সাশা ধীরে মুখ ফিরিয়ে কাঠের আড়ালের পিছনে চলে গেল। তারা শুনতে পেল সে সামোভারে ফুঁ দিচ্ছে আর তার চিমনিটা সরানোর আওয়াজও। অল্প একটু পোড়া পোড়া গন্ধ পাওয়া গেল। কাতিয়া পত্রিকাখানার পাতা উল্টে সেটা ফেলে দিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল:

'আমি দুবার আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম আসবার জন্য—আমি অসুস্থ ছিলাম। আপনি এলেন না কেন?'

'আসতে পারিনি,' জবাব দিলেন গ্রিগোরী ইভানভিচ।

সাশা সামোভার নিয়ে এসে মন দিয়ে বাসন মুছতে লাগল, শান্ত, চোখ না তুলে।

'আমি সবদিন একা কাটাই। বাতাসের হুঙ্কার শুনি... ভাবি, কেবল ভাবি... মাগো, সারাজীবনে কখনও এত ভাবিনি! আর এখানে আপনার বাড়িতে হাওয়াতেও আরাম, সত্যি... আমার খুব ভাল লাগছে আপনার ঘরে... এমনকি হিংসা হচ্ছে।' কাতিয়া হঠাৎ মুচকি হেসে সোজা গ্রিগোরী ইভানভিচের চোখের দিকে তাকাল। তিনি তখন মাথা পর্যন্ত কাঁধের মধ্যে গুঁজলেন, তার ঠাণ্ডা অদ্ভুত ধূসর চোখ থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারলেন না। 'আপনার মনে আছে,' আরম্ভ করল সে আবার, 'সেবার কী রকম লোক-হাসানো-করে চুল কেটেছিলেন? কন্দ্রাতী পরে আমায় বলেছিল কেমন করে সে কাঁচি দিয়ে আপনার চুলের গোছা কেটে দিয়েছিল।'

গ্রিগোরী ইভানভিচ টের পাচ্ছিলেন তাঁর মুখ কেমন টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, তাঁর সর্বনাশ হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে সাশা বলল:

'গ্রিগোরী ইভানভিচ, বাইরের ঘর থেকে দুধের কলসী নিয়ে এসো, শেষেরটা — আমার পায়ে মোজা ছাড়া কিছু নেই।' কাতিয়ার দিকে ফিরে সে বলল, 'আমাদের দুটো গাই, একটা হরেকরঙা, একটা লাল, আর আছে একটা ষাঁড়-বাছুর — বলতে গেলে আসল খামার।'

ডাক্তারের চোখ বলল, "দেখলেন তো? বুঝলেন এখন?" তৎক্ষণাৎ তিনি বেরিয়ে গিয়ে বাইরের ঠাণ্ডা ঘরটাতে তাকের উপর হাতড়াতে লাগলেন। তিনি জানতেন দুধের কলসী কোথায় থাকে, কিন্তু ইচ্ছা করেই চাইছিলেন কিছু একটা আজেবাজে জিনিস পড়ুক

হুড়মুড় করে। কিছুই পড়ল না কিন্তু। তাই তিনি দুধের কলসী নিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, "দুত্তোর!" তাঁর ইচ্ছা হল সেইটাকেই ফেলে গুঁড়িয়ে দিতে। কিন্তু কেবল তাঁর মুখ হয়ে উঠল সঙ্কুচিত আর জিভ দিয়ে বেরোল একটা শব্দ। তিনি জানতেন খারাপ যা হবার হয়ে গেছে এবং তাঁর দুর্ভাগ্য (না সৌভাগ্য?) কাছে এসেছে।

কলসী সাশার সামনে রেখে কর্কশস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'এইটেই চাও তো?' তারপর ছায়ায় বসে পড়লেন।

বাইরের ঘর থেকে এই ঘরে ঢুকতেই নাকে এল সেণ্টের উগ্র সুগন্ধ। গ্রিগোরী ইভানভিচের ধারণা হল এ গন্ধ কোন সেণ্টের নয়, কাতিয়ার চুল হাত আর জামাকাপড়ের গন্ধ।

কাতিয়া চা খেতে লাগল ধীরে ধীরে। ঠোঁট দুটি তার টকটকে লাল। সাশা সামোভারের আড়ালে মুখ লুকিয়ে পেয়ালা মুছতে লাগল। হঠাৎ গ্রিগোরী ইভানভিচের খেয়াল হল সাশা হয়ে উঠেছে মোটা, জেদী আর বদমেজাজী।

"আরো মোটা হবে। মনে করে আমি নাকি ওর সম্পত্তি, ভাবে আমায় কৃতার্থ করেছে। ঐখানে বসে বসে উঁর ওপর আক্রোশ করছে আর আমি দুধের কলসী বয়ে মরছি। যাচ্ছেতাই, জঘন্য... আর আমি নিজে তো একটা পাষণ্ড ছাড়া আর কিছু নই।"

কাতিয়া জিজ্ঞেস করল তাঁর অনেক কাজ কিনা। গ্রিগোরী ইভানভিচ তার দিকে না তাকিয়ে এক পাশে চেয়ে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, অনেক কাজ।

'আমাকে সারা জেলা ঘুরে বেড়াতে হয় অনবরত। আমি আর মানুষ নেই। আমাদের জীবন তো রাজারাজড়ার নয়, বাঁচতে হয় হাঁটুভোর গোবরের মধ্যে। এতে মানুষ মোটা হয় না।'

সেই সময় সাশার হাত ফসকে একটা রেকাবী পড়ে খানখান হয়ে গেল। কাতিয়া হতাশ সুরে বলে উঠল, 'ও মা, কী!' এমন সহানুভূতির ভান করল যে গ্রিগোরী ইভানভিচ ঘনঘন নিঃশ্বাস টেনে হঠাৎ কম্পিতকণ্ঠে বলে উঠলেন:

'দারিদ্র্য কাকে বলে আপনি কখনও দেখেননি বুঝি? নিন, এই দেখুন!'

'তুমি বলছ কী?' ভীরু চোখ তুলে চুপিচুপি বলল সাশা।

একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনার হাতে চামচেটা কাঁপতে লাগল, গেলাসে সেটা ঝনঝন শব্দ করতে লাগল। গ্রিগোরী ইভানভিচ স্টোভের কাছে ছুটে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে সজোরে ঠোঁট চেপে বলতে লাগলেন:

'নোংরামি যত দেখতে চান তত, এমনকি যা হবার কথা তার চেয়ে বেশী, কিন্তু অন্তরটা এখনও জ্বলন্ত, সেটাকে পিষে ফেলা সম্ভব নয়, হ্যাঁ। আমি আপনার মনে আঘাত দিতে চাই না একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা, কিন্তু ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছে যে আপনি আমাদের নিয়ে মজা করতে এসেছেন। তাই আপনাকে বলছি, হাসবার কিছু নেই এতে। আমাদের জীবনে ঐ সব হাঁড়িকুঁড়ির চেয়ে ঢের গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে। আর বেঁচে আছি আমরা, যেন আগুনে জ্বলে থাকি। আমরা বাঁচি ভাবনা-চিন্তা নিয়ে। তার তুলনায় এই মলিনতা তুচ্ছ। আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পূর্ণ বৃথা, আমি সেটার মুখে থুথু ফেলি। আমার জীবনে সার্থকতা আসেনি, তবু আমি আর একজন যোদ্ধা।'

এই ধরনের আরো অনেক কথা বললেন গ্রিগোরী ইভানভিচ। কাতিয়া মাথা নীচু করে শুনতে লাগল। অবশেষে তিনি যখন নিজের এলোমেলো কথার একটা মানে নিজের কাছেই করবার চেষ্টায় হঠাৎ বেঞ্চে বসে পড়লেন, তখন একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা টেবিল ছেড়ে উঠে বললেন:

'আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি থাকি সম্পূর্ণ একা। একটা কথা বলার কেউ নেই। আজ আপনার আর সাশার কথা মনে পড়ল। আপনাদের আপন লোক বলে মনে করেছি, তাই আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এসেছিলাম। দেখা যাচ্ছে তা বৃথা হয়েছে। বিদায় বন্ধুরা। যা ভেবেছিলাম তা হবার নয়।'

ফারকোটটা গায়ে দিয়ে ধীরে ধীরে বোতামগুলো এঁটে সাদা নরম দস্তানা হাতে পরে বিষণ্ণ হাসি হেসে তাদের আবার বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

গ্রিগোরী ইভানভিচ একটা কথাও বলতে পারলেন না — এইমাত্র তিনি যা কিছু বলেছেন সমস্ত যেন ঘূর্ণিহাওয়ার মতো তাঁর মাথা থেকে উধাও হয়ে গেছে। সাশা আবার ব্লাউজের তলায় হাত ঢেকে মৃদুস্বরে বলল তাঁকে:

'আর যাই হোক, অতিথিকে অপমান করা চলে না গ্রিগোরী ইভানভিচ।'

তখন তিনি যে অবস্থায় ছিলেন — কালো সার্ট গায়ে আর মাথায় টুপি ছাড়াই — ছুটে গেলেন উঠানে।

আকাশে তার ছুটোছুটি শেষ করে গোল পরিষ্কার চাঁদ হিমগগনে ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে। স্লেজে যোতা তিনটে ঘন ধূসর ঘোড়া তাদের সাজের ঘণ্টার শব্দ করছে। নীলাভ বরফের স্তূপ উঁচু হয়ে জমেছে অলিন্দের পাশে। হাঁটু পর্যন্ত বরফে ডুবে গিয়ে গ্রিগোরী ইভানভিচ ছুটে গেলেন কাতিয়ার কাছে। স্লেজের কাছে দাঁড়িয়ে সে ফিরে চাইল তাঁর দিকে।

'একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা, আমি আপনাকে অপমান করতে চাইনি ... হায় ভগবান, দোহাই আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

'আমি বুঝতে পেরেছি আপনাকে,' বলে চোখ তুলে সে তাকাল চাঁদের দিকে।

'একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা, আমি আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি?'

'বেশ।'

গ্রিগোরী ইভানভিচ আবার ছুটে বাড়ির মধ্যে গিয়ে ভেড়ার লোমের খাটো কোটটা গায়ে চাপিয়ে নিলেন।

সভয়ে তাড়াতাড়ি বললেন:

'আমি একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চাই। ওঁকে একা যেতে দিতে পারি না, বিশেষত যখন আমি ওকে অপমান করেছি। আমার ফিরতে দেরী হবে, হয়ত কাল সকালের আগে নয়।' দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগলেন তিনি। সাশা জবাব না দিয়ে চায়ের বাসনগুলো তুলতে লাগল।

'জবাব দিচ্ছ না কেন?' প্রশ্ন করলেন তিনি। 'তুমি চাও না আমি ওকে বাড়ি পৌঁছে দিই?'

'তোমার যা ইচ্ছা গ্রিগোরী ইভানভিচ। যা ভাল বোঝ তাই করো।'

'আমার ইচ্ছার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?' দরজা থেকে ফিরে এসেছেন তিনি, গলা কাঁপছে তাঁর। 'এ রকম জবাব আমার বরদাস্ত হয় না... আমার ইচ্ছা হলে আমি কি ওকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে পারি না?'

'আমার কী জবাব? তোমার এত রাগ কিসের গ্রিগোরী ইভানভিচ?'

তৎক্ষণাৎ তিনি বেঞ্চে বসে পড়ে দু'হাতে রগ টিপে ধরে বলে উঠলেন, 'অসহ্য।'

ঘোড়ার সাজের ঘণ্টা বেজে উঠল বাইরে, কাতিয়া স্লেজে চড়ে বসল। গ্রিগোরী ইভানভিচ লাফিয়ে উঠে হতাশকণ্ঠে বললেন:

'ঈশ্বরের দোহাই তুমি এত রাগ করো না। তোমাকে এইরকম ভাবে ফেলে আমি যেতে পারি না।'

'কিছুই না, এ আমার সয়ে যাবে,' বলে সাশা কাঠের পর্দার আড়ালে চলে গেল।

'জাহান্নমে যাক্!' গর্জন করে উঠলেন তিনি। 'আমি যাব না।' তখনই কিন্তু চৌকাঠ পার হয়ে ছুটলেন বাইরে।

ঘোড়াগুলো চলতে আরম্ভ করেছে।

'দাঁড়াও, এক মিনিট দাঁড়াও,' চীৎকার করে গ্রিগোরী ইভানভিচ গভীর বরফের মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে ছুটে চললেন স্লেজের চওড়া পিছনের দিকটার পিছু পিছু।

৯

স্লেজের বরফে ঢাকা জানালা দিয়ে চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছিল তুষারাচ্ছন্ন আবছা প্রান্তর বিস্তৃত হয়ে আকাশে মিশে গেছে। স্লেজের নীচের ডাণ্ডাগুলোর ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ, একঘেয়ে ঘণ্টার থেকে কাঁচের মতো আওয়াজ। গাড়িটা কোথাও মোড় নিলেই কাতিয়ার ধূসর ফারে ঘেরা সুডোল মুখখানি অন্ধকার থেকে আলোতে আসছিল, তার চোখে খেলা করছিল জ্যোৎস্নার স্ফুলিঙ্গ।

তার দিকে তাকিয়ে গ্রিগোরী ইভানভিচের মনে হল এই মুহূর্তটির জন্য তিনি সমস্ত জীবন টেনে চলেছিলেন। এখন তিনি চান শুধু সেই জাদুকরা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে, তুষারের, সেণ্টের আর উষ্ণ ফারের তীব্র সুগন্ধ বুক ভরে টেনে নিতে।

নীলাভ আলোয় মুখটা দেখা যেতে একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা বলল, 'আপনি জানেন আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে গেছেন?'

গ্রিগোরী ইভানভিচ চমকে উঠলেন। তাঁর মনে হল এর একটা কিছু জবাব দিতে হবে তাঁকে আর হঠাৎ, যেন একটা ইঙ্গিতের

অপেক্ষাতেই ছিলেন এতক্ষণ, তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলেন মৃদু এক নতুন বিশেষ স্বরে, কিন্তু তিনি অনুভব করেছিলেন সেটা হল তাঁর আসল স্বর। তিনি তাকে বললেন গ্রীষ্মে সেদিন কী দেখেছিলেন — কেমন নদী থেকে মেঘ উঠে বনের ওপর দিয়ে ভেসে গিয়েছিল, কেমন তাঁর অন্তর তখন ভরে গিয়েছিল প্রেমে, কেমন করে তিনি কাতিয়াকে দেখেছিলেন নৌকো চড়ে তীরের দিকে আসতে আর বুঝেছিলেন — তাঁর প্রেম তারই জন্য। তিনি তাকে বললেন মৌমাছিদের ঘাসের ওপর ঘুরে ঘুরে ওড়ার কথা, বললেন, তাঁর প্রেম এত বিরাট, এত স্বচ্ছ যে মনে হয়েছিল কোন মানুষের পক্ষে তার ভার বহন করা অসম্ভব, তাই তিনি চেয়েছিলেন সে প্রেম বিলিয়ে দিতে আকাশে, পৃথিবীতে, সকল লোকের মাঝে।

'সাশার কী হবে?' হঠাৎ কাতিয়া প্রশ্ন করল নীচুস্বরে। সেই মুহূর্তে তার মুখ এত অদ্ভুত দেখাচ্ছিল, এত মর্মান্তিক সুন্দর, যে গ্রিগোরী ইভানভিচ কাতরিয়ে স্লেজের ভিতরের দিকে ঠেস দিয়ে বসলেন। কাতিয়া তাঁর কাঁধে হাত বুলিয়ে দিতেই তিনি তার হাত খপ্ করে ধরে কোমল সুগন্ধি দস্তানায় নিজের ঠোঁট চেপে ধরলেন। বললেন: 'আমি আপনাকে ভালোবাসি, আপনার জন্য আমায় প্রাণ দিতে দিন...'

তার হাত ধরে বারবার চাপা স্বরে ঐ কথাগুলি বলতে লাগলেন। রাস্তার গর্তের উপর দিয়ে গিয়ে স্লেজটা যখন ঝাঁকুনি খাচ্ছিল তখন দেখাচ্ছিল যেন তিনি তাকে প্রণতি জানাচ্ছেন। তাঁর মুখ বিশ্রী, উত্তেজিত।

কাতিয়ার মন বিষাদে ভরে উঠল। প্রথমে তার ইচ্ছা হল গ্রিগোরী ইভানভিচকে নিয়ে মজা করতে, তাঁকে বলতে যে সে বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল না, এসেছিল তাঁরই কাছে — এসেছিল ইচ্ছা করেই, বদমেজাজ আর বিরক্তির দরুণ, তাঁকে যাতনা দিতে ইচ্ছে

হল বলে, যে তাঁকে দেখাচ্ছে তুচ্ছ, তাঁর প্রেম তাঁর ঐ নতি জানানোর মতোই হাস্যকর এবং সত্যিই সে প্রেমের একমাত্র গতি মৃত্যু। সে কিন্তু এ সব কিছুই বলল না বরং চাইল বিগলিতভাবে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতে।

'তাকান আমার দিকে... এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ভালোবাসুন,' বললেন গ্রিগোরী ইভানভিচ।

তখন কাতিয়া তাঁর হাত থেকে নিজের হাত ছিনিয়ে নিল। তিনি বাধা দিলেন না, শুধু তার পায়ে পড়ে তার হাঁটুতে মুখ ছোঁয়ালেন। এতে কাতিয়ার মনের ভার আর বিষাদ আরো বেড়ে গেল।

তাদের কেউই লক্ষ্য করেনি যে স্লেজখানা এদিকে ওদিকে গিয়ে হেলে পড়তে আরম্ভ করছে, রাস্তা ছেড়ে হঠাৎ পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ছুটে চলল সেটা। নামবার সময় জোয়ান ঘোড়াগুলোকে একপাশে, রাস্তার দিকে ঘোরাতে না পেরে কোচওয়ান ছাড়ল সেগুলোকে সোজা পাহাড়ের ঢালুতে, নদীর ওপরের বরফের দিকে।

উঁচু তুষারের স্তূপ বুকে বুকে ভেঙে ভেদ করে ঘোড়াগুলো এসে পড়ল নদীর উপর। চিড় খেয়ে ফেটে গেল নদীর বরফ, স্লেজটা দুলে উঠে বসল নীচে, কালো জল হুহু করে ঢুকে পড়ল তার মধ্যে।

চীৎকার করে উঠল কাতিয়া। ডানদিকের দরজাটা জলের তলায় যায়নি, সেটাকে ঝট্ করে খুলে ফেললেন গ্রিগোরী ইভানভিচ। পাতলা বরফের গর্তের মধ্যে নদীর স্রোতে সাদা ঘোড়াগুলো হাঁকপাঁক করতে লাগল। জ্যোৎস্নায় চিক্‌চিক্ করছে নীল জল। মাঝের ঘোড়াটা সামনের পা দিয়ে কোনরকমে বরফে ভর দিয়ে হঠাৎ দীর্ঘ কাতর চিঁহিঁ শব্দ করে উঠল। বাঁদিকের ঘোড়াটার মুখটা কেবল জলের ওপরে ওঠানো ছিল, তার মুখ দিয়ে গোঙানি বেরোল একটা, ডানদিকেরটাকে ততক্ষণে স্রোতে টানছে।

কোচওয়ান নিজের আসনে সটান উঠে চীৎকার করল, 'ডু-বে যা-চ্ছি।'

অন্ধকারে বহুমূল্য ধনের মতো কাতিয়াকে জাপটে ধরে গ্রিগোরী ইভানভিচ তাকে স্লেজের ভিতর থেকে ঠেলে দিলেন, "কোনও ভয় নেই, কোনও ভয় নেই..." বলে। সে কোনও প্রকারে স্লেজের ছাতের রেলিঙ ধরে ফেলতে গাড়িটা বিপজ্জনকভাবে হেলে গেল। গ্রিগোরী ইভানভিচ খপ্ করে পড়লেন এককোমর জলে।

# প্রত্যাবর্তন

আলেক্সেই পেত্রোভিচ রীবিন্স্ক থেকে একটা দ্রুতগামী স্টীমারের দ্বিতীয় শ্রেণীতে চলেছিলেন। কয়েকদিন ধরে তিনি কেবিনের মধ্যেই শুয়ে কাটাচ্ছিলেন, বাইরে বেরোননি। অসুস্থতার জন্য নয়, তাঁর নড়াচড়া করার বা কথা বলার কোন ইচ্ছা ছিল না। তিনি কেবল মদ খেয়ে আর ঘুমিয়ে কাটাচ্ছিলেন।

তাঁর দোমড়ানো জ্যাকেটের পকেটে খবরের কাগজে মোড়া শেষ একশো রুবলের নোট। আলেক্সেই পেত্রোভিচ ভান করছিলেন যেন তিনি নিজেই জানেন না কেন স্টীমারে উঠেছেন। এখন তাঁর মনের অবস্থা রুগ্ন কুকুরের মতো, যার রোঁয়া গোছায় গোছায় উঠছে,— নোংরা ঘৃণ্য আর বিষণ্ণ।

এক বছর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের পর আলেক্সেই পেত্রোভিচ অধঃপাতের শেষ ধাপে পৌঁছেছেন। এখন কোন রাত্রের আশ্রয়ে পড়ে মরা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই। এই ভেবে তিনি এখন এক রকমের আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলেন, এমনকি একটা সুখকর উত্তেজনা। বিবেক দংশন বলে কিছু ছিল না, মনেও কিছু ছিল না। এদিকে

আসলে স্মৃতি বিলাসের সময়ই ছিল না তাঁর। কেবিনে যখনি ঘুম ভাঙত তখনি গলাটা খাঁকরে পরিষ্কার করে নিয়ে খানিকটা ভোদ্‌কা গিলে আয়নার সামনে টেবিলে বসে হাই তুলতেন কিম্বা পেসেন্স খেলতেন, যতক্ষণ না নেশার ঘোরে আবার ঘুম আসত...

বিয়ের আগে বাগানের বেঞ্চে বসে কাতিয়ার কাছে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করার সময় বলেছিলেন যে সে তাঁকে বিয়ে করতে চাইলে তিনি তাকে বিয়ে করতেন না। তখনই কাতিয়া বুঝতে পেরেছিল যে তাঁর দরকার একজনের "আত্মোৎসর্গের"। আলেক্সেই পেত্রোভিচের সত্যিই তাই দরকার ছিল, কিন্তু এক বিশেষ রকমের উৎসর্গের (এটা কাতিয়া নিজেও ঠিক বুঝতে পারেনি): উৎসর্গ হতে হবে জীবন্ত, আতপ্ত, চিরন্তন। এমন উৎসর্গ আছে যা চিরকালের মতো, যা সম্পূর্ণ। উৎসর্গকারী একান্তভাবে নিজেকে সমর্পণ করে একেবারে বিলীন হয়ে যায়। তার স্মৃতি বিবেককে বিচলিত করতে থাকে এবং নিজেকে অপদার্থ মনে হয়। আবার এমন উৎসর্গ আছে যা উত্তপ্ত আনন্দোচ্ছল মুহূর্তকালের। তাদের কথা মনে করে দুঃখ হয় কেন তার পুনরাবৃত্তি হয় না। আলেক্সেই পেত্রোভিচ বাঁচতে পারতেন মাত্র এই রকমে— যদি কোন প্রেমময়ী মেয়ে থাকে তাঁর পাশে, যার হৃদয়ে বেদনা, যার নিজের ইচ্ছাশক্তি বলে কিছু আর নেই, যে একটি মিষ্টি কথার জন্য নিজের সম্পূর্ণ সত্তাকে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। তাঁর চাই অবিরাম মৃদু বিবেকদংশন, মধুর বেদনার ভার, এই দুঃখ যে সেই মেয়ের যত সুখ প্রাপ্য তা তিনি তাকে দিতে পারছেন না। মনে প্রেমের বিষাদে তিনি একেবারে ডুবে যেতে চান, আকণ্ঠ পান করতে চান তার তিক্ত মদির অশুচি রসধারা।

ঠিক এই রকমই ছিল সাশার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। কিন্তু যখন তার শান্ত উৎসর্গ অপরিবর্তনীয় আত্মত্যাগে পরিণত হল তখন তাঁর অন্তর

বিভীষিকায় পূর্ণ হল, মনে হল কাতিয়াই উদ্ধারের একমাত্র আশা। তার হৃদয়ে প্রেম আছে, স্নেহ আছে, রূপও আছে তার। কুমার ধরে নিলেন যে তাঁদের মিলন হবে হেমন্তে বিষণ্ণ আবদ্ধ জলের মতো — এ জগতে শেষ দুঃখময় আশ্রয়স্থল।

কিন্তু সে যখন তাঁকে চড় মেরেছিল তখন রাগ এবং লালসা জলে উঠেছিল তাঁর মনে। সে আঘাত তাঁর অতীতকে মনে করিয়ে দিয়েছিল। তফাৎ ছিল শুধু এই যে এখানে কর্তৃত্ব ছিল তাঁর, তিনিই ছিলেন ভাগ্যনিয়ন্তা।

মধুচন্দ্রিকার প্রথম কয়েকদিন আলেক্সেই পেত্রোভিচের যেন ভয় ছিল যে কাতিয়া আত্মস্থ হয়ে তাঁদের মিলনের সম্পূর্ণ ভয়াবহতা বুঝতে পারবে। তাই তিনি অতি যত্নে ভদ্র ব্যবহার করতে লাগলেন। সে ভদ্রতা প্রায় ঔদ্ধত্যের সামিল। কিন্তু কাতিয়া যা আশাও করেনি তাই ঘটল। পরিপূর্ণ নারীত্বের সমাগমে সে হঠাৎ গভীরভাবে সাগ্রহে ভালোবেসে ফেলল তার স্বামীকে, ঠিক যেন সে অন্ধকার থেকে প্রখর আলোতে বেরিয়ে এসেছে। এ ছিল নিজেকে, নিজের নারীত্বকে তার জলন্ত অনুভব, তার টগ্‌বগে রক্তের উগ্র জ্বালাময় উত্তাপ। এই আবেগের উত্তেজনায় তার সমস্ত অতীত পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল, মনে রাখবার মতো রইল না আর কিছু।

নারীর প্রথম প্রেমের প্রচণ্ড আবর্তে তার স্বামীকে টেনে নিয়ে এল কাতিয়া। সেই রকমই সহসা আলেক্সেই পেত্রোভিচ গা ঢেলে দিলেন বিস্মৃতি, তীব্র আনন্দ, ছোটখাট কিন্তু মধুময় জিনিসের সোহাগে। মনে হ'ল যেন তাঁর দ্বিতীয় জীবন আরম্ভ হয়েছে, যখন তিনি কাতিয়ার চোখে দেখলেন তাঁর প্রতি পাগলের মতো আহ্লাদের আলো। তাঁর অতীত মুছে গেল, ভবিষ্যৎ রইল না, রইল শুধু সেই মোহময় অতল নারীর দৃষ্টি।

এই সুখের উন্মাদনা বেশী দিন রইল না। আলেক্সেই পেত্রোভিচ টের পেতে আরম্ভ করলেন এ উত্তেজনার চাপ সহ্য হবে না আর বিহ্বল হয়ে গেলেন তিনি। এল প্রথম কলহ। কাতিয়া আহত হল, লজ্জায় মাথা কাটা গেল তার যখন তার প্রেমনিবেদনকে অবহেলা, প্রায় উপহাসের সঙ্গে নেওয়া হল। সে টের পেল তারা দুজনে পরস্পর কত দূর—যেন দুই অপরিচিত। এটা ঘটেছিল এক সন্ধ্যায় ভেনিসের এক পুরোনো হোটেলে। আলেক্সেই পেত্রোভিচ জানালায় দাঁড়িয়ে রইলেন বৃষ্টিমাখা সূর্যাস্তের আভায় লাল হয়ে ওঠা সরু খালের দিকে চেয়ে, কাতিয়া কাঁদছিল সোফায় শুয়ে।

'দোহাই ভগবানের কাতিউশা, থামাও কান্না। ভয়ানক কিছু একটা ঘটেনি,' নরমস্বরে বললেন আলেক্সেই পেত্রোভিচ। 'তুমি চুমো খেতে চাইলে, আমি কেমন অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। ব্যস্, এইতো। আমি ভাবছিলাম রেস্তরাঁগুলো ছাড়া আমরা আসলে ভেনিসের কিছুই দেখিনি ভাল করে। ঠিক কি না বলো? মনে হয় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে বলে তোমার মন ভার হয়েছে। কিম্বা আমরা দুজনেই ক্লান্ত...'

এ সবই সত্যি, সত্যিই কাঁদবার কিছু ছিল না।

কিন্তু কাতিউশা নিজেই জানত না কেন তার এত মনভার। তার মনে হচ্ছিল যেন সমুদ্রের দূর সীমায় সূর্য চিরকালের মতো ডুবে গেছে, যেন এখন থেকে তার জীবনে আর কোন আশা নেই, আলো নেই।

নীচে খালের জলে একটা কালো গণ্ডোলা চলেছে নিঃশব্দে। কুমার জানালার ধারিতে ঝুঁকে পড়ে দেখছিলেন কেমন নৌকোখানার সরু গলুই লালচে জল কেটে দিচ্ছে। গণ্ডোলাতে যে মেয়েটি বসেছিলেন তিনি লর্নেৎ-চশমা নামিয়ে ফিরে গণ্ডোলার মাঝিকে কী যেন বলতে মুখ তুললেন। আলেক্সেই পেত্রোভিচ চিনলেন—সে মেয়ে মোর্দ্‌ভীনস্কায়া।

জানালা থেকে আচমকা ফিরে তিনি তাকালেন কাতিয়ার দিকে। সে তখন মাথা নীচু করে বসে আছে। সন্ধ্যার আবছা আলোয় তার কোলের ওপর রুমালটা অস্পষ্ট সাদা দেখাচ্ছে। এই নিষ্পাপ সুন্দর তরুণী মেয়েটির প্রতি তীব্র করুণায় তাঁর মন ভরে গেল। সে কিছুই বুঝতে পারল না। তিনি সোফার পাশে নতজানু হয়ে বসে তার হাতটি তুলে নিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরলেন, কিন্তু হাতে কোন সাড়া নেই, তার ঠোঁটও রইল উত্তাপহীন। তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে এল এই কথা যে তিনি একে ভালোবাসেন না, ভালোবাসেন সেই আর একজনকে এবং কোন ত্যাগ বা উৎসর্গই সে ভালোবাসা নিশ্চিহ্ন করতে পারে না।

পরের দিনই তাঁরা রওনা হলেন রোমের দিকে, সেখান থেকে জেনোয়া, নীস তারপর প্যারিস।

আলেক্সেই পেত্রোভিচ নিশ্চয় করে বলতে পারতেন না, কালো গণ্ডোলাতে যে মেয়েটি ছায়ার মতো তাঁর সামনে দিয়ে চলে গেল সে সত্যিই মোর্দভীনস্কায়া কি না, হয়ত তার মতো দেখতে আর কেউ তাঁর চোখের ভুল ঘটিয়েছে। কিন্তু সে যাই হোক, তাঁর মনের গোপন কপাট খুলে গেছে, যে কপাট কঠিনভাবে বন্ধ করা ছিল বিস্মৃতির অতলে সেই রাত্রি থেকে যে রাত্রে আন্না সেমিওনভনা তার সোহাগের নাগপাশে তাঁকে জড়িয়ে চুম্বনে চুম্বনে বিষজর্জরিত করেছিল। এখন তিনি জানলেন, এতদিন তিনি নিজেকে প্রবঞ্চনা করে এসেছেন আর যে প্রবঞ্চনা তিনি এত কৌশলে খাড়া করেছিলেন তা ঐ মেয়েটির এক চাউনিতে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। মোর্দভীন্স্কায়াকে একবার দেখতে পাবার জন্য তিনি সবকিছু ক্ষমা করতে, সব ভুলতে প্রস্তুত, এমনকি চোখের ওপর চাবুকের আঘাতও। তাঁর ইচ্ছা বা অহঙ্কার বলে এখন কিছু নেই, আছে শুধু বেদনাক্লিষ্ট হৃদয় যা যে কোন মুহূর্তে ভালোবাসার নির্মম শিখায় জ্বলে পড়তে ব্যাকুল।

হঠাৎ তাঁর মনে হল তাঁর কিছুই এসে যায় না যদি কাতিয়া তাঁকে ছেড়ে চলে যায় অথবা তাঁর পাশে থেকে সারাজীবন কষ্ট পায়, কিম্বা সাশার মতো নিঃশব্দে ত্যাগস্বীকার করে। এদিকে কাতিয়া নির্বাক বিষণ্ণ, এতদিনে প্রশ্ন করার সাহস নেই তাঁর এই সহসা পরিবর্তনটা কেন।

প্যারিসে আলেক্সেই পেত্রোভিচ কখনো কখনো পুরো একটা দিন কাতিয়াকে হোটেলে একলা ফেলে রেখে যেতেন। সে জানালায় বসে পথ চেয়ে থাকত। নীচে, প্লাস্ দ্ লা অপেরা'তে গাড়ির স্রোত মিশে যাচ্ছে, লোকজন ছুটে চলেছে চৌমাথার এদিক থেকে ওদিকে, কানে আসছে মোটরের হর্ণের আওয়াজ, কোলাহল আর চাকার শব্দ। এই সমস্ত হট্টগোল আর তার মাঝে অল্পই ব্যবধান। আবার এইটাই তার নিঃসঙ্গতা আর দুঃখকে আরো অসহনীয় করে তুলেছে।

কয়েক বার আলেক্সেই পেত্রোভিচের ফিরতে অনেক দেরী হল। তাঁর শীর্ণ মুখ, যন্ত্রণাকাতর প্রায় দৃষ্টিহীন চোখের দিকে অতি দুঃখে তাকাত কাতিয়া। দুই হাত মুঠো করে সে বলতে থাকত, "আমি ভালোবাসি না, ভালোবাসি না ওকে। কিছু এসে যায় না, মরুক গে।" কুমার বলতেন তাঁকে ক্ষমা করতে। বোঝাবার চেষ্টা করতেন যে সারাদিন তিনি সহরময় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর কথাগুলো হয়ে পড়ত গোলমেলে এলোমেলো আর অবোধ্য ... তারপর তিনি বিছানায় শুয়ে কম্বলের ওপর হাত ছড়িয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করতেন।

এই সমস্ত আবোলতাবোলের মধ্যে থেকে একটিমাত্র জিনিস কাতিয়া বুঝতে পারত, তা হচ্ছে এই যে, তার স্বামী একাগ্রভাবে চেষ্টা করছেন কোন একজনের দেখা পেতে, তাই তিনি খুঁজে বেড়াতেন রেস্তরাঁয়, থিয়েটারে, সরাইখানায়, দোকানে, লোকভর্তি কাফে'তে, ঘুরে বেড়াতেন রাস্তায় রাস্তায়। কাতিয়া চেষ্টা করত বার করতে কাকে

খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি, অনুনয় করে ভয় দেখিয়ে কেঁদে, কিন্তু কুমার মুখ বুজে থাকতেন। একদিন ভোরে সকালের আবছা আলোয় কালিবর্ণ তাঁর মুখ আর কোটরে-বসা নিষ্প্রভ চোখের দিকে তাকিয়ে কাতিয়া বিছানায় উঠে বসে দু'হাতে মাথা চেপে বলল:

'বুঝি না, বুঝি না আমি কিছু... এ সমস্ত একরকমের পাগলামি মিছে কথা, রাশি রাশি মিছে কথা!..'

'হ্যাঁ, পাগলামি আর মিছে কথাই, কাতিয়া...'

কাতিয়ার আর সহ্য হল না। তার অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেছে। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে খালিপায়ে জানালা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে চীৎকার করে বলল, ফের যদি তিনি তাকে এই ঘরে একলা ফেলে যান, তাহলে সে রাস্তায় গাড়ির তলায় লাফিয়ে পড়বে। তার হতাশা এত গভীর আর অপ্রত্যাশিত যে আলেক্সেই পেত্রোভিচের যেন হুঁশ ফিরে এল। তিনি কাতিয়াকে সান্ত্বনা দিয়ে জোর করে বললেন, এবার সময় হয়েছে বাড়ি ফিরে যাবার, রাশিয়াতে।

এত সব ঘটেছিল এই কারণে যে প্যারিসে পৌঁছেই আলেক্সেই পেত্রোভিচ দূতাবাসে গিয়ে সংবাদ পেয়েছিলেন যে মোর্দভীন্স্কায়া প্যারিসেই আছেন এবং একলা আছেন, তবে তাঁর ঠিকানা জানা নেই। তখন থেকে তিনি সারা সহরে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন আন্না সেমিওনভনাকে। এমনকি দু এক বার তাকে দূর থেকে দেখতেও পেয়েছিলেন, কিন্তু কাছে যেতে পারেননি। তাকে দেখা যেত এক লম্বা ছোকরার সঙ্গে, সম্ভবত ঘোড়দৌড়ের আস্তাবলের মালিক।

গত এক সপ্তাহ আলেক্সেই পেত্রোভিচ আর তার দেখা পাননি কোথাও। হয়ত সে দক্ষিণে চলে গেছে—বিয়ারিৎস্ অথবা নীস্'এ, যেখানে মরশুম ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে।

সেণ্ট-পিতার্সবুর্গে হেমন্তকাল এসে গেছে। সহরের ওপরে ভারী

জলভরা মেঘ গুঁড়ি মেরে আসছে। বাতাসে লোহার গন্ধ। ব্যস্ত করিতকর্মা খিট্‌খিটে আর স্নায়বিক দৌর্বল্যে শীর্ণমুখ পথচারীরা ছাতা পর্যন্ত খুলছে না, এতই তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে বৃষ্টিবাদল। পড়ুক বৃষ্টি যত খুসী।

এইরকম এক দিনে ক্রাস্নপোল্‌স্কীরা গাড়ি চড়ে যাচ্ছিলেন ওয়ারশ স্টেশন থেকে মরস্কায়া রাস্তার উপরে হোটেলে। কাতিয়া থামতে চায়নি, কিন্তু আলেক্সেই পেত্রোভিচ কী যেন কাজের কথা তুললেন। আরম্ভ হ'ল ক্লান্তিকর একঘেয়ে দিনের পর দিন। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। হোটেলের কামরায় সারাদিন জ্বলছে হলদে বিজলীবাতি। কুমার অল্পক্ষণের জন্য বাইরে বেরিয়ে বাকি সময়টা সোফায় শুয়ে কাটাতেন। হয় চুপ করে থাকতেন তিনি, নয় সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে উঠতেন, কিম্বা কাতিয়াকে বলতেন আত্মীয়স্বজনের বাড়ি ঘুরে আসতে। সে কিন্তু একেবারে বেঁকে বসত যাবে না বলে। তারপর একদিন সকালে আলেক্সেই পেত্রোভিচ্ সেই যে বেরোলেন আর ফিরলেন না সে দিন, সে রাত্রি, এমনকি তার পরের দিনও।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এই। সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে আলেক্সেই পেত্রোভিচ একটা গাড়ি ভাড়া করে নিয়মমতো শ্‌পালেরনায়া রাস্তায় চলেছিলেন। মোর্দভীন্‌স্কীদের বাড়ির কাছে পৌঁছতে উত্তেজনায় তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে এল। যে জানালাগুলো কাল পর্যন্ত খড়ির গুঁড়োয় সাদা হয়ে ছিল সেগুলো আজ পরিষ্কার, পর্দাগুলো খোলা আর হলের ভিতরে কয়েকটা বিজলীর বাতি জ্বলছে। আলেক্সেই পেত্রোভিচ রাস্তার মোড়ে গাড়ির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে হেঁটে গেলেন বাড়িটার সদর দরজা অবধি। তাঁর বুক এত ঢিপঢিপ করতে লাগল যে হাত দিয়ে সেটা চেপে ধরতে হ'ল। ঘণ্টা টিপে বাড়িতে ঢুকে চাকরকে নিজের কার্ড দিলেন। তাঁর চিন্তাতেই এল না এর পরে কী ঘটবে, স্বামী বেরিয়ে আসবেন না মেয়েটি নিজে এবং উভয়ক্ষেত্রে তিনি কী করবেন।

চাকর অনেকক্ষণ ফিরল না। "পাজি কোথাকার। ইচ্ছা করে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে বাইরের ঘরে," ভাবলেন কুমার। অবশেষে চাকর ফিরে ঘরের অপর প্রান্ত থেকে কুমারের দিকে তাকিয়ে থেকে নিশ্চয় উদ্ধতভাবে আবার চলে গেল। আলেক্সেই পেত্রোভিচের মাথায় রক্ত চড়ে উঠল। আয়নার নীচে তাক থেকে মেয়েদের একটা কালো দস্তানা টেনে নিয়ে সেটাকে দুটুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। চাকরটা আবার এল একটা রঙচঙে পালকের ঝাড়ন হাতে নিয়ে, এবং চলতে চলতে ধুলো ঝাড়তে লাগল। "গাধা কোথাকার।" চীৎকার করে উঠলেন কুমার, ঘরগুলোর ভিতর দিয়ে তাঁর স্বর প্রতিধ্বনিত হ'ল। কে যেন বাড়ির মধ্যে থেকে ঘণ্টা বাজাতেই চাকরটা আবার উধাও হ'ল আর কুমার সমস্ত গায়ের জোরে সদর দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে ছুটে বেরোলেন রাস্তায়।

ঝিপ্‌ঝিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে। বাড়ির ছাদগুলোর ওপরে কুয়াসার মেঘ গুঁড়ি মেরে বসে। ভিজে পচা বাতাস হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আলেক্সেই পেত্রোভিচ ধীরে ধীরে চললেন ফুটপাথ ধরে। সমস্ত কিছুই তিনি আগে থেকে ভাবতে পেরেছিলেন, কেবল পালকের ঝাড়ন হাতে চাকরটার কথা কল্পনাও করতে পারেননি।

"এখন নিজেকে ভুলতে হবে, যত শীগগির সম্ভব," মনে মনে বললেন তিনি। "কেবল যেতে হবে সবচেয়ে নোংরা জায়গায়।" এখন তাঁর স্পষ্ট মনে হ'ল এই বার শেষ। পালকের ঝাড়ন হাতে চাকরটা এবং এই ঝুপঝুপ বৃষ্টি গত দেড় বছরের উৎকট অপেক্ষা খতম করে দিয়েছে। এটাই ভাবা উচিত ছিল, কারণ তিনি নিজে অতি ক্ষুদ্র, দুর্বল এবং নগণ্য। এখন যদি আরো জোরে বৃষ্টি নামে তাহলে তাঁকে ধুয়ে নিয়ে যাবে ফুটপাথ থেকে নর্দমায়, একেবারে ড্রেনের তলায়।

তখন তাঁর মনে হল কাতিয়ার কথা। "না, না, ও অনেক দূরের জিনিস। তার কাছে কিছুতে না। কোথাও একটা সরাইখানায়।"

চৌমাথায় তাঁর দিকে তাকাল এক কুৎসিৎ চেহারার মেয়ে, মনে হল কে যেন তার গায়ে ময়দা ছিটিয়ে দিয়েছে। তার গায়ের বোয়াটা ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে।

'এত মুখ গোমড়া করে কেন গো?' ভাঙা গলায় প্রশ্ন করে সে তাঁকে হাতছানি দিল কাছে আসবার জন্য।

কুমারের গা বমি বমি করে উঠল, কিন্তু তিনি চললেন তার পিছনে।

মেয়েটা তাঁকে নিয়ে গেল একটা জীর্ণ দুর্গন্ধময় ঘরে। আলেক্সেই পেত্রোভিচ টুপি আর কোট না খুলেই অঢাকা টেবিলের পাশে বসে পড়ে ছোট ছেঁড়া কাপড়ের লাল সোফার ওপর পিন দিয়ে আঁটা কতকগুলো ফৌজী ভলাণ্টিয়ারের ফটোর দিকে তাকালেন। দরজার ফাটল দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন অর্ধেক জামাকাপড় পরা আর একটা মেয়েকে, তার চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে মাথা থেকে। কুমার তাকে লক্ষ্য করছেন দেখতে পেয়ে সে তার ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত বার করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার পিছনে এল একটা প্রকাণ্ড ছোকরা। লোকটার গায়ে টকটকে লাল সার্ট, মাথার চুল কোঁকড়া, চোখের তলার চামড়া ঝুলে পড়েছে। তার কাঁধে চামড়ার ফিতেয় ঝোলানো একটা হারমোনিয়াম। মাথা ঝুঁকিয়ে কোঁকড়া চুল নেড়ে পেটেণ্ট চামড়ার জুতোপরা একখানা পা চেয়ারের ওপর তুলে দিয়ে বাজনার চাবিগুলোতে আঙুল চালাল।

'হাঁ, হাঁ, গান,' বললেন কুমার, 'আপনাদের পয়সা দেব।'

আলগাচুলো মেয়েটা হলদে ড্রেসিং গাউন পিছনে সামলে নিয়ে তুড়ি দিয়ে গাইতে আরম্ভ করল অপ্রত্যাশিত মোটা গলায়। তার দিকে

চেয়ে টেবিল থেকে বোতলটা তুলে নিলেন কুমার, কে জানে কেমন করে হাজির হয়েছিল সেটা। পাউডারমাখা মেয়েটা তাঁর পাশে বসে তাঁকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তার জলে-ভরে আসা চোখের পাতাগুলো ন্যাড়া। অবাধ্য এক গোছা চুল যেমনি সে ঠিক করতে গেল অমনি পরচুলাটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা ছারপোকা।

বিতৃষ্ণার হাসি হেসে "বাহবা" বলে পুরো এক গেলাস মদ গেলে ফেললেন কুমার। বেজায় নেশা ধরে গেল তাঁর। মোটা গলায় মেয়েটা গাইতে লাগল, "বাঁধন-ছেঁড়া গানে ভাঙাব না মধুর স্বপন নবীন প্রিয়ার..." সেই মিঠে, যাচ্ছেতাই মদ গেলাসের পর গেলাস খেয়ে চললেন কুমার। হারমোনিয়ামের শব্দ ক্রমশ যেন দূর হতে আরো দূরে চলে যেতে লাগল। অবশেষে তিনি ওঠবার চেষ্টা করলেন মেয়েটার সেই ছারপোকাভরা বিশ্রী পরচুলাটা টেনে খুলে ফেলবার জন্য, কিন্তু পা টলে গিয়ে মেয়েটাকে ধরে ধরে গড়িয়ে পড়ে গেলেন মেঝের ওপর।

তাঁর ঘুম ভাঙল একটা অচেনা ঘরে লোহার খাটের ওপর— আগের দিন যে ঘরে গিয়েছিলেন সেটাতে নয়। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। অনেকক্ষণ ধরে ময়লা তোষকের ওপর বসে বসে আগের দিনের ঘটনা স্মরণ করলেন। তারপর টলতে টলতে এলেন বাইরের ঘরে। সেখানে পোঁটলা পুঁটলী গাদা করা, একখানা চেয়ারের ওপর কোন একটি জেনারেলের ছবি। কুমারের পায়ের শব্দে রান্নাঘরের দরজা খুলে গেল। একটা বলিরেখাঙ্কিতা বুড়ী মাথাটা বার করে তাঁকে খানিক দেখে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। সদর দরজা দিয়ে কুমার বাইরে এলেন। এটা একটা উঁচু পাথরের তৈরী বাড়ি, অথচ কাল ঢুকেছিলেন একটা কাঠের বাড়িতে। 'যমই জানে কী ব্যাপার,' বলে অনেকক্ষণ পায়ে হেঁটে বেড়ালেন। একটা গাড়ি ডাকবার মতো অথবা কোথায় যেতে

হবে মনে করার মতো জোর পাচ্ছিলেন না তিনি। বাতি জ্বালানো লোক তাঁর সামনে চলেছিল একের পর এক বাতিগুলো জ্বালিয়ে। পায়ের তলায় হলদে আলোর প্রতিবিম্ব দেখে মাথা নেড়ে বিষাদে তিনি একটা স্যাঁৎসেঁতে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। পকেট হাতড়ালেন সিগারেটের জন্য, কিন্তু পকেটে না ছিল সিগারেট, না ছিল টাকাকড়ির ব্যাগ।

দ্বিতীয় বার মনে পড়ল স্ত্রীর কথা। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, এখন তিনি এত কলঙ্কিত, অপদার্থ আর অশুচি যে এখন তাঁর পক্ষে কাতিয়ার চিন্তা সহজ ও মধুর মনে হচ্ছে। মোর্দভীন্‌স্কায়া যেন মুছে গেছে মন থেকে, তার ছবি মিলিয়ে গেছে রাস্তার জলকাদায়। তার সম্পর্কিত সবকিছু নিশ্চয় মরে গেছে সেই কদর্য রাত্রিতে। তাঁর অন্তর আনন্দে পূর্ণ হল। মনে হল যেন কষ্টকর পথের একটা অংশ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে — যে অংশটা সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক।

সর্বাঙ্গে কাদামাখা সপ্‌সপে ভিজে, কিন্তু শান্ত অবস্থায় অবশেষে তিনি হোটেলে পেঁছিলেন। দ্বারী তাঁকে চিনতে পারল না দেখে কুমার হাসলেন — তার মানে সেই রাত্রে তাঁর অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে গেছে। নিজেদের কামরার দরজায় পেঁাছে তোবড়ানো সিল্কের টুপি মাথা থেকে নামিয়ে চুলটা ঠিক করে নিয়ে দরজায় টোকা দিলেন।

একটা সাদা পশমের শাল জড়িয়ে কাতিয়া ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ তার ছাই'এর মতো সাদা, চোখ বিস্ফারিত, শুক্‌নো।

'কোথায় ছিলেন আপনি?' প্রশ্ন করে তাঁর দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কি জঘন্য।'

দরজা থেকে সরে না গিয়ে কুমার বললেন:

'কাতিয়া, আমার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। আমি বসতে পারি না, বসলে তোমার সর্বস্ব ময়লা হয়ে যাবে... কিন্তু সবকিছু যা ঘটেছে

তা ভাল, খুব ভাল।' এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর দিয়ে বাঁকা হাসি হেসে আরো বললেন:

'জানি না আর কখনও তোমার সঙ্গে দেখা হবে কিনা, কিন্তু এখন আমি বেঁচে গেছি, কাতিয়া।'

তাড়াতাড়ি কাতিয়া বলল, 'কী পাগলের মতো বকছেন—শুয়ে পড়া উচিত আপনার।'

'না, না, তুমি ভাবছ আমি মাতাল হয়েছি? সব তোমাকে বুঝিয়ে বলছি।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কুমার ঘরের চারদিকে তাকালেন, তারপর নিজের কাদামাখা জুতোর দিকে। তারপর মুহূর্তের জন্য অতি কোমল দৃষ্টিতে প্রায় অনুনয়ের সঙ্গে কাতিয়ার মুখের দিকে চেয়ে তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন সবকিছু, যেমন পরপর ঘটেছিল তেমন ভাবে, ভেনিসের খালের ওপর সেই মূর্তি দেখা থেকে।

শুনতে শুনতে কাতিয়া সোফার কাছে গিয়ে বসে পড়ল—পায়ের ওপর যেন দাঁড়াতে পারছিল না। সেই সকাল পর্যন্ত আদ্যোপান্ত সব ঘটনা সে বুঝতে পারল। শুধু কিছুতে এই কথাটা টের পেল না কী করে মোর্দভীন্স্কায়ার ছবি কুমারের মন থেকে মুছে গেছে। এদিকে এখন আলেক্সেই পেত্রোভিচের কাছে এইটেই সবচেয়ে বড় কথা। নিজের সম্বন্ধে তিনি বলছিলেন এমন ভাবে যেন তিনি এখন এক নতুন মানুষ, কালকের তিনি যেন অজানা, শত্রু, চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এটা তাঁর কাছে এত স্পষ্ট, এত ভাল আর নিজের সম্বন্ধে এত স্পষ্ট আর ভাল বোধ করছেন তিনি যে কিছুতেই বুঝতেই পারলেন না কেন কাতিয়া অত রাগ নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

'বেশ, একবারও কি আপনি আমার কথা ভেবেছেন?' শেষাশেষি আরক্তমুখে চীৎকার করে উঠল সে। 'এখন আমি কী করব? আপনার সঙ্গে কেমন করে থাকব?'

'তুমি? ও হ্যাঁ, তাই তো ...'

প্রকৃতপক্ষে কুমারের সমস্ত কথাবার্তা থেকে এই মনে হচ্ছিল যে কাতিয়ার এই মুহূর্তে জলন্ত আত্ম-বিসর্জন করা উচিত, নিজের সকল শুচিতা, তার অদ্ভুত নারীত্বের শক্তিকে অদ্ভুত অর্ঘ্যের মতো নিবেদন করে কুমারের শূন্য অন্তর পরিপূর্ণ করা উচিত।

আলেক্সেই পেত্রোভিচ তা বুঝলেন। আগের চেয়ে ঢের বেশী ঘৃণা হ'ল তাঁর নিজের ওপর। সত্যি, তিনি কী? একটা রক্তপায়ী জীব নাকি? অন্যের রক্ত পান করা — নিজের উদর পরিপূর্ণ করে তারপর খসে পড়া?

'কাতিয়া, আমি চিরকালের জন্য তোমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছি। পরে তুমি সব বুঝতে পারবে, প্রত্যেকটি জিনিস বুঝতে পারবে।' এই বলে হঠাৎ এল তাঁর অদ্ভুত একটা আনন্দ, গলা গেল ভেঙে। 'কাতিয়া, লক্ষ্মী আমার, মনে রেখো, মনে রেখো, যাই ঘটুক না কেন, আমি চিরকাল তোমার প্রতি অনুরাগী — শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তোমার অনুরাগী। বিদায়।'

মাথা নীচু করে নতি জানিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন আলেক্সেই পেত্রোভিচ। সেই দিনই তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মূল্যের মতো হুণ্ডি দিয়ে জমিদারী পরিচালনা করবার অধিকার দিয়ে দলিল লিখে দিলেন, নিজের জন্য মাত্র কয়েক হাজার রুব্‌ল্ রেখে। সেই রাত্রেই তিনি রওনা হয়ে গেলেন মস্কোয়।

মস্কোতে গিয়ে কী করবেন সে সম্বন্ধে তাঁর কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। একটা সস্তা হোটেলে একখানা ঘর নিয়ে প্রথম কয়েকদিন অপেক্ষা করতে লাগলেন সেই চরম আনন্দের মুহূর্ত একবার আসুক, ছড়িয়ে দিক দীর্ঘস্থায়ী অপরূপ আনন্দ তাঁর মনে। ধীরে ধীরে কিন্তু এইটেই স্পষ্ট হয়ে এল যে কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটবে না।

তার অতীত জীবন ক্ষণিকের জন্য অপসৃত হলেও মাথার ওপরে ঝুলছে, যে কোন মুহূর্তে চেপে দিতে পারে তাঁকে আবার। তার পরে এল অসহনীয় অবসাদের দিন, আরো অসহনীয় এই জন্য যে তিনি মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ দেখতে পেলেন না। স্ত্রীর কাছে ফিরে যাওয়া ছিল অসম্ভব। তাছাড়া কুমার জানতেনও না কাতিয়া কোথায় আছে, তিনি চলে আসার পর তার কী হয়েছে।

বিষাদ বেড়েই চলল। যন্ত্রণাটা কোথায় তা যেন প্রায় ঠিক করে বলা সম্ভব—বুকের মাঝখানে, মধ্যের হাড়টার ঠিক নীচে। সকাল সুরু হত সেইখানটায় একটা চাপা ব্যথায়, কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ সে জায়গাটায় মনে হত যেন জগদ্দল ভার। এক গেলাস মদে ব্যথাটা কমত। কুমার প্রথমে ব্র্যাণ্ডি খেতে আরম্ভ করলেন, তারপর ভোদ্‌কা। তখন জুটল পরিচিতের দল, দেখতে অদ্ভুত সব, কিন্তু লোক ভাল। কুমার তাদের নাম মনে রাখতে পারতেন না, মনে থাকলেও সন্ধ্যার দিকে তাদের মুখগুলো ঝাপসা হয়ে আসত। পুরুষ কি মেয়ে স্থির করা শক্ত হয়ে পড়ত তাঁর কাছে—তাছাড়া কীই বা এসে যায় তাতে? প্রায়ই তিনি তাস খেলতেন আর হারতেন। টাকা রইল নামমাত্র।

এই ঝাপসা সময়টায়—যখন সবকিছুই বিস্মৃতির তলায়—একজনের সঙ্গে দেখা হ'ল তাঁর, দেখাটা এমনিতে সামান্য হলেও তাঁর মনে দাগ রেখে গেল। একদিন কুমার ঈভেরস্কায়া গির্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। গির্জাটা ছিল যেন একটা দ্বীপ যেখানে পথচারীরা ক্ষণেক বিশ্রাম নিয়ে টুপি খুলে বুকে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে আইকনের কালো মুখ আর বাতিগুলোর দিকে তাকাত। কুমারও দাঁড়িয়ে পড়ে একটা প্রার্থনা মনে আনবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু একটাও মনে এল না। তিনি কেবল তাকিয়ে রইলেন সেই ঝকমকে আলোর দিকে এবং আইকনের চারপাশের অলঙ্কৃত ফ্রেম থেকে প্রতিফলিত আলোর দিকে। ঠিক সেই

সময়ে তাঁর পিছন থেকে একটি আনন্দপূর্ণ স্বর এল, "সদাশয় মহাশয়, যীশুর নামে পথচারীকে কিছু সাহায্য করুন"। কিছু খুচরো পয়সা বার করে কুমার মুখ ফেরালেন। তাঁর সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে এক নবীন সন্ন্যাসী। তার শীর্ণ মুখে বসন্তের দাগ, স্বচ্ছ চোখ হালকা নীল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে কুমারও হাসলেন। তাঁর মনে হল এই সন্ন্যাসী এমন একটা কিছু জানে যা অতি গুরুত্বপূর্ণ, যা তাঁরও জানা চাই-ই...

'এই যে গোটাকয়েক খুচরো পয়সা,' বললেন তিনি। 'আমার বাড়িতে এলে তোমায় একটা রুব্‌ল্ দেব।'

কুমারের স্মরণ নেই সে সন্ন্যাসী তাঁর কাছে এসেছিল কিনা, কিন্তু তাঁর মনে হয় সেই তীক্ষ্ণ নীল চোখজোড়া একবার মুহূর্তের জন্য দেখা গিয়েছিল তাস খেলুড়েদের মধ্যে, মেঘের মতো সিগারেটের ধোঁয়ার পিছন থেকে।

এল বসন্ত। কুমারের খালি ইচ্ছে হত কাতিয়ার কথা ভাবতে, না ভাববার জন্য তিনি আরো মদ খেতে লাগলেন, খেতে লাগলেন একেবারে বিরাম না দিয়ে। একদিন এক যুবক ব্যাবসাদার এল হোটেলে তাঁর ঘরে। সে নিজের পরিচয় দিল ভোল্‌গাপারের লোক বলে, জানাল যে সে নাকি কুমারকে তাঁর জমিদারীতে চিনত। কৌশল করে সে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই পেত্রোভিচের হালচাল এবং অন্য কথার মধ্যে তাঁকে বলল "নীলয়ের" গত শীতকালের সেই দুর্ঘটনার কথা।

ছোকরার এলোমেলো গল্প সত্ত্বেও একটা ধারণা পাওয়া সম্ভব হল, সেই শীতের রাত্রে ভোল্‌গানদীর ওপরে কী ঘটেছিল।

স্লেজটা পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েছিল বরফের একটা ফাঁকে। গাড়ির অর্ধেক জলে ডুবে যায়, কিন্তু একেবারে উল্টে যায়নি কারণ

মাঝের ঘোড়াটা বরফে সামনের পায়ের ভর দিয়ে সেটাকে সামলায়। কোচওয়ান কোনোপ্রকারে লাগামগুলো কেটে দিতে পেরেছিল। একটা ঘোড়া ডুবেই গেল, অন্যটা অতক্ষণে জলে হাঁকপাঁক করতে থাকল। কোচওয়ান ঘোড়ার দাণ্ডা ধরে শক্ত বরফের ওপর উঠে পাশের ঘোড়াটার ল্যাজ ধরে জল থেকে বের করতে সাহায্য করে তাতে চড়ে "মীলয়ে" লোক ডাকতে গেল।

কাতিয়া স্লেজের ছাতের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। গ্রিগোরী ইভানভিচ স্লেজের পাশের দাণ্ডায় কোমরজলে দাঁড়িয়ে (কোচবাক্সটাও জলে ডুবে গিয়েছিল, এবং খুব সম্ভব ভয়ে তিনি স্লেজের ছাতের ওপরে চড়েননি) কাতিয়াকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রেখে তার জ্ঞানহীন নির্নিমেষ চোখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

আবার বরফ পড়তে সুরু করে, হাওয়ারও জোর বাড়ে। ঝুরো তুষার রোঁয়ার মতো উড়তে লাগল নদীর ওপর, ঢেকে ফেলল কাতিউশার মড়ার মতো মুখ। এটা ছিল এত ভয়ানক যে গ্রিগোরী ইভানভিচ মাথা তুলে চীৎকার করে উঠলেন। মাঝের ঘোড়াটা পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কনকনে হাওয়ার স্লেজটা দুলতে লাগল। হঠাৎ জ্ঞান হতে কাতিয়া উঠে বসে পাতলা মোজাপরা পা দুখানা পাশে ঝুলিয়ে চারিদিক দেখে দুই হাতে হতাশার ভঙ্গি করে গ্রিগোরী ইভানভিচের মুখ তার বুকে চেপে ধরল, যেন তাঁকে ছেড়ে দিতে তার অসীম ভয়। এইভাবে চুপচাপ তারা বসেছিল যতক্ষণ না "মীলয়ে" থেকে মজুরেরা দড়ি আর লগি নিয়ে ঘোড়ায় চেপে সেখানে পৌঁছয়। বরফের ফাঁকের কাছে নেমে এসে তারা প্রথমে ভাবে বুঝি রাজকুমারী আর ডাক্তার দুজনেই ঠাণ্ডায় জমে মরে গেছেন। কিন্তু পরেই তারা দেখতে পেল যে একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনার মাথাটা সামান্য একটু এক পাশে ফিরে দেখছে কেমন করে তারা লগিগুলো পাতছে,

স্লেজটার চারিদিকে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে সেই বিশ্বস্ত মাঝের ঘোড়াটাকে টেনে তুলছে শক্ত বরফের ওপর। তারপর ঘটল এক অভাবনীয় ব্যাপার। স্লেজটা শক্ত বরফের কিনারে পৌঁছিয়ে চাষাভূষোর জোরালো হাতে রাজকুমারীকে টেনে তারা তুলেছে, এমন সময় গ্রিগোরী ইভানভিচ মাথা তুলে মুখ খুললেন। তারা সবাই শুনতে পেল তাঁর আড়ষ্ট জিভ দিয়ে বেরোল এই কটি কথা — "না, না, ছুঁয়ো না"। কাতিয়ার দিকে হাত বাড়ালেন তিনি, মুখ দিয়ে একটা আর্তনাদ বেরোল, তারপর চীৎকার করে সটান আড়ষ্টভাবে জলে পড়ে একটা পাথরের মতো ডুবে গেলেন বরফের তলায়।

রাজকুমারীকে ভেড়ার লোমের কোটে বেশ করে ঢেকে একটা স্লেজ-গাড়িতে করে "মীলয়েতে" নিয়ে যাওয়া হ'ল। পরের দিন আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ এসে মেয়েকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন।

এই গল্পের আলেক্সেই পেত্রোভিচের মনে যেটা সবচেয়ে দাগ কাটল তা হচ্ছে ডাক্তার জাবোতকিনের মৃত্যু। তিনি এ বিষয়ে যত ভাবলেন তত তাঁর কাছে পরিষ্কার হতে লাগল যে এটা একটা সাধারণ আকস্মিক মৃত্যু নয়, এ মরণের আনন্দ, আত্মোৎসর্গ।

এই সব চিন্তা মনকে বড় অস্থির করে তুলল। কুমার এ পর্যন্তও নিশ্চয় করে জানতেন না কাতিয়া এখনও বেঁচে আছে কিনা। মস্কোতে পড়ে থাকা এখন তার অসম্ভব মনে হল। শেষ একশ রুব্‌লের নোটটা খবরের কাগজে জড়িয়ে য়ারস্লাভ্‌লে গিয়ে স্টীমারে চড়ে বসলেন।

একবার তিনি ভাবলেন "মীলয়ের" কাছাকাছি কোন একটা গাঁয়ে গিয়ে কাতিয়ার খবর নেবেন, কিন্তু পরে মত বদলালেন। তাঁর একমাত্র কর্তব্য "মীলয়ের" পাশ দিয়ে যাওয়া, সেখানকার সেই বাতাস একবার মাত্র বুক ভরে নেওয়া, তারপর জাহান্নমে যাক সব, ডি. টি.'তে মৃত্যু হ'লেও ক্ষতি নেই।

২

আলেক্সেই পেত্রোভিচ এক পাশ ফিরে শুয়েছিলেন একযাত্রীর একটা কেবিনে। দেওয়ালগুলো টিন দিয়ে মোড়া আর বাদাম-গাছের মতো রঙ করা। দরজার কাছে মুখহাত ধোবার বেসিনে শোনা যায় জলের কলকল। খড়খড়িগুলো কাঁপছিল। সূর্যের আলো জলে প্রতিফলিত হয়ে খড়খড়ির ফাটল দিয়ে এসে সাদা ছাতের ওপর পড়ছে কম্পমান ঝলকে।

আয়নার সামনের টেবিলে ভোদ্‌কার পাত্র, একটা রেকাবী, খবরের কাগজে খানিকটা তামাক। মেঝেতে একটা স্যুটকেস, প্রায় খালি, তাঁর কোটটা পায়ের কাছে।

গ্রীষ্মের গরমে এঞ্জিনের একটানা ধক্‌ধক্ শব্দে ঘুম পায়। নরম বাঙ্কে, জানালা দিয়ে বয়ে আসা হাওয়ায় সহজেই চোখ বুজে আসে। আলেক্সেই পেত্রোভিচের নাক ডাকছিল। তাঁর মুখ লালচে, মাতালের যেমন হয়। কিছুকাল ধরে তিনি খাবার প্রায় কিছুই খাচ্ছিলেন না, খালি মদ টানছিলেন আর স্বাদহীন খাবারগুলো নাড়াচাড়া করছিলেন। মদে পেট যখন অত্যন্ত জ্বালা করে উঠল, মুখ শুকিয়ে এল, তখন ভ্রূ কুঁচকে জেগে উঠে হাত বাড়িয়ে ক্‌ভাসের বোতলটা থেকে এক চুমুক খেয়ে পা গুটিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে পড়ে রইলেন।

নদীর ওপর লোকের প্রচণ্ড খিদে পায়। দুপুরের খাওয়া শেষ হতে না হতেই মনে হয় চা'এর ঘণ্টা পড়ল। দরজায় কেউ টোকা দিল। "এখন একটু নোন্‌তা কিছু পেলে মন্দ হ'ত না," মনে হ'ল কুমারের, আধো ঘুমে "উঁ!" শব্দ করে একটা চোখ মেললেন।

আর একবার টোকা পড়ল দরজায়।

কাঁপা স্বরে বললেন তিনি, 'আমার জন্য যত ঠাণ্ডা পার একটা বোতল এনে দাও বাপু, সঙ্গে কিছু...'

"নোন্‌তা কিছু—সেই বেশ ভাল," আবার মনে মনে বললেন তিনি। "সামান্য নুনমাখানো মাছ্ হলেই মদও চলবে।"

দরজায় ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ সমানে চলেছে।

ঝট্ করে বাঙ্ক থেকে পা নামিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলতে খুলতে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ কী শয়তানি, চাও কী?'

দরজাটা অতি সাবধানে ফাঁক করে সেই বেণী বাঁধা, পাদ্রির উঁচু কালো টুপি পরা নবীন সন্ন্যাসী ঢুকল। পোষাকের সরু হাতার মধ্যে তার হাতের আঙুলগুলো ঢোকানো।

'আর তুমি শয়তানের নাম নিচ্ছ! নমস্কার!' বলে সে নীচু হয়ে নমস্কার করে হাসিমুখে তাকাল কেবিনের বিশৃঙ্খলার দিকে।

এক রকম ভয়ের সঙ্গে কুমার সোজা তাকালেন সেই বসন্তের দাগওয়ালা ছোট্ট মুখখানার মধ্যে পরিষ্কার নীল চোখের দিকে। সন্ন্যাসীর চেহারাটা দেখলে মনে হয় সে যে ছোট্ট ছন্নছাড়া তা নয়, কিন্তু যেন ছাড়ার কিছুই নেই তার।

'আমি ভিক্ষা চাইতে এসেছি,' বলে চলল সন্ন্যাসী। 'আমাদের কাপ্তেন বেশ ভাল লোক। তিনি বললেন ভিক্ষা চাইতে পার, কেবল চুরি করো না। লোকে যখন আমাকে ভিক্ষা দেয় তখন আমি চুরি করতে যাব কেন? তিনি বললেন তুমি একটা পাঁড় মাতাল। তা সম্পূর্ণ ঠিক নয়, কী বল? তোমাকে তো আমি খুব ভাল করে চিনেছি।'

আলেক্সেই পেত্রোভিচের পাশে বসে তাঁর হাঁটুতে হাত রাখল সে। কুমার একটু সরে বসে ফোলা ফোলা বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগলেন এই আগন্তুককে।

হঠাৎ সন্ন্যাসী প্রশ্ন করে বসল, 'ভাবনাচিন্তা না থাকলে মানুষ শুয়োরের শামিল হয়ে যেত—একথা সত্যি, নয়কি?'

আলেক্সেই পেত্রোভিচ মাথা নেড়ে ছোট নিশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন :

'আমার চেয়ে খারাপ ভাবে জীবন যাপন করা অসম্ভব।' তারপরেই তাঁর হুঁশ ফিরে এসে রেগে উঠে বললেন, 'শোন, আমি তো তোমায় ডাকিনি, তুমি এলে কেন? দয়া করে বিদায় হও, তোমার উপস্থিতি ছাড়াই যথেষ্ট যন্ত্রণা আমার।'

'মরে গেলেও যাব না আমি,' বলল সন্ন্যাসী। 'দেখছি তুমি এখন একেবারে পেকে গেছ। না, তোমার কাছছাড়া হব না।'

আলেক্সেই পেত্রোভিচ সজোরে মাথা নাড়লেন। সবকিছু গুলিয়ে গেছে, আবছা হয়ে এসেছে তাঁর মনে। তিনি আবার বললেন দুঃখের স্বরে, 'হয়তো তুমি মরীচিকা? হাঁ, তাহলে বড় খারাপ হবে। শোন. তুমি ভোদ্‌কা খাও?'

'কিসের জন্য?'

আলেক্সেই পেত্রোভিচ আবার তাঁর ঘোলাটে চোখ তুললেন। সন্ন্যাসীর মুখটা কেবিনের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে মনে হ'ল তাঁর।

'খাও, নইলে খুন করব।' বিকৃত স্বরে চীৎকার করে উঠলেন তিনি। সন্ন্যাসী শুধু মুচকি হেসে চলল। অবসন্ন হয়ে কুমার শুয়ে পড়ে চোখ বুজলেন।

'ছি-ছি-ছি, লোকটা কোথায় নেমে এসেছে!' একটু থেমে বলে চলল অপ্রত্যাশিত সবল তীক্ষ্ণ স্বরে, 'আমি তোমায় দেব অন্য পানীয়। তাতে তোমার খিদে মিটবে আর তুমি বেঁচে থাকবে... মন দিয়ে শোনো আমার কথা... অনেক পেয়েছিলে তুমি, কিন্তু সব হারিয়েছ। কিন্তু তুমি সব হারিয়েছ অনেক কিছু পাবার জন্য নয়, শাশ্বতকে পাবার জন্য। ওঠো, যেখানে যেতে বলব, সেইখানে তোমায় যেতে হবে।'

কুমার মনে মনে ভাবলেন, "চেঁচিও না বাপু, সব করব আমি— তুমি গেলেই ভাল"। সন্ন্যাসী আলেক্সেই পেত্রোভিচের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাঁর মাথায় হাত বুলোতে লাগল। কুমার আবার চোখ পাকালেন।

সন্ন্যাসী বলতে লাগল, 'আমার সঙ্গে চলো, ভায়া। আমি তোমায় ঠিক কথা বলছি। এই জীবন ছাড়ো। শীগ্গিরই আমরা উন্দোরী পেঁাছব, সেইখানে তুমি স্টীমার থেকে নামবে। আমাকে তীরে খুঁজে পাবে। ভাল করে ভেবে দেখে এসো, বুঝলে?'

চুপচাপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সম্ভবত চলেই গেল সে— দরজার ছিটকিনিটা খট্খট্ করে নড়ে উঠল।

আলেক্সেই পেত্রোভিচ সেইখানে শুয়েই রইলেন। কষ্টে চিন্তাগুলোকে গুছোতে লাগলেন যাতে টের পেতে পারেন সত্যিই একটা লোক এতক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলছিল, না তিনি নেশার ঘোরে এ সব দেখছিলেন।

অনেকক্ষণ কাটল এইভাবে। রৌদ্রের ঝলক ছাতে বহুক্ষণ ধরে দেখা যাচ্ছে না। কেবিনটা ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। শীঘ্রই আয়নার ওপরের বাতিটা দপ্দপ্ করে আরো জোরে আপনিই জ্বলে উঠল।

'সব বাজে,' বলে উঠলেন কুমার। 'কালকেও তো এমনি স্বপ্নে দেখেছিলাম একটা হলদে টুপি-পরা ঘোড়দৌড়ের জকিকে।'

উঠে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখে নিয়ে কোনরকম খোঁড়া পা টেনে সেকেণ্ড ক্লাসের খাবার ঘরে গিয়ে এক কোণে বসলেন কারো দিকে না তাকিয়ে। লোকের কথাবার্তা যাতে না শুনতে হয় তাই কনুই দুটো টেবিলের ওপর রেখে দুটো হাত চাপা দিলেন কানে। একজন খানসামা একপাত্র ঠাণ্ডা ভোদ্কা আর কিছু মাছ এনে দিল। ঘেমে ওঠা গেলাসটা ভর্তি করে তাতে একটু মরিচ মিশিয়ে

আস্তে আস্তে খেয়ে ফেললেন, তারপর একমুখ মদের গন্ধওয়ালা নিঃশ্বাস ছেড়ে মাছটার দিকে আড়চোখে তাকালেন।

ঠিক সেই সময়ে বাঁশির আওয়াজ করে স্টীমারটা ঘুরতে আরম্ভ করল। জানালার পর্দা ফুলে উঠল, কাছের এক টেবিলে নিশ্চিত স্বরে কে একজন বলল:

'উন্দোরী ...'

আলেক্সেই পেত্রোভিচ তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে আস্তে "তাই নাকি?" জিজ্ঞেস করে অন্ধকার ডেকে বেরিয়ে গেলেন।

জেটির দিকে ঘোরার সময় স্টীমারটা কালো জল আবার তোলপাড় করতে থাকল। পাশেই খুব কাছাকাছি সুতীব্র আলোতে দেখা গেল একটা নৌকো জলে উঠছে নামছে, তার মধ্যে দুটো ছেলে, একজন দাঁড় বাইছে আর একজন বালালাইকা বাজাচ্ছে। নৌকোটা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রেলিঙে ভর দিয়ে কুমার দেখতে লাগলেন স্টীমারটা ঘাটের কাছে এল, খালাসীরা দড়ি ছুঁড়ল আর সেগুলো ছোট কাছারির ছাদে পড়ল শব্দ করে, একটি খালাসী আর তিনটে ছেঁড়া পোষাক পরা লোক নামবার সিঁড়িটা লাগাল, মালখালাসীরা মাথায় ছালা উঁচু করে পরে লম্বা লম্বা পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে এল।

তারপর অনেক লোক বেরিয়ে এল স্টীমারের পেটের ভিতর থেকে। বাক্স পোঁটলা পিঠে নিয়ে তারা টিকিট গুঁজে দিতে লাগল খালাসীর হাতে।

আলেক্সেই পেত্রোভিচ মন দিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে উঠলেন মেয়েদের আর চাষাদের মাঝে সেই অতি পরিচিত চোখজোড়া দেখতে পেয়ে। তখনি তা এক বোঝা পশমের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুমার তাড়াতাড়ি নীচে নেমে ভীড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে ঠোঁট কামড়ে অধীরভাবে চারিদিক দেখে নিলেন।

জেটি থেকে দ্রুতপায়ে উঠলেন তীরে যেখানে মেয়েরা লণ্ঠন জ্বালিয়ে পসরা সাজিয়ে বসে চীৎকার করে যাত্রীদের দিকে শূয়োরের মাংসের রোস্ট আর ছোট ছোট পাঁউরুটি বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

বালুময় তীরে আলেক্সেই পেত্রোভিচ স্তূপাকার বস্তা আর মালপত্রের মধ্যে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলেন। তাঁর খালি এইটুকু মনে আছে যে একজনকে খুঁজে বার করে জিজ্ঞেস করতে হবে তারপর কী করবেন। একবার তাঁর মনে হ'ল খুব পরিচিত কাউকে যেন দেখলেন একটা টেবিলের সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। আরো পরে দূরে গাড়িগুলোর মধ্যে মনে হ'ল যেন কে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

'আমাকে লোভ দেখাচ্ছে,' ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে আলেক্সেই পেত্রোভিচ মাথা নীচু করে ছুটলেন গলিঘুঁজি পথ দিয়ে সেই গাড়িগুলোর দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে স্টীমারের বাঁশি বেজে উঠল, জেটি ছাড়ল স্টীমারটা, তার আলোগুলো নিভে গেল।

৩

'আরে ঐ, থামো, দাঁড়াও আমার জন্য!' চলন্ত স্টীমারের পিছনে চীৎকার করলেন আলেক্সেই পেত্রোভিচ সিঁড়ির দিকে খোঁড়া পায়ে ছুটে আসতে আসতে।

একজন খাটো চেহারার মালখালাসী তাঁর পথ আটকে বলল, 'বড্ড দেরী হয়ে গেছে, বাবুমশায়, স্টীমার যে ছেড়ে গেছে।'

একটি খালাসী, হাটের মেয়ে কয়েকজন আর ছাগলদাড়িওয়ালা এক ব্যতিব্যস্ত চাষা এল তাঁর কাছে। তাঁকে ঘিরে ধরে সকলে মিলে

প্রশ্ন করতে লাগল — কোথায় যাচ্ছেন, কোথা থেকে আসছেন, স্টীমারে টাকা ফেলে এসেছেন নাকি, তাঁর বিয়ে হয়েছে কিনা ইত্যাদি। অবাক হওয়ার শব্দ করে তারা ঘাড় নাড়তে লাগল। ব্যতিব্যস্ত চাষাটি এমন ব্যস্তসমস্ত হতে লাগল যেন তাকেই পিছনে ফেলে গেছে। মেয়েদের মধ্যে একজন অন্যদের ঠেলে আলেক্সেই পেত্রোভিচের একেবারে নাকের ডগায় এসে সানন্দ বিস্ময়ের সঙ্গে দুনিয়ার সকলকে জানিয়ে দিল:

'আরে, এ যে মাতাল!..'

তখন সবাই শান্ত হয়ে কুমারের প্রতি বন্ধুত্বের ভাব দেখাতে আরম্ভ করল।

এই সব আজেবাজে প্রশ্নবাণে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে কুমার ভীড় ঠেলে পালিয়ে নদীর তীর ধরে চললেন।

"কোথাও মুখ থুবড়ে পড়ে মরব আমি, ভালই হবে তাহলে," ভাবলেন তিনি। "কেউ আমাকে চায় না। যতক্ষণ শক্তি আছে চলতেই থাকি। কী আফসোস, উঃ কী আফসোস। এই রকম করে আমার জীবন শেষ হবে।"

প্রথমে আলেক্সেই পেত্রোভিচ চললেন বালুময় নদীর তীর ধরে। স্টীমারের তোলা অদৃশ্য ঢেউগুলো ধীরে এগিয়ে আসছিল তীরের দিকে। শীগ্গির কিন্তু তিনি এমন একটা জায়গায় পৌঁছলেন যেখানে তীরটা গভীর খানায় ভর্তি, তিনি হোঁচট খেতে লাগলেন। পাশে মোড় নিয়ে চললেন উঁচু টিলা বেয়ে মাঠের দিকে।

কষ্টে ওপরে ওঠার পর তবে তিনি দেখতে পেলেন মাথার ওপরে অসংখ্য তারা। ঘাস ইতিমধ্যেই কাটা হয়ে গাদা করা হয়ে আছে। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কাছাকাছি একটা ভারুই'এর ডাক শুনলেন, তারপর আরো জোরে হাঁটতে আরম্ভ করলেন — নদীর তীরে বালিতে পা বসে যাচ্ছিল, তার চেয়ে এখন হাঁটা সোজা।

"যেন আমার পিছনে কেউ তাড়া করেছে এমনভাবে কোথায় ছুটে চলেছি আমি?" মনে হ'ল তাঁর। তখনই মনে পড়ল যে তিনি তো একবারও পিছন ফিরে তাকাননি। হঠাৎ ভয়ে উবু হয়ে বসে তিনি আস্তে আস্তে কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে তাকালেন।

উঁচু টিলার পিছন থেকে তারার আলোয় ধূসর মাঠে আসছে উঁচু টুপি পরা সন্ন্যাসীর কালো মূর্তি।

"তাড়া করেছে আমায়," ভাবলেন কুমার, "লুকোতে হবে।" মাটির দিকে নীচু হয়ে ঝুঁকে সবচেয়ে কাছের ঘাসের গাদা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে শুয়ে পড়লেন তার মধ্যে, পা দুটো গুটিয়ে নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে। শুকিয়ে আসা ঘাসগুলোতে কেমন অদ্ভুত বিষপাতা আর বুনো পেঁয়াজের গন্ধ। দম আটকে এল তাঁর। হঠাৎ সন্ন্যাসী তাঁর পাশ দিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে গেল। নীল আলোয় তার চোখদুটো যেন ঝকমক করে উঠল।

"কী শয়তান!" ভাবলেন কুমার ভয়ের সঙ্গে। "এখন আমি গেলাম। ও কি দেখতে পাবে আমায়? চলে গেল, বাঁচা গেছে... না, ফিরল যে! জানোয়ারের মতো ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছে... টুঁশব্দটি করা চলবে না... হয়তো আমি আবার কল্পনায় সব দেখছি, কেবিনে শুয়ে থেকে স্বপ্ন দেখছি?... না তো, এই তো মাটি, এই শুকনো ঘাস... ঐ তো তারার দল। আহা লক্ষ্মী তারারা, আমি চিরকাল তোমাদের ভালোবেসেছি... হে ভগবান, এই মুহূর্তে আমি বিশ্বাস করি তোমাতে।"

আলেক্সেই পেত্রোভিচ বুকে হাত রেখে মাথাটা একপাশে ফিরিয়ে কাতরিয়ে উঠলেন। ঠিক সেই সময়ে সন্ন্যাসী শুকনো ঘাসের গাদাটা ঘুরে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ে তাঁর কাঁধে হাত বোলাল। চীৎকার করে উঠেই তখনই আবার ধপাস্ করে পড়ে গেলেন কুমার। তাঁর বিস্ফারিত চোখে সম্পূর্ণ উন্মাদের দৃষ্টি।

'ভয় পেও না,' মৃদু গলায় বলল সন্ন্যাসী। 'দেখছ তো কী রকম দুমড়ে যাচ্ছ? আমার কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়াও কেন?'

'আর করব না,' কষ্টে বললেন আলেক্সেই পেত্রোভিচ। 'এখন দেখছি তুমি সেই ইভের্স্কায়ার সন্ন্যাসী। তুমি যা বলেছিলে তা তো করেছি ...'

সন্ন্যাসী হাসল। কুমারের মনে হ'ল তার গোঁফটা ফাঁক হয়ে তার তলা দিয়ে জিভটা বের হয়ে আবার ঢুকছে, যেন টিকটিকির জিভ...

তক্ষুণি উঠে পালাতে চাইলেন কুমার, কিন্তু সন্ন্যাসী তাঁকে ধরে আবার টেনে নামাল শুকনো ঘাসের গাদার ওপরে। বলল:

'হায় ভগবান, কী মূর্খ তুমি। যাক, যখন উপায় নেই, আমাদের এই ঘাসের ওপরেই শুয়ে থাকতে হবে। প্রথমে ভেবেছিলাম কোন একটা গাড়ির ওপর রাত কাটাব, ঘুমোতে পারতাম সেখানে ... কুছ্ পরোয়া নেই, এখানেই ঘুমিয়ে পড়ো ভায়া, আমি তোমায় একটা গান গেয়ে শোনাচ্ছি।'

কুমারের পাশে শুয়ে পড়ে শীগ্গিরই সে সরু টানাসুরে গান ধরল:

ঘুমে ঢলে পড়ে, মাগো মা,
দেখলাম আমি এক যে আজব স্বপন।
সাদা ঘোড়ায় চড়ে, মাগো মা,
পার হচ্ছি মাঠের পরে মাঠ।
পড়ল খসে টুপি মাথার থেকে,
দেখি যে প্রায় বেঁচে নেইকো আমি...
উদ্ধারের আর নেইকো কোন আশা
ভয়ঙ্কর সে কপালের হাত থেকে।
বললে তখন, মাগো, আমার মা —
'ঐ যে দেখি ঘোড়ায় চড়ে যায়
কার বুঝি এক কনে,
আগাগোড়া সাদা পোষাক যে তার --
আগাগোড়া সাদা পোষাক পরে
সে কি আমার খোকামণির বউ?

## ৪

বন্ধ চোখের পাতায় সকালের রোদ পড়তে আলেক্সেই পেত্রোভিচের ঘুম ভাঙল। হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠে তিনি গোঙিয়ে উঠলেন — সমস্ত শরীর ব্যথায় টনটন করছে।

সন্ন্যাসী ঘাসের গাদার ওপর কাছেই উঠে বসেছে। তার সামনে পাতা একটা তোয়ালের ওপরে একটা ছুরি, রুটি আর দুটো পেঁয়াজ।

ঝকঝকে দাঁত দিয়ে সে আর একটা পেঁয়াজে কামড় দিচ্ছিল। বসন্তের দাগওয়ালা তার মুখে, নীল চোখের চারপাশে আর চিবোন গোঁফের তলায় খেলে যাচ্ছে হাসির কুঞ্চন।

'নেশা কাটল?' জিজ্ঞেস করেই বলল সে। 'নাও, এইটে চুমুক দিয়ে নাও। তোমার জন্যে জমিয়ে রেখেছিলাম — কিন্তু আর পাবে না, ব্যস।'

মাথা থেকে টুপিটা খুলে তা থেকে এক ঢোক গরম ভোদ্‌কা ভরা একটা শিশি বার করে আলেক্সেই পেত্রোভিচকে দিল। তিনি শিশিটা নিলেন, অনেক কষ্টে মনে করতে চেষ্টা করলেন কী ঘটেছে। ভোদ্‌কায় চুমুক দিয়ে মাথাটা সাফ হ'ল, শিরায় রক্তও বইতে লাগল জোরে। কুমার উঠলেন, চট্‌কানো জামাকাপড় একটু দুরস্ত করলেন, তারপর ঘাড়ের যে জায়গাটায় কলারের ঘষ্টানি লেগেছিল সেখানটায় হাত বুলিয়ে কলারটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

'এখন তোমার প্রাণে একটু স্ফূর্তি এসেছে,' সন্ন্যাসী বলল। 'তাজা হাওয়া খানিকটা নিঃশ্বাসে ভরে নাও — দেখ দেখি কেমন হলদে হয়ে গেছ তুমি।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' জবাবে বললেন আলেক্সেই পেত্রোভিচ। 'তুমি আমায় স্টীমার থেকে নামিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? আমি যাচ্ছিলাম কাজে।'

'স্রেফ বাজে কথা, তোমার কিছু কাজ নেই।'

'তুমি আমায় নামালে কী জন্য?'

'তুমি বাঁচবে বলে। গ্রীষ্মকালে এ ছাড়া করবার আছে কী? কাজের কথা যদি বল—তুমি তো কোন কাজেরই নও, দুর্বল আর খোঁড়া। শীতকালটা অবিশ্যি বেজায় ঠাণ্ডা। তখন আমি চেষ্টা করি হাজতে ঢুকতে। পাসপোর্টটা লুকিয়ে ফেলে থানায় গিয়ে বলি, "আমার কিছুই মনে নেই, আত্মীয়স্বজন কারো কথা মনে নেই, কোথাও থাকবার জায়গাও নেই।" তারা আমায় খেতে টেতে দেয়। তারপর বসন্তকাল এলে নিজের পরিচয় দিই। কখনও কখনও এই চালাকির দরুণ পিটুনিও খেয়েছি। এই হ'ল ব্যাপার।'

আলেক্সেই পেত্রোভিচ ভ্রূ কুঁচকে মন দিয়ে শুনলেন। সন্ন্যাসীটাকে অপ্রীতিকর লাগছিল, কিন্তু তার কথার মধ্যে ছিল স্পষ্টতা আর জোর। "চুলোয় যাক," ভাবলেন কুমার, "কিন্তু ওকেও জাহান্নমে পাঠালে তার পরেই বা কি? আবার স্টীমারে? যাব কোথায়? কিসের জন্য? তবে কি ওর সঙ্গেই যাব? মজার ব্যাপার যাহোক। হঠাৎ ভবঘুরের মতো পথে পথে ঘুরতে চলেছি।"

চোখ কুঁচকে আলেক্সেই পেত্রোভিচ প্রশ্ন করলেন, 'জানো তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ?'

ধূর্ত ভাবে চোখ মট্‌কে সন্ন্যাসী বলল, 'তুমি তুর্কীর সুলতান হ'লেও আমি পরোয়া করি না।'

"যম জানে এ সব কী পাগলামির ব্যাপার," মনে মনে বললেন কুমার। "মনে হচ্ছে সত্যিই ওর সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়ব আর কোথাও না কোথাও টুপ্‌ করে মরে যাবে। তুর্কীর সুলতান!" তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বললেন:

'আরো শুনি — আমরা কী করে ঘুরে বেড়াব?'

চললেন তাঁরা মুড়োনো মাঠের ওপর দিয়ে দূর বনের দিকে। বনের মাথার ওপর উঁচুতে সাদা মেঘের স্তূপ।

বনের পিছন থেকে ধীরে ধীরে উঠে মেঘগুলো মাঠের ওপরে শীতল ছায়া ফেলে ভাসতে ভাসতে সমস্ত আকাশ অতিক্রম করে উল্টো দিকে চক্রবালে জমতে লাগল। সূর্যের অবস্থিতি থেকে বোঝা যাচ্ছিল আটটা বেজে গেছে। নীল-ধূসর দূরসীমায় নীল নদীর সমস্ত বুকটা ঝকঝক করছে চক-খড়ির পাহাড়ের পিছনে বাঁকটা পর্যন্ত।

প্রথমে নদীর দিকে, তারপর বনের দিকে মুখ ফিরিয়ে সন্ন্যাসী বলে উঠল, 'দিক না দেখি আমায় এখান থেকে তাড়িয়ে। কিছুতেই পারবে না। আমার যেখানে খুসী বাস করার অধিকার আছে, কাঠবেড়ালীর মতো। জানো তুমি কেমন করে থাকে কাঠবেড়ালীরা?'

সে বলতে লাগল কেমন করে থাকে তারা। তারপর একটা গঙ্গাফড়িং ধরল, চাইল তার আলকাতরা। পায়ের তলা থেকে একটা ভারুই উড়ে যেতেই হাত তালি দিয়ে বলল:

'হুঁশিয়ার ল্যাজকাটা কোথাকার।'

আলেক্সেই পেত্রোভিচ চোখ কুঁচকে সঙ্গীর অল্প পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। তাঁর বোধ হতে আরম্ভ করেছিল যে শীগ্গির তাঁরা পৃথিবীর প্রান্তসীমায় পৌঁছে যাবেন, তারপর স্ফটিকের মতো পরিষ্কার হাওয়ার মধ্যে দিয়ে মেঘের রাজ্যে, তারপর আরো উঁচুতে, যেখানে শুধু বাতাস আর রোদ।

অল্প পরেই হাঁটতে হাঁটতে পরিশ্রান্ত হয়ে রাস্তার ধারে বসে পড়ে খেতে চাইলেন কুমার।

"আশ্চর্য, অভাবনীয়," মনে মনে ভাবলেন আলেক্সেই পেত্রোভিচ খাওয়ার পরে চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে। "আকাশটা কেমন নীল। সত্যিই

যদি ঘুরে ঘুরে বেড়াব — লোকে তো পৃথিবী ঘুরে ঘুরে বেড়ায়... বাড়তি যা কিছু আছে সব হাওয়ায় উড়ে যায়, হ্যাঁ, ঠিক তাই, হাওয়া আর মেঘ, ব্যস! আর আমি যে আঘাত পেয়েছি, সন্ন্যাসীও তো পেয়েছে। দাঁড়াও, কিন্তু ইভের্স্কায়ার সেখানে ও আমাকে কী বলেছিল? ঠিক, ঠিক, সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে এই ঘোরা, এই মুক্তি আর হালকাভাব, স্ফটিকের মতো পরিষ্কার এই। সমস্ত পৃথিবী অবাক লাগে — মনে রাখবার কিছু নেই, অভ্যস্ত হবার কিছু নেই..."

সন্ধ্যায় বনের মধ্যে এসে তাঁরা রাত কাটালেন একটি স্ত্রীলোকের বাড়ির ভাণ্ডারে খড়ের গাদায়। সে কেবল জিজ্ঞেস করল, "তোমরা চোর নও তো বাপু?"

সকালে আবার তাঁরা চললেন মাঠ ধরে। দুধারি ঢেউ খেলে যাচ্ছে পেকে আসা রাই-শীর্ষ, পায়ের তলা থেকে গঙ্গাফড়িং লাফিয়ে পড়ছে তাতে। অলেক্সেই পেত্রোভিচ বলতে আরম্ভ করলেন পায়ে লাগছে। সন্ন্যাসী তাঁর জুতোজোড়া খুলে নিজের ঝুলিতে রেখে কুমারের পা পশমের পাবাঁধা ন্যাকড়া দিয়ে মুড়ে দিল; হাঁটা সহজ আর মসৃণ হল। সন্ন্যাসী যা বলছিল আলেক্সেই পেত্রোভিচ তাই করছিলেন, লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলেন যে তাঁর সমস্ত জীবন এখন পড়ে রয়েছে পিছনে, সেই হলদেরঙের কেবিনটার মধ্যে, আর এখানে তাঁর সামনে কেবল বাতাস দুলিয়ে যাচ্ছে শস্যক্ষেত্রকে, দূরে ধুলোর রাশি, দুই মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একখানা গাড়ি, তার কাছেই অল্প একটু ধোঁয়ার কুণ্ডলী। আর সেই নীল-ধূসর, মরা সমুদ্রের মতো, কম্পমান দূরসীমার ওপারে রয়েছে কাতিয়া, তাকে এখান থেকে দেখা যায় না।

একদিন রাইশস্যের ক্ষেতে শুয়ে মাথার ওপর দোলা সোনালি শিষগুলো দেখতে দেখতে কুমার বললেন, 'জান তো, এখানে আমার এক বোন থাকে, তার নাম কাতিয়া।'

'আমরা যাব, দেখা করব বৈকি তাঁর সঙ্গেও,' জবাবে বলল সন্ন্যাসী। 'গ্রীষ্মকাল অনেকদিন থাকে আর মানুষ হ'ল মেঘের মতো। লেখায় বলে—লাঠি ধরো, চলো আগে—যাতে ঘরের জীবনে অভ্যস্ত না হতে হয়, যাতে বেশী পাপ না জমে ওঠে।'

আলেক্সেই পেত্রোভিচ কিন্তু তার যুক্তির শেষ পর্যন্ত শুনলেন না। বার বার নিজের মনে বলতে লাগলেন যে "আমরা যাব, দেখা করব বৈকি তাঁর সঙ্গেও", তাঁরা সত্যিই যাবেন, নিশ্চয় একসঙ্গে যাবেন।

বড় বড় গ্রাম, যেখানে কনেস্টবল কিম্বা পুলিশ কর্মচারী আছে, সেগুলো এড়িয়ে চলতে লাগল সন্ন্যাসী। কুমারকে তাই রাত কাটাতে হ'ত হয়তো খাতে শুয়ে, সেখানে সকাল হ'লে সূক্ষ্ম পাখা সুইফ্‌ট্‌ পাখিরা মাথার ওপর কিচির মিচির করত, নয়তো গাঁয়ের বাইরের কোন খামারের গোলাঘরে কিম্বা মাঠে কোন গাড়ির তলায়।

আলেক্সেই পেত্রোভিচের অবাক লাগল নিজেকে নিয়ে—শ্রান্ত হয়ে যেখানে খুসী চলে পড়ছেন, সকালে বেশ খুসী আর তাজা হয়ে ঘুম ভাঙছে, উকুণ, কাদা, গোবর—এ সবে তাঁর গা ঘিন্ ঘিন্ করছে না।

সব জায়গাতেই এই দুই ভবঘুরেকে লোকে খুব সহজভাবে নিত। কেউ প্রশ্ন করত না তাঁরা কে বা কী। বেশীর ভাগই লোকে সন্ন্যাসীর গল্প শুনত, যে যার নিজের মত বুঝত তা। কেউ কেউ হাসত—বিশ্বাস করত না গল্পগুলো, কেউ বা অবাক হত—"দুনিয়াটা কত বড়", কেউবা শুধু মাথা নাড়ত। কোন কোন মেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত, কী কারণে তা নিজেই না জেনে। তারা কুমারকে বলত "বাবু", তাঁর জন্য দুঃখিত হত। সাধারণ লোকের প্রাণে কত করুণা আছে তা দেখে কুমার অবাক হয়ে যেতেন।

একদিন সন্ন্যাসী তাঁকে বলল, 'পথে পথে এইরকম আমাদের মতো লোক অনেক আছে। বেঁচে থাকে মানুষ, সবকিছু আছে তার,

তবে একঘেয়ে লাগে তার। আমার নিজেরই তাই হয়েছিল। আমি ভোদ্‌কা খেতাম কলসী কলসী। ভোদ্‌কার তিন লিটারের বোতল আর গেলাস নিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকতাম, আর কিছু খেতাম না, খালি ভোদ্‌কা, মুখটি একেবারে কালো হয়ে যেত। এত মদ খেতাম যে শেষ পর্যন্ত চোখের সামনে নানারকম জিনিস দেখতে আরম্ভ করলাম— শিংওয়ালা ঘোড়া, মাথা পাখির মতো আর সমস্তটা ন্যাড়া বিছানার তলা থেকে বেরিয়ে আসত। অনেক দিন ধরে আমি এই রকম যাতনা ভোগ করি। আরো ঐরকম অনেক জিনিস ছিল। আর কারো হয়ত এমন মন খারাপ হয় যে একটা পিস্তল নিয়ে গুড়ুম্ করে নিজের মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়ে খতম করে দেয়। অনেকে আছে এরকম যারা আত্মহত্যা করে। আবার এমন লোকও আছে যারা দুঃখের চোটে, অন্যকে খুন করে। ঈশ্বরের দোহাই, এ সত্যি। কোনদিন তাদের মাথায় চাপে যে চিরকালই আজকের দিনের মতো কাটবে —খেয়ে যাও, ঘুমোও, তারপর মরণ। পাগলের মতো তারা উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে গা ঢেলে দেয়, যাতে সেই উচ্ছৃঙ্খলা খোঁচার মতো তাদের গায়ে বেঁধে। এই রকম অবস্থায় এলে মানুষ একটা ছুরি নিয়ে কেন এক ঘা বসিয়ে দেবে না?... খুবই সোজা, যদি সে খুব চায়। আবার অন্যেরা নিজেদের প্রতি দুঃখে পথে বেরিয়ে পড়ে। আমি নিজেও তাদের অনেককে পথে টেনে এনেছি। গেল বছর আমার এক সঙ্গী ছিল, তোমার মতো। আমরা একসঙ্গে হেঁটেই চলেছি, হেঁটেই চলেছি— হঠাৎ সে স্বীকার করে বসল যে সে খুনী।'

'ও সব ঠিকই কথা,' বললেন আলেক্সেই পেত্রোভিচ। (তাঁরা বসেছিলেন একটা টিলায়, গেল বছরের খড়ের একটা গাদার কাছে নীচের একটা গাঁয়ের দিকে তাকিয়ে। সেখানে দেখা যাচ্ছিল সূর্যাস্তের পটভূমিকায় কালো কালো ছাত, কাঠের খুঁটির ডগায় পাখির ঘর আর

চিমনিগুলোর সারি)। 'এখন আমার মনে হয় বুঝতে পারছি কেন আমি ভবঘুরে হয়ে পথে বেড়াচ্ছি। হয়তো আমার অশুচিতা থেকে মুক্ত হয়ে তারপরে...' হঠাৎ চুপ হয়ে গিয়ে মুখ ফেরালেন তিনি, চোখ জলে ভরে এল। উত্তেজনা লুকোবার জন্য অল্প হেসে কথা শেষ করলেন, 'কিন্তু তুমি তো সারাজীবন ধরে পথে পথে বেড়াচ্ছ যেন একটা কুঁড়ে, আসল কুঁড়ে।'

'এ সব অতি বাজে কথা বলে মনে করি,' জবাবে বলল সন্ন্যাসী। 'যার যা স্বভাব। কোন কোন লোকের ঘরের মধ্যে চেয়ারে বসে থাকতে খুব মজা লাগে, আবার অন্যলোকে হাতে হারমোনিয়াম নিয়ে ভাড়াগাড়ি চড়ে সহরময় ঘুরে বেড়াতে বেশ মজা পায়। এতে খারাপ কিছু নেই, কিন্তু খারাপ হচ্ছে যখন মানুষের মাথা ঝাপসা হয়ে যায়। আর হয়তো আমিও আমার বিবেকের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি? তুমি কী করে জানবে?'

দশদিনের দিন তাঁরা আবার ভোল্‌গার তীরে ফিরে এলেন। খড়ের গাদার কাছে কথাবার্তার পর সন্ন্যাসী আর গান গায়নি, সারাক্ষণ পায়ের দিকে চেয়ে ভেবে ভেবে কাটিয়েছে। আলেক্সেই পেত্রোভিচও অনেক চিন্তা করেছেন, স্পষ্টভাবে এবং আনন্দের সঙ্গে। তাঁর মনে হচ্ছিল, তাঁর সমস্ত অতীতটা যেন একটা দুঃস্বপ্ন, একরকমের মানসিক বিকার কিন্তু এখন তিনি রাই ক্ষেতের মধ্যে রোদে হাঁটছেন, তাঁর মনে প্রেমের জোয়ার, আগে কখনও এমনটা আসেনি...

নদীর কাছে একটা গাঁয়ে, ''নীলয়ে'' থেকে প্রায় ত্রিশ ভার্স্ত দূরে একজন পুলিশ সন্ন্যাসীকে আটকাল। সে কুমারের পাসপোর্টটাও দেখল, মাথা নেড়ে বলল:

'ঠিক আছে, কেটে পড়। বেকার লোকদের কিন্তু আমরা আমল দিই না। খবরদার কুকুরের বাচ্চা, ফের যদি তোমায় ধরি তো হাজতে পুরব।'

আলেক্সেই পেত্রোভিচ পাসপোর্ট ফেরৎ নিয়ে গাঁ ছেড়ে নদীর ধারে একটা

ওক বনে ঢুকলেন। রাত্রি নামলে দূরের প্রাদেশিক সহরের আলোগুলো ওপারের পাহাড়ের উপর তারার মতো জ্বলতে লাগল।

ওক বনের নিস্তব্ধতা, নদীর কুলকুল শব্দ, এই কম্পমান আলো তাঁর অতি পরিচিত। অন্ধকারে ঘাসের ওপর শুয়ে আলেক্সেই পেত্রোভিচ কেঁদে মনে মনে বলতে লাগলেন:

'প্রেয়সী কাতিয়া, প্রিয়া আমার।'

# শেষ অধ্যায়

## ১

পরদিন সন্ধ্যায় ক্রাস্নোভের হোটেলে, যেখানে সহরের থিয়েটারের অভিনয় হয়, প্রচুর ভীড়। বৃষ্টিতে ভেজা এ্যাসফল্ট ফুটপাথে রাস্তার আলো পড়েছে। নলের মুখ দিয়ে যেমন জল বেরোয় তেমনি মানুষের স্রোত বেরিয়ে আসছে দরজা দিয়ে, তারপর ফুটপাথে এসে তারা ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে। কতক চলেছে তাড়াতাড়ি ঘরমুখো, কতক রেস্তোরাঁতে, অন্য অনেকে থেকে যাচ্ছে মহিলা আর কুমারীদের দেখার আশায়।

জংলী মুলুকের জমিদারবাবুরা লোকজনকে মোটা কনুই'এর গুঁতো দিয়ে বলছেন, "মাপ করবেন", জেম্স্তভোর জমিদারেরা ভদ্রভাবে একপাশে সরে এসে নাটক নিয়ে আলোচনা করছেন, ইংরাজী কেতাদুরস্ত, অভিজাত সম্প্রদায়ের জেলার প্রতিনিধি বাবু বেরিয়ে আসামাত্র দারোয়ান দরজা ছেড়ে ফুটপাথে ছুটে এসে জোর গলায় হাঁকল, 'গাড়ি লে আও।'

দরজার দুধারে দণ্ডায়মান কেরাণীর দল উৎসুক হয়ে দেখতে লাগল সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকদের। প্রুশিয়ান কেতায় টুপি-পরা জিমনাসিয়ামের ছোকরার দল দরজার পাশে ভীড় করে দাঁড়িয়ে রইল কুমারীদের দেখবার জন্য আর এইমাত্র যিনি অভিনয় করলেন সেই নামজাদা অভিনেত্রীকে বাহবা হাঁকবার জন্য।

কুমারী, মহিলা, কেরাণী-ব্যবসাদারদের স্ত্রীরা, সকলেই ওড়না আর শাল জড়িয়ে স্কার্ট একটু তুলে ধরে ভিজে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

অবশেষে দরজায় দেখা গেল ভোলকভ আর কাতিয়াকে।

ছোকরার দলেগুঞ্জন শোনা গেল, 'ক্রাস্‌নপোল্‌স্কায়া, ক্রাস্‌নপোল্‌স্কায়া ...'

বেঁটেখাটো অথচ প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা মুশ্‌চীন্‌কিন নামে এক কেরাণী ঘাড় চিতিয়ে একেবারে কাতিয়ার পায়ের তলা থেকে ছুটে সরে গেল।

সাদা কোট আর ভায়োলেট ফুল-দেওয়া একটি ছোট টুপি পরে কাতিয়াকে সত্যি অসাধারণ সুন্দর দেখাচ্ছিল। হাতীর দাঁতের মতো নরম ফরসা মুখখানি তার বড় কড়া, ঠোঁট দুটি অহঙ্কারে চাপা, বড় বড় জ্বলন্ত চোখে জ্বালাময়ী দৃষ্টি।

নাটকটা কাতিয়াকে বেজায় অস্থির করে তুলেছে, কারণ তার প্রত্যেকটি কথা যেন তার অতীত জীবনকে নিয়েই লেখা। থিয়েটারের বক্স আর চেয়ার থেকে মানুষেরা ইচ্ছা করেই এমন স্পর্ধাভাবে তার দিকে তাকাচ্ছিল যে তার গা ঘিন ঘিন করছিল।

দারোয়ান মাথার টুপি খুলে ভোলকভকে জিজ্ঞেস করল:

'হুজুর, কাকে ডাকব?'

'পিওতর বলে হাঁক দাও ভায়া, যত জোরে পার চেঁচাও।'

দারোয়ান "পিওতর, গাড়ি লে আও", বলে এমন হাঁক দিল যে সমস্ত স্কোয়ারে শোনা গেল।

৬

কাতিয়া তার বাবার পিছনে পিছনে গাড়িতে ওঠবার সময় দরজার পিতলের হাতলটাতে তার পোষাক আটকে গেল, একবার ফিরে তাকাল সে। হঠাৎ কাছ থেকে কার গলায় "কাতিয়া।" ডাক শুনে কেঁপে উঠে তাকিয়ে দেখেই হাত দিয়ে চোখ ঢেকে গাড়ির নরম গদিতে বসে পড়ল, ঘোড়াগুলো চলতে আরম্ভ করল।

রাস্তার আলোর নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন কুমার — মাথায় টুপি নেই, পরনে শতচ্ছিন্ন জামাকাপড়। গলা বাড়িয়ে চলতি গাড়িটার দিকে চেয়ে তিনি শুধু একটি কথা বারবার বললেন, "কাতিয়া!.."

একজন পুলিশ তাঁকে ধমক দিল, 'এখানে দাঁড়িয়ে কেন? তফাৎ যাও, তফাৎ যাও!'

কুমার সরে যেতেই দেখতে পেলেন ৎস্লুরিউপাকে। সে লর্‌নেৎ-চশমা চোখে তাঁর দিকে চেয়ে ছিল উগ্র কৌতুকে।

'কুমার, এ আবার কী রঙ্গ আপনার?' চেঁচিয়ে উঠে ৎস্লুরিউপা তাঁর হাত পাকড়াল। নিজের গাড়ি ডেকে সে জোর করে তাঁকে বসিয়ে কোচওয়ানকে হুকুম দিল জলদি হাঁকাতে যাতে নদী পার হবার শেষ খেয়ানৌকা ধরতে পারে। কুমার ইতিমধ্যে বৃথাই হাত এড়াবার চেষ্টা করলেন আপনমনে এই বলে, "এ হতেই হত, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি যেতে চাই না।"

আলেক্সেই পেত্রোভিচ গাড়ির মধ্যে চুপচাপ জড়সড় হয়ে বসে রইলেন। প্রশ্নের জবাব অতি সংক্ষেপে দিতে লাগলেন, শরীরের অবাধ্য কাঁপুনিতে দাঁত যাতে ঠক্‌ঠক্ না করে তার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। এটা কিন্তু কুমার বুঝতে পারলেন — তিনি নিজে যা কখনও করে উঠতে সাহস পেতেন না তা ৎস্লুরিউপা এবং অন্য সকলেই নিশ্চয়ই অতি সাধারণ আর সহজ ভাবেই করবেন।

গাড়ির ঝাঁকানি খেয়ে চলতে চলতে ভোলকভ তাঁর মেয়েকে বলছিলেন, 'আমি বলছি তোকে, অতি বাজে নাটক। আমি বুঝি না এ নিয়ে এত হৈচৈ কিসের। আমার তো ঘুমই পেয়ে গেল। আর তোর লক্ষ্মী মা, এত চঞ্চল হবার কিছু নেই। ক্লান্ত লাগছে না তো?'

'না, না, বাবা,' জবাব দিল কাতিয়া। 'কেবল সহরে রাত কাটাতে আমার ইচ্ছে করছে না, চলো সোজা বাড়ি যাই।'

'তোর মাথা খারাপ হয়েছে, কাতিয়া! ওল্‌গা-খুড়ী রাত্রির খাবার নিয়ে আমাদের জন্য বসে আছেন। বুড়ী মানুষের মনে আমরা দুঃখ দিতে পারি? আচ্ছা বাবা, আচ্ছা, ব্যস্ত হ'সনে, একটু কিছু মুখে দিয়েই কোন একটা কাজের ছুতো করে বাড়ি ফিরব। আঃ কাতিয়া, আজকালকার ছেলেমেয়েদের বুঝতে পারি না বাপু। মাথায় তোদের কী যে ব্যস্ততা ঢুকেছে, একদণ্ড স্থির নস তোরা। আগেকার কালে লোকের জীবন ছিল ঢের সাদাসিধে।'

২

অস্থির লোকের কথা আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ বৃথাই বলেননি। ওল্‌গা-খুড়ী বলতেন "ঘুরুনি রোগ"। ভোলকভের সে বছরটা বেজায় ভোগান্তি গেছে। সারা শীতটা কাতিয়া অসুখে পড়ে ছিল। যেই সবে সেরে উঠেছে তখন কন্দ্রাতী মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল ডাক্তারের বরফের গর্তে মারা যাওয়ার কথা। তখন থেকে আরম্ভ হয়ে গেল কাতিয়ার মাথার "ঘুরুনি রোগ"। এক সময়ে এই সব এমন অসহ্য হয়ে পড়েছিল ভোলকভের যে তিনি এমন কি বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালাতে চেয়েছিলেন।

রাতের বেলায় জামাকাপড় অর্ধেক খোলা অবস্থায় কাতিয়া তার বাবার ঘরে চলে এসে, ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে, অন্ধকার কোণের দিকে উঁকি মেরে, পা গুটিয়ে সোফার ওপর অনড় হয়ে বসে বাতির দিকে

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত। তারপর তার মুখে আসত খিঁচুনি, ফিট্ হত, দাঁতে দাঁত চেপে তার বাবাকে একশ বারের মতো বলত সে রাত্রের ইতিহাস। সে গল্প থেকে মেয়ের মন অন্যদিকে কোনোমতে ফেরাবার জন্য আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ ভেবেচিন্তে বললেন:

'আমার মনে হয় গ্রিগোরী ইভানভিচ নিজের প্রাণ নিজেই নষ্ট করেননি। এতে তোর কোন দোষ নেই। এই ছিল ভবিতব্য, তার মরণ লেখা ছিল।'

'কী বলছ তুমি?' থরথর করে কেঁপে কাতিয়া জিজ্ঞেস করল। 'মরণ লেখা ছিল? তার মানে সে ছিল বলি?'

হঠাৎ শান্ত হয়ে যেত সে। তারপর একবার কুমারের গল্প করেছিল, সহজভাবে, তিক্ত হাসির সঙ্গে। আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ গালমন্দ করলেন। সে ও কথা আর বলত না, কিন্তু বোঝা যেত সে অনেক ভাবত আর কিছুটা আন্দাজ করেছে। বসন্তকাল এলে একদিন আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ বললেন:

'কাতিউশা, চল্ মা, ওল্গা-খুড়ীর ওখানে যাই।'

কাতিয়া ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'বেশ...'

দুর্ঘটনার পরিণাম সাশার ওপর হ'ল অন্যরকম। গ্রিগোরী ইভানভিচ যখন রাজকুমারীর সঙ্গে চলে গেলেন তখন সে বুঝল যে তিনি আর ফিরবেন না। যদি বা ফিরে আসেন তাহলে তার কাছে সম্পূর্ণ পর পুরুষ হয়ে ফিরবেন। সে আরও বুঝল যে ডাক্তারের সঙ্গে তার জীবন জড়িত করা সম্পূর্ণ অন্যায় হয়েছে। সেদিন সবজি বাগানের মধ্যে তার রাজী না হয়ে চলে যাওয়াই উচিত ছিল। কাঠের পর্দার আড়ালে শুয়ে সে ভাবতে লাগল কেমন করে বুড়ীর পোষাক পরে সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে খৃষ্টের নামে ভিক্ষা করে। তার মন বলল এখনকার মতো বাসনাময় জীবন আর সে যাপন করবে না, যাপন করবে

ঈশ্বরের কাছে, পৃথিবীর কাছে, মানুষের কাছে চিরতরে মৃদু আনন্দের জীবন।

ভোরবেলায় দরজায় কে একজন ধাক্কা দিল। এ্যাসপেন পাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে জামাকাপড় ঠিক করে দরজা খুলতে গেল সে। ফাদার ভাসীলী ঘরে ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে কড়াস্বরে বললেন :

'গ্রিগোরী ইভানভিচ নদীর জলে ডুবে মারা গেছেন।'

সাশা মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে বলল :

'ঈশ্বর আমাদের ওপর দয়া করুন।' বুকে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল সে, পা আর তার ভার সইতে পারছিল না।

কলিভানের যে চাষা রাজকুমারীকে বরফের গর্তের ভিতর থেকে বাঁচতে "মীলয়ের" লোকজনদের সাহায্য করেছিল তার কাছে তিনি যা শুনেছিলেন সমস্ত তাকে বললেন ফাদার ভাসীলী। সাশা শান্তভাবে আগাগোড়া শুনে শেষে বলল :

'ও তো ডুবে মরেনি, ওকে ডুবিয়ে মেরেছে। এই কিছু টাকা নিন, ঈশ্বরের দাস গ্রিগোরীর অন্ত্যেষ্টিতে প্রার্থনা করাবেন আপনি।'

সারা শীতকালটা সাশা সেই ঘরেই কাটাল, গরু বাছুরের দেখাশোনা করল, সমস্ত পরিষ্কার গুছিয়ে রাখল। সন্ধ্যাবেলায় টেবিলের পাশে বসে গ্রিগোরী ইভানভিচ যে বইগুলো ভালোবাসতেন সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকত। ঝড় যখন অত্যন্ত গর্জন করত বাড়ির চারপাশে তখন ভ্রূকুঞ্চন করত সে। তার মনে হত এ বুঝি ঝড়ের আর্তনাদ নয়, গ্রিগোরী ইভানভিচের অশান্ত আত্মার কান্না।

বসন্ত যখন এল তখন সন্ন্যাসিনীর মতো কালো ছিট কাপড়ের রুমাল মাথায় বেঁধে গাঁ ছেড়ে চলে গেল সাশা। তারপর থেকে তাকে আর কেউ দেখেনি।

৩

বাবার সকল ইঙ্গিত আর ওল্‌গা-খুড়ীর নির্বন্ধাতিশয্য সত্বেও কাতিয়া জেদ করল খাওয়ার পরেই তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরতে হবে। ভোরবেলায় ক্লান্ত উত্তেজিত কাতিয়া নিজের বিছানায় বসে ছিল কন্দ্রাতীর অপেক্ষায়। কন্দ্রাতী গেছে কর্তাকে শোয়াবার ব্যবস্থা করতে।

কাতিয়ার সর্বদা মনে হত কুমার তাকে একবার শেষ অপমান করতে চাইবেন। সে এটার জন্য অপেক্ষা করেছিল, আত্মরক্ষার জন্য তৈরীও হচ্ছিল। তার কল্পনায় কুমার ছিলেন বরাবর যন্ত্রণাদাতা আর সে ছিল বিনা দোষে অপমানিত; তার সবচেয়ে ভাল জবাব অবশ্য হবে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে একটা অবহেলা ঘৃণা আর বরফের মতো শান্ত শীতলতার ভাব বজায় রাখা। কিন্তু এখন এই সমস্ত বোকার মতো ধারণার যেন কোনই অর্থ নেই।

ছিন্নবস্ত্র, অসুখী, বিশীর্ণ কুমার তার কল্পনাকে ভীষণ নাড়া দিয়েছেন, জাগিয়েছেন তার ঔৎসুক্য। আর তিনি বিজয়ী নন, অত্যাচারী নন—দয়ার কাঙাল তিনি, অনুনয় করছেন যেন তার চোখের এক দৃষ্টিতে তাঁর জীবন মরণ। এখন তাই মনে হ'ল দুঃখে তার বুক ভেঙে যাবার জোগাড়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে তার ইচ্ছা সত্বেও, আগের মতো অপমানের ক্রুদ্ধ বোধকে মনে ঠাঁই দিতে পারছিল না।

শেষ পর্যন্ত কন্দ্রাতী এল। সাবধানে দরজা বন্ধ করে হেঁয়ালির ভাব নিয়ে প্রশ্ন করল:

'ব্যাপার কী?'

'কন্দ্রাতী, আমি কুমারকে দেখেছি। (কন্দ্রাতী শুধু একটু কাশল।) 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না... ভিক্ষা করছিলেন তিনি। অসুখী,

জরাজীর্ণ... কাউকে খুন করেছেন না কী?.. লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন?'

'খুব সোজা কথা। হয়তো কাউকে খুন করেছেন,' জবাব দিল কন্দ্রাতী।

'দোহাই ভগবানের, বাবাকে কিছু বলো না। এখনি চলে যাও ''মীলয়েতে'' কিম্বা সহরে... যেখানে ইচ্ছা...' মুহূর্তের জন্য তার গলা বুজে এল। 'তাঁর দেখা পেলে বলো না যে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি। না, কিছু এসে যায় না তাতে, যা খুসী তোমার তাই বলো... কেবল দেখো তিনি যাতে আমায় আর যন্ত্রণা না দেন।'

কন্দ্রাতী বেরিয়ে গেল। কাতিয়া বিছানায় বসে দেখতে লাগল পুরোনো পার্কেট বসানো মেঝের ওপর গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আসা আলোর ছোপ। খোলা জানালা দিয়ে শিশির-ভেজা সবুজ গাছপালায় ভর্তি বাগান থেকে ওরিয়ল পাখির শিস্, ঘুঘুর বিষণ্ণ ডাক, চড়াই পাখির কিচির মিচির শোনা যাচ্ছে। একটা বোকা মাছি জানালার ওপরদিকে কাঁচে মাথা ঠুকে মরছে, একটু নীচে আসবার বুদ্ধি নেই তার। মাছিটা বোধ হয় ভাবছিল যে কাঁচের উপর পিছলানো তার নাকের ডগার অদূরে নীল আকাশটা, গাছপালা, ফুলের মতো সাদা প্রজাপতি, পাখি, শিশির, এ সব বুঝি একটা স্বপ্ন যাতে সে পৌঁছতে পারবে কেবল মাথা ঠুকে ঠুকে মরলে।

'কী জ্বালাতন করছে মাছিটা!' বলে কাতিয়া বিছানা ছেড়ে একটা তোয়ালে নিয়ে কাঁচে ঝাপটা দিয়ে দিয়ে মাছিটাকে বাগানে তাড়িয়ে দিল, তারপর পিছনে হাত জড়ো করে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল।

তার জীবনের জ্বালাময় আবেগভরা সেই বছরের আগাগোড়া সমস্ত কিছু তার চোখের সামনে চলে এল। কোন আনন্দ ছিল না তাতে।

কিন্তু এখন তা মনে করে যন্ত্রণা বা হতাশা সে অনুভব করল না। যেন যা কিছু ঘটেছিল সব শেষ হয়ে গিয়ে কুয়াশায় মিলিয়ে গেছে, এক মধুর বিষণ্ণতায় পরিণত হয়েছে। থেকে গেছে মুক্তির স্বাদ এবং সেই অজানা আনন্দ যা অনুভব করতে পারে শুধু খুব নবীন সবল আর আবেগপূর্ণ লোকেরা।

মুখচোখের ওপর সজোরে হাত ঘষে, মাথা ঝাঁকিয়ে কাতিয়া হঠাৎ অতি স্পষ্ট চোখে তার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিল।

দেখে নিজেকে সে গেল ভুলে, একটা মিষ্টি হাসি খেলে গেল তার মুখে। এখন তার মন স্বচ্ছ তাজা।

'বেশ, তাই হোক,' বলল সে, 'আমি প্রস্তুত।'

## ৪

"নীলয়েতে" কুমারের বাড়ির সব চাকর বাকর রান্নাঘরে জমায়েত হয়ে চাকর ভাসীলীর কাছে শুনছিল কেমন করে কুমারবাহাদুর রাত্রে হঠাৎ কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছেন।

'একটা ভবঘুরে বাড়িতে ঢুকছে দেখে তাকে বললাম, "কোথায় চলেছ হে, গোঁফদাড়িভরা বদন নিয়ে?" তখন তিনি আমায় বললেন, "এই যে ভাসীলী, বাড়ির সব কেমন? ভাল তো?" আমি তো মারা যাবার জোগাড়, দেখি হুজুর নিজে। তাঁর পরনের কাপড়চোপড় আমাদের রাখাল এফীম্‌কার চেয়েও খারাপ। যাই হোক, আমি তাঁকে নিয়ে গেলাম ওপরে শোবার ঘরে। তিনি একটা চেয়ার দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ঐখানে কি কর্ত্রীঠাকরুণ বসতেন?" আমি বললাম, তিনি সবখানেই বসতেন। তিনি চেয়ারটার দিকে এমন করে তাকিয়ে রইলেন যেন সেটা একটা মেয়েমানুষ। আমি প্রায় হাসিতে ফেটে পড়ি আর কি। তারপর বললেন, "যাও এখন, আমি নিজে সব করে নেব, তবে

স্নানের বন্দোবস্ত করো।" আমি দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম তাঁর কী অবস্থা হয়েছে। রাজকুমারীর বিছানায় শুয়ে বালিশ আঁকড়ে পড়ে রইলেন। একেবারে উপোসী বুঝি। নিশ্চয় সহরের মেয়েরা ওঁকে শুষে নিয়েছে। এখন ঘুমোচ্ছেন। না জাগালে এখন পুরো দু'দিন ধরে ঘুমোবেন। হ্যাঁ, আমি অনেক জায়গায় থেকেছি, কিন্তু এমন কাণ্ডকারখানা আগে কখনো দেখিনি।'

ভাসীলী ওয়েস্টকোটটা সোজা করে নিল—তাতে দুটো ঘড়ির চেন ঝুলছে। সিগারেট কেস (যেটা কুমারের দেওয়া) বার করে একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসল।

'জানি না কেমন করে উনি এখন রাজকুমারীর সঙ্গে মিটমাট করবেন। সেটা ওঁর পক্ষে খুব কঠিন কাজের হবে। অনেক তাজ্জব জিনিস দেখব আমরা।'

রান্নাঘরের সবাই কৌতূহলে ব্যাকুল। চাকরদের ঘর থেকেও লোকে দৌড়ে এল ভাসীলীর গল্প শুনতে। কুমার এদিকে ঘুমোতে লাগলেন। হঠাৎ খিড়কী দরজায় ধূলোমাখা গম্ভীরমূর্তি কন্দ্রাতী হাজির হয়ে কড়াস্বরে জিজ্ঞেস করল:

'কুমার ফিরেছেন?'

'হ্যাঁ, ফিরেছেন বৈকি,' জবাব দিল ভাসীলী, 'কিন্তু হুকুম আছে তাঁকে যেন জাগানো না হয়।'

'জাগাতেই হবে।'

শোবার ঘরের দরজায় গলা খাঁকারি দিয়ে আঙুলের টোকা দিয়ে কন্দ্রাতীকে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল। অবশেষে ঘুমজড়ানো স্বরে কুমার সাড়া দিলেন, "কী বলছ? হাঁ, এখনই উঠছি..." নিশ্চয় উঠে বিছানায় অনেকক্ষণ বসে তবে তাঁর পুরো হুঁশ এল। তখন সম্পূর্ণ অন্য গলায় বললেন, "ভিতরে আসুন।"

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কন্দ্রাতী ঘরে ঢুকল। আলেক্সেই পেত্রোভিচ কয়েক মিনিট সোজা তার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে তার কাছে ছুটে এসে তাকে একটা চেয়ারে বসালেন। তাঁর মুখ এত ফ্যাকাসে হয়ে গেল আর এত ভয়ঙ্কর কাঁপতে লাগলেন তিনি যে, বুড়ো চাকর ভুলে গেল সে সব অপমানকর কথা যা সে কুমার-বাহাদুরকে বলবে বলে স্থির করেছিল। মুখ ফিরিয়ে ঠোঁট চিবিয়ে চিবিয়ে শুধু বলল:

'রাজকুমারী আদেশ করেছেন আপনার শরীর কেমন আছে জানতে। উনি নিজে শীতকালে মরণাপন্ন ছিলেন। তাঁর কোনো ইচ্ছে নেই আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।'

'কন্দ্রাতী তিনি নিজে তোমাকে পাঠিয়েছেন?'

তার হাত ধরলেন কুমার।

'আপনি নিজেই বুঝে নিন। আমার কিছু বলবার নেই আপনাকে, আপনি অসৎ ব্যবহার করেছেন। আমার ওপর হুকুম আপনি কেমন আছেন জানতে, আর কিছু নয়।'

বহুক্ষণ কুমার কোন কথা বললেন না। তারপর টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। কন্দ্রাতীর মন গলে গেল, কিন্তু তবু সে নিজেকে সামলাল।

'ব্যস, আর কিছু না,' বলে সে দরজার দিকে পিছিয়ে গেল।

'যেও না, এক মিনিট দাঁড়াও,' বলে উঠলেন কুমার টেবিলের ওপর হাত বাড়িয়ে। 'আমি চিঠি লিখব।'

একটা মরচে পড়া কলমের নিব দিয়ে কম্পিত হস্তাক্ষরে লিখতে আরম্ভ করলেন:

'প্রিয়া কাতিয়া...' (কেটে দিলেন সেটা)। 'আমি আপনার কাছে কিছু চাই না, চাইবার সাহসও নেই... কিন্তু জগতে একমাত্র আপনাকেই

আমি ভালোবাসি। আমার এক সঙ্গী ছিল, সে এখন জেলে, সেই আমাকে শিখিয়েছে ভালোবাসতে... যখন আপনার কথা ভাবি আমার অন্তর ভরে যায় আলোতে, আনন্দে আর এমন সুখে যার স্বাদ আর কখনও আমি পাইনি... আমি জানি আমি আপনার দেখা পাবার যোগ্য নই... তবু—আমায় ক্ষমা করুন... যদি পারেন ক্ষমা করতে... আমি... নতজানু হয়ে যাব...'

৫

সন্ধ্যায় ৎস্যুরিউপা ভোলকভোতে এল (সে গ্রীষ্মে সে প্রায়ই আসত সেখানে)। সোজা আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচের পড়ার ঘরে গিয়ে ভীষণ উত্তেজিতভাবে বলতে আরম্ভ করল কুমারের কথা। ভোলকভ তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন:

'আমি সব জানি। খুবই দুর্ভাগ্য এটা, এমনকি আমার চুল পেকে গেল। দয়া করে সে হতভাগাটার নাম আর করবেন না।' জানালার কাছে গিয়ে ভোলকভ চাষবাসের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। ঠিক সেই সময়ে কন্দ্রাতী গাড়ি চড়ে উঠানে এসে হাজির হল।

"বুড়ো ধাড়ীটা গিয়েছিল কোথায়?" ভাবতে ভাবতে জানালার ধারিতে ঝুঁকে পড়ে চেঁচিয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন:

'কোথায় গিয়েছিলে?'

কন্দ্রাতী মাথা নেড়ে জানালার তলা পর্যন্ত গাড়িটা নিয়ে এসে তাঁকে বোঝাল যে সে রাজকুমারীর জন্য একটা চিঠি নিয়ে এসেছে। "ওহোঃ", বলে জানালা বন্ধ করে ভোলকভ চললেন মেয়ের ঘরে।

ৎস্যুরিউপা অস্বাভাবিক উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে আন্দাজ করল চিঠিটা এসেছে কুমারের কাছ থেকে।

একমিনিট যেতে না যেতেই ভোলকভ দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এলেন। মুখ লাল, রেগে আগুন, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে।

'কালি নেই।' ফেটে পড়লেন তিনি দোয়াতটা ঠেলে ফেলে। 'পেন্সিলটা গেল কোথায়?' তাড়াতাড়ি তাঁর হাতে একটা পেন্সিল এগিয়ে দিতেই সেটা নিয়ে বড় বড় অক্ষরে লিখলেন: "মহাশয়"—সেই কাগজটার ওপর যেটার উল্টোপিঠে বছর খানেক আগে তিনি এঁকেছিলেন খরগোশ, শেয়াল, নেকড়ে বাঘ আর একপাল কুকুর। তারপর চেয়ারের পিঠে ঠেস দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন।

'হয়েছে কী?' সাবধানে প্রশ্ন করল ৎস্যুরিউপা। 'আমায় বলুন ব্যাপারটা কী, হয়তো আমি সাহায্য করতে পারি?'

'কিন্তু এ তো স্রেফ স্পর্ধা।' চীৎকার করে বললেন আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ। 'না, না, আমিই জবাব দেব। কী নির্লজ্জ লোকটা।' তারপর লিখলেন, "মহাশয়, এ রকম স্পর্ধিত ব্যবহার বুঝে ওঠার কিছু খুঁজে পাচ্ছি না আমি"। বুঝেছেন, ও মাপ চেয়ে চিঠি লিখেছে, যেন কিছুই ঘটেনি। আমি জবাব দেব, "আমার মেয়ে বাড়ির ঝি নয় যে তাকে আপনি চিঠি পাঠাবেন। আপনার সত্যিই উচিত নতজানু হয়ে আসা (শেষের কথাগুলোর তলায় দাগ দিলেন) আর অতিশয় বিনীতভাবে তার জানালার নীচে দাঁড়িয়ে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া ..."

'আহা, ওটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?' ভোলকভের কাঁধের ওপর দিয়ে অস্থির চোখে একচোখো চশমা দিয়ে চিঠিটা পড়তে পড়তে ৎস্যুরিউপা বলল। 'অবশ্য এরকম মায়ামমতাহীন লোককে সায়েস্তা করার এ ছাড়া উপায় নেই। আমি ত আপনাকে পরামর্শ দিতাম সমস্ত ব্যাপারটা উকীলের হাতে ছেড়ে দিতে। হ্যাঁ, একাতেরীনা আলেক্সান্দ্রভনা আছেন কেমন? উতলা হয়ে পড়েছেন?'

'কী বললেন?' আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন ভোলকভ। 'কাঁদছে বৈকি সে। কিন্তু আপনার কী তাতে? বেরিয়ে যান বলছি এখান থেকে—জাহান্নমে যান আপনি।'

কাতিয়া কিন্তু কাঁদছিল না। কন্দ্রাতী ফেরার অপেক্ষায় সে হাত জড় করে হয়তো জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল, নয়তো আরাম চেয়ারে বসে একটা বই নিয়ে সময় কাটাচ্ছিল একই কথা বার বার পড়ে: "তৎপরে য়ুরী মহান ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সটান দণ্ডায়মান হইয়া চীৎকার করিলেন: "জীবন থাকিতে কদাচ নহে"। বইটা সরিয়ে দিয়ে সে বার বার নিজেকে বলছিল, "আমাকে শক্ত হতে হবে, দৃঢ় হতে হবে আমাকে।" কিন্তু তার মন এরিমধ্যে উধাও হয়ে গেছে অনেক দূরে। তার চোখের সামনে আবার ভাসছিল বিজলীবাতি, তার নীচে ভিজে এ্যাস্‌ফল্টের ওপর দাঁড়িয়ে এক দীনহীন লোক; তার চোখগুলো ডাগর, কালো, পাগলের মতো... কাতিয়া এক হাতে মুখ ঢেকে উঠে পায়চারি করে আবার বইখানা তুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল: "তৎপরে য়ুরী মহান ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া..." হায় ভগবান, কন্দ্রাতীর এখনও দেখা নেই, দিনটা যেন মনে হচ্ছে এক বছর।

অবশেষে প্রবেশপথে তার বাবার ভারী পায়ের শব্দ কানে এল তার। দরজাটা দড়াম্ করে খুলে গেল, তিনি কন্দ্রাতীকে নিয়ে ঢুকলেন—হাতে চিঠি।

কাতিয়া কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রইল। তার বাবা খামটা ছিঁড়ে ফেলে চিঠিটা তার হাতে গুঁজে দিলেন। ধীরে ধীরে সে পড়তে আরম্ভ করল। শেষ পর্যন্ত পড়ার আগেই সে বুঝতে পারল কুমারের মনে কী হয়েছিল ঐ কাতর কয়েকটা লাইন লেখার সময়। তার চিত্ত শান্ত এবং গম্ভীর হয়ে উঠল। বাবার হাতে

চিঠিটা ফিরিয়ে দিতে তিনি দ্রুত সেটা পড়ে নিয়ে উত্তেজনায় বিকৃত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন:

'তুমি নিজে জবাব দেবে?'

'কী জানি। তোমার যা ইচ্ছা। কিছু আসে যায় না...'

'তাহলে আমিই জবাব দেব এর,' হুঙ্কার করলেন আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ। 'আমি তাকে জবাব দেব... নতজানু হয়ে ও আসুক এখানে... তাই বলে ও জাঁক করেছে... আসুক তাই!'

'কুমারবাহাদুর প্রকৃতিস্থ নেই,' সাবধানে কথা তুলল কস্ত্রাতী। 'অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন উনি।'

'চোপ রও। আমি জানি কী করতে হবে,' চীৎকার করলেন আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ। তারপর কুমারের চিঠিটা পেণ্টুলেনের পকেটে গুঁজে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

কাতিয়া তাঁর পিছনে চেঁচিয়ে বলল:

'না বাবা, আমি নিজেই ... দাঁড়াও!' এই বলে দরজা পর্যন্ত ছুটে যেতে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ল। হাত দুটো ঝুলে পড়ল দুপাশে। 'কিছু আসে যায় না কস্ত্রাতী, যা হবার তা হোক।'

'উনি ঠিকই আসবেন তোমার কাছে নতজানু হয়ে,' বলল কস্ত্রাতী। 'অবস্থা ওঁর এমনই যে উনি অমনি ভাবে আসবেনই...'

পরের দিন যখন ভোরের আলো ফুটছে তখন চিঠিটা পাঠানো হ'ল কুমারের কাছে। কাতিয়া জানল তার বাবা কী লিখেছেন, তবে তার মন তখন শান্ত আর স্বচ্ছ।

৬

সকালবেলায় ভোলকভোর ওপর ধোঁয়াটে মেঘের কুণ্ডলী, শস্য আর ঘাসের ক্ষেত থেকে উগ্র সুগন্ধ, রাস্তার ওপর ধুলোর মেঘ উড়তে উড়তে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বজ্রের শব্দ আর

বিদ্যুতের ঝলকানি সত্ত্বেও এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। বাড়ির ছাদ, বাগান আর মাঠের ওপর কবোষ্ণ ধারায় ঝরে পড়ার আগে যেন বৃষ্টি থমকে আছে।

আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচ তাঁর বাড়ির ছাদের ঘরের জানালায় একটা বার্চ গাছের ডালপালার আড়ালে বসে আছেন। একচোখ বন্ধ করে দূরবীণ দিয়ে তিনি রাস্তা লক্ষ্য করছেন।

চাকরদের ছেলেরা গাড়িঘরের ছাদে চড়ে বসে পথটা যেখানে পাহাড় ঘুরে মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেই একই জায়গাটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

গাড়িঘরের খোলা ফটকে হাল্কা গাড়িতে যোতা একটা ধূসর ঘোড়া তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে। দেওয়ালের ধারে একটা কাঠের গুঁড়িতে কোচওয়ান বসে আছে নিজের বুটে বড় চাবুকের বাঁট ঠুকতে ঠুকতে। ভূড়াগুার থেকে বেরিয়ে এসে দোহালনী ঘাসের ওপর দুধের বালতি রেখে এপ্রণের নীচে হাত জড়ো করে আর সকলের মতো চেয়ে রয়েছে।

একটি চাষা গাড়ি চড়ে এল। টুপি খুলে জানালায় কর্তাকে সেলাম জানিয়ে গাড়ি থেকে নেমে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রত্যেকে অপেক্ষা করতে লাগল।

কাতিয়া সমস্ত জামাকাপড় পরে বিছানায় শুয়ে ছিল বালিশে মুখ গুঁজে। চিঠি নিয়ে যে লোক "মীলয়েতে" গিয়েছিল সে এর মধ্যে ফিরে এসেছে এই জবাব নিয়ে যে কুমার নতজানু হয়ে আসতে আরম্ভ করেছেন।

তিন ঘণ্টা আগে কল্প্রাতী রওনা হয়ে গেছে তাঁর দিকে। আলেক্সান্দ্র ভাদীমীচের হিসাব অনুযায়ী কুমার এতক্ষণ সেই বালির পাহাড় বেয়ে উঠছেন, যেখানে নদীতীরে উইলোর ঝোপের শুরু এবং যার উপর ঘোড়ার পক্ষেও গাড়ি টেনে তোলা খুব শক্ত।

হঠাৎ ছাদের থেকে ছেলেগুলো চেঁচিয়ে উঠল:

'ঐ আসছে, আসছে।'

ভোলকভ চটি ফট্‌ফট্‌ করতে করতে ছুটে গেলেন মেয়ের ঘরে। কাতিয়া কিন্তু ইতিমধ্যেই অলিন্দে হাজির। তার বেণী খুলে পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। অলিন্দের একটা থাম ধরে দাঁড়িয়ে সে দূরে রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

গাড়ির পাশে যে চাষাটি দাঁড়িয়েছিল সে দোহালনীকে জিজ্ঞেস করল:

'এরা কি লাটের আসার অপেক্ষা করছে?'

'কে জানে? হয়তো লাটেরই,' বলে মেয়েটা বালতি তুলে নিয়ে চলে গেল।

পাহাড়ের আড়াল থেকে পথ দিয়ে আসতে দেখা গেল একজন পথিককে। ছাদের ওপর ছেলেগুলো আবার চেঁচিয়ে উঠল:

'আরে, এটা যে একটা মেয়ে, ভিখারিণী একটা...'

তখন কাতিয়া থাম থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠানে নেমে এসে চীৎকার করে হুকুম করল:

'গাড়ি বার করো—শীগ্‌গির।'

গড়গড় করে গাড়ি টেনে ধূসর ঘোড়াটা ছুটে বেরিয়ে এল গাড়িঘর থেকে। কাতিয়া লাফ দিয়ে হাল্‌কা গাড়িতে চড়ে কোচওয়ানের হাত থেকে লাগাম ছিনিয়ে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে মারল বাড়ি। তীরবেগে গাড়ি ছুটল পিছনে ধূলোর মেঘ উড়িয়ে।

অনেকক্ষণ অবধি সেই ধূলো পথের ওপরে থেকে তারপর কুণ্ডলী পাকিয়ে চলে গেল মাঠের ওপর দিয়ে, যাদের কুসংস্কার তাদের ভয় দেখিয়ে। এমন লোকেদের বিশ্বাস যদি কেউ ঐ চলন্ত ধূলোর কুণ্ডলীতে একটা ছুরি ছুঁড়ে মারে তাহলে ধূলো নেমে যাবে, কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত লেগে থাকবে ছুরির গায়ে।

উইলো ঝোপ ছাড়িয়ে—ওঠা বালি পাহাড়ের ঢালুর অর্ধেক ওপরে হাঁটু গেড়ে বালির ওপর হাতে ভর দিয়ে বসেছিলেন কুমার। মাথা তাঁর ঝুলে পড়েছে, মুখ বেয়ে ঘাম ঝরছে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে গলা দিয়ে সাঁই সাঁই আওয়াজ বেরোচ্ছে, ঘাড়ের শিরাগুলো ফুলে উঠে নীল দেখাচ্ছে।

তাঁর পিছনে কন্দ্রাতী একটা তামাটে রঙের ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘোড়াটা মাথা ঝাঁকিয়ে ঘোড়ার মাছি তাড়াচ্ছে, কন্দ্রাতী সহানুভূতির সঙ্গে কুমারের দিকে তাকিয়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

ঘোড়ার মাছিগুলো কুমারের মাথারও ওপরে উড়ছে, কিন্তু কন্দ্রাতী সেগুলোকে তাঁর ওপর বসতে না দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

'ঢের হয়েছে হুজুর, উঠুন। এ যে পাহাড়।' বলছে সে। 'আমি আপনাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যাব, তারপর ভোলকভো নজরে পড়লেই আপনি আবার হাঁটুতে ভর দিয়ে চলবেন। সেখানটায় ঢালু নীচের দিকে।'

আলেক্সেই পেত্রোভিচ বহুকষ্টে পিঠটা সোজা করে নিয়ে এগিয়ে দিলেন দলা পাকানো রক্তমাখা ক্ষতবিক্ষত একটা হাঁটু যেটা বেরিয়ে রয়েছে ছিন্নভিন্ন পেণ্টুলেনের পায়ের ভিতর থেকে। তাড়াতাড়ি কয়েক পা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আবার মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। মুখ ছাই রঙের হয়ে গেছে তাঁর, চোখ অর্ধেক বুজে এসেছে, এক গোছা চুল কপালে আটকে আছে, মুখের দুপাশে পড়েছে গভীর রেখাচিহ্ন।

কন্দ্রাতী আবার বলল, 'এখনও যে অনেক দূর যেতে হবে এমনি ভাবে। প্রভু যীশুর দোহাই, আপনি ঘোড়ার পিঠে চড়ুন—আপনাকে অনুনয় করছি!'

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বালি পাহাড়ের দিকে তাকিয়েই স্থাণুর মতো নিশ্চল হয়ে গেল সে।

পাহাড়ের মাথা থেকে কাতিয়া ঘোড়াটাকে লাগাম পিটোতে পিটোতে গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে আসছে। সে এরি মধ্যে স্বামীকে দেখতে পেয়েছে, হঠাৎ জোরে বাঁক নিয়ে চলন্ত গাড়ির থেকে লাফ দিয়ে নামল, আলেক্সেই পেত্রোভিচের কাছে ছুটে এসে তার পাশে উবু হয়ে বসে পড়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখ তুলে ধরল। কুমার মাথা বাড়িয়ে কাতিয়ার হাত সজোরে চেপে ধরলেন, অত্যন্ত নিবিড়ভাবে তাকিয়ে রইলেন কাতিয়ার অপরূপ অশ্রুপূর্ণ চোখের দিকে...

'আমি ভালোবাসি, নিশ্চয় ভালোবাসি,' বলে স্বামীকে সে ধরে উঠতে সাহায্য করল।
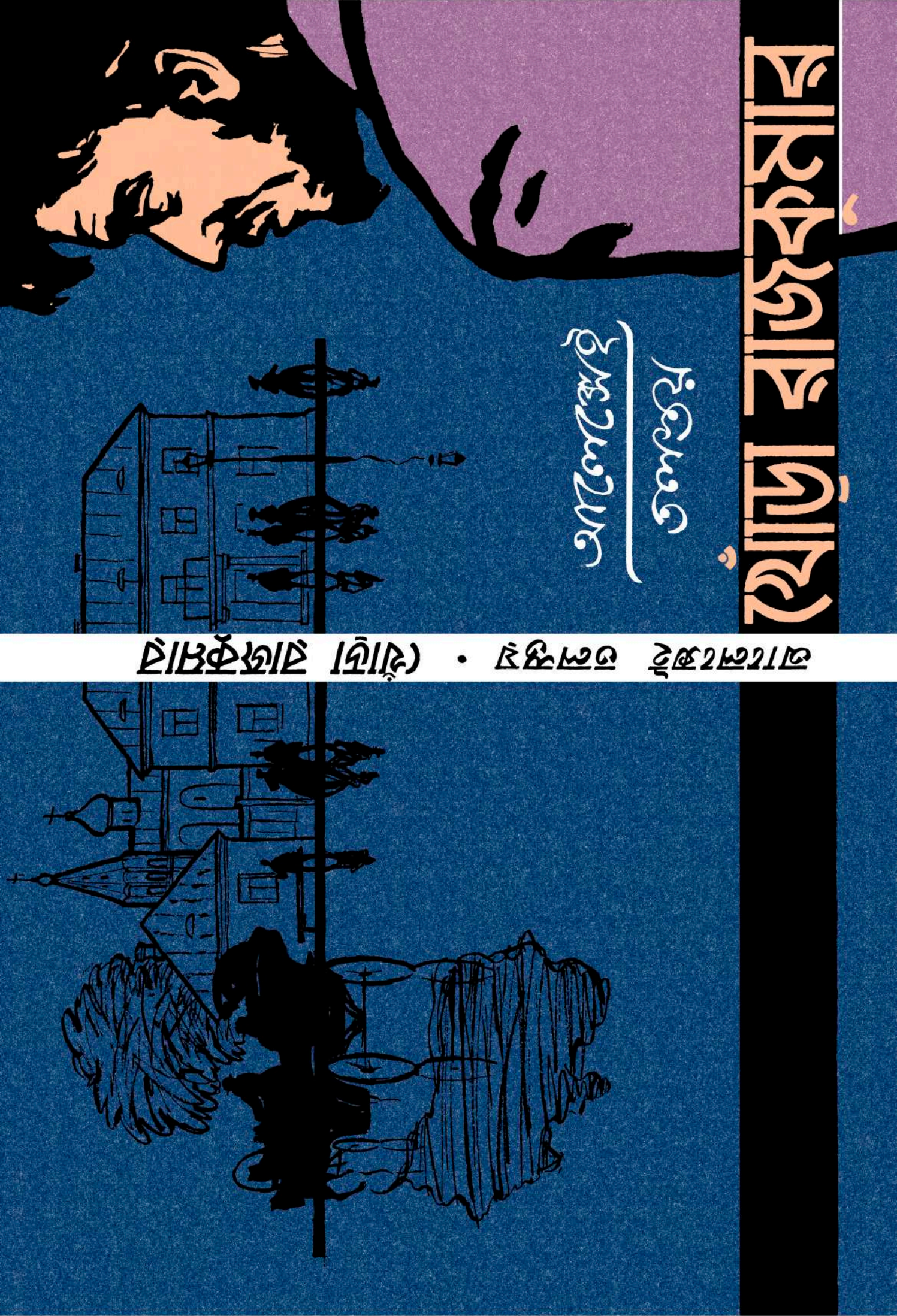
১৯১২

আলেক্সেই তলস্তয় • খোঁড়া রাজকুমার

আলেক্সেই তলস্তয়

# খোঁড়া রাজকুমার

তিন খণ্ডে সমাপ্ত বিখ্যাত 'অগ্নিপরীক্ষা' ও ঐতিহাসিক উপন্যাস 'প্রথম পিটর'-এর রচয়িতা আলেক্সেই তলস্তয় বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিককার রুশী ছোট জমিদারদের জীবন নিয়ে কয়েকটি ছোট গল্প লিখেছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল 'খোঁড়া রাজকুমার', রচনাকাল — ১৯১২। সে সময় লেখক নানা নৈতিক সমস্যা, বন্ধুত্বও প্রেমের নানা প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ ভাবিত ছিলেন। তরুণ তলস্তয় তখন লেখেন, '... প্রেমের অভাবে জীবনযাত্রার গতি হয় শোচনীয়, আর দুর্ভাগা সেই জন যার হৃদয় প্রেমে জ্বলে ওঠেনি, থাক না কেন তার প্রকৃতিদত্ত আর সব গুণ। 'ভালোবাসলে বেঁচে থাকতে ভালো লাগে।' 'খোঁড়া রাজকুমার'-এর মূলে একটি নবীন দম্পতির কাহিনী। এতে ফুটে উঠেছে সত্যকার প্রেমের কাছে হীন কামনার পরাজয়ের কথা, নারীর প্রেমের বিপুল রূপান্তরী শক্তির কথা।